জীবন-দ্বীপ

জীবন-দ্বীপ

সাহিত্য প্রকাশ
৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯

আমার এ কাহিনি শুরুর আগে আর এক প্রাক্‌কথন আছে। আরম্ভের আগে যেমন প্রারম্ভ থাকে। সেই প্রাক্‌কথনের স্থান বরিশাল জেলার চরমুন্সি গ্রাম। ভোলা মহকুমার চরমুন্সি।

যে সময়কার কথা বলছি সেটা ১৯৫৪ সাল। পাকিস্তান হবার পর সাত বছর কেটে গেছে। ১৯৫৪ সালে মেঘনা নদী চরমুন্সি গ্রাম থেকে আড়াই মাইল দূরে ছিল। এখন চরমুন্সির চিহ্নমাত্র নেই। প্রমত্ত মেঘনা একের পর এক গ্রাম মুখে পুরে এগিয়ে আসছে এক অতিকায় তিমি মাছের মতো।

পাকিস্তান হবার সঙ্গে সঙ্গে বরিশালের শহর এলাকা থেকে শিক্ষিত, সম্পন্ন, উচচ্চবর্ণের হিন্দুরা একে একে দেশ ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। তাঁদের অনেকেই কলকাতায় চাকরিবাকরি করতেন। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে তাঁদের বরাবর যোগ ছিল। অনেকে বছরের বেশিরভাগ সময় পশ্চিমবঙ্গে না হয় বিহার, ইউ. পি, দিল্লি, মীরাটে থাকতেন। পুজোর সময় দেশে আসতেন। সরকারি চাকরিতে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা অপশন দিয়ে দেশবিভাগের সঙ্গে সঙ্গেই ওপারে চলে যান। পরিবারের দুএকজন জমিজমা দেখার জন্য শুধু দেশে থেকে গিয়েছিলেন।

যাঁরা সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, তাঁরা অনেকে সম্পত্তি বিনিময় করে চলে এসেছিলেন। কিন্তু গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ পাঁচের দশক পর্যন্তও মাটি কামড়ে পড়েছিলেন। কোথায় যাবেন তাঁরা? ওপার বাংলা তাঁদের কাছে এক অজানা দেশ। তার চেয়ে দেশের এই পরিচিত দৈত্য অজানা দৈত্যের চেয়ে অনেক ভালো।

ওঁরা অবশ্য বুঝতে পারছিলেন দেশটা আর তাঁদের নেই। একটা কলমের আঁচড়েই নিজ বাসভূমে তাঁরা রাতারাতি পরবাসী হয়ে উঠেছেন। কোনও অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারেন না তাঁরা। মাঝে মাঝেই লিগের নেতারা এসে উত্তেজক বক্তৃতা দিয়ে যান। পাকিস্তানের দুশমনদের থেকে সাবধান হও ভাইসব। পাকিস্তান আমরা অনেক খুন দিয়া কায়েম করছি! দরকার হইলে আরও খুন দিবার লগে আমরা তৈয়ার আছি। কিন্তু পাকিস্তানের দুশমনরা যদি ভেবে থাকে যে তারা পাকিস্তানে বইয়া তার বুকেই ছুরি মারবে, তাহলে আমাদের ছোরাও তৈয়ার থাকবে। বলো ভাইসব আল্লা হো—

সঙ্গে সঙ্গে পৈশাচিক চিৎকার উঠত : আকবর। চরমুন্সি গ্রামটি একদিকে ছিল হিন্দু প্রধান। আর এক দিকে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মানুষই বাস করত। হিন্দুদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন নমশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষ। এঁদের প্রত্যেকেরই

কিছু না কিছু জমি ছিল। কেউ কেউ ছিলেন বর্ধিষ্ণু চাষি। এঁরা কঠোর পরিশ্রমী। তা ছাড়া জীবনে উচ্চাকাঙ্ক্ষাও খুব বেশি ছিল না। মোটা ভাত মোটা কাপড় পেলেই ওঁরা খুশি থাকতেন। ধুতি পরতেন হাঁটুর ওপর। প্রায় সারা বছর খালি গায়ে, খালি পায়ে কাটিয়ে দিতেন। শীতের সময় একটা ফতুয়া আর একটা চাদর হলেই শীত নিবারণ হত।

এঁরা অধিকাংশই নিরক্ষর। ছেলেমেয়েরা অবশ্য কেউ কেউ পাঠশালায় ভর্তি হয়েছিল। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা এঁদের সঙ্গে খুব একটা মিশতেন না। তবে কোনও সংঘর্ষও ছিল না। যে যার মতো থাকতেন। ব্রাহ্মণ বাড়িতে মুনিষ খাটবার সময় জল চাইলে এঁদের ঘটিতে করে জল দেওয়া হত। সেই জল আলগোছে খেতেন ওঁরা। খেয়ে আবার ঘটিটা মেজে রেখে চলে যেতেন।

কিন্তু তার জন্য উচ্চবর্ণের ওপর এঁদের অভিমান থাকলেও আক্রোশ ছিল না। ওঁদের ব্রাহ্মণও আলাদা ছিল। সাধারণত নিম্নবর্ণের পুজো-আচ্চা বিয়ে-পইতে অনুষ্ঠানে যে সব ব্রাহ্মণ যজমানি করতেন, উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণসমাজে তাঁরা অন্ত্যজ বলে বিবেচিত হতেন। তাঁদের বলা হত নমশূদ্রের বামুন।

যদিও উচ্চবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁদের কোনও যোগাযোগই ছিল না। কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই মানুষেরা অভিমানবশে অথবা শাসক শক্তির কাছ থেকে কোনও সুযোগ-সুবিধার আশায় ধর্মত্যাগ করেননি। তাঁরা হিন্দুই থেকে গেছেন। মুসলমানদের চোখেও তাঁরা ছিলেন 'হিন্দু'।

শুধু তাই নয়, পাকিস্তানের মুসলমান জোতদারদের কাছে তাঁরা হয়ে উঠেছিলেন চক্ষুশূল। কারণ এমনই শান্তিপ্রিয় এই মানুষগুলি রেগে গেলে হিংস্র হয়ে উঠতে পারেন নিমেষের মধ্যে। তখন তাঁদের হাতের সড়কি বন্দুকের গুলির চেয়ে তীব্র হয়ে ওঠে। এই বিপজ্জনক মানুষগুলি এদেশে যতদিন থাকবেন ততদিন তারা খুশি মতো লুঠপাঠ চালাতে পারবে না। আসলে পাকিস্তান সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ছিল সম্পন্ন ও সমৃদ্ধ হিন্দুদের হাত থেকে জমি সম্পত্তি ও চাকরিবাকরিগুলি ছিনিয়ে নেওয়া। তাই শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে পেয়েই শাসকদল সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি।

মাঝে মাঝেই দাঙ্গার সৃষ্টি করে হিন্দুদের ইন্ডিয়াতে পাঠিয়ে তাদের সম্পত্তি দখল করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।

তাই দাঙ্গাই হয়ে উঠেছিল পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পর সরকারের সবচেয়ে বড় প্রকল্প। ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৪ এই সতেরো বছরের পাকিস্তানের ইতিহাস শুধু লুঠেরা ও দাঙ্গাবাজদের ইতিহাস।

এই চরমুক্তি গ্রামের বিমল মণ্ডল ডিগলিপুরের উপকথার নায়ক। ১৯৫৪ সালে তার বয়স ছিল বারো বছর। বিমল তখন পাঠশালায় পড়ে। তাদের গ্রামে খবরের কাগজ আসত না। গ্রামে একজনের বাড়ি রেডিয়ো ছিল। তার নাম নির্মল মণ্ডল। সে সময় ট্রানজিস্টার ছিল না। ছিল বড় রেডিয়ো। বড় বাঁশ টাঙিয়ে এরিয়াল লাগাতে

হত। বহির্বিশ্বের খবরাখবর জানার একমাত্র উপায় ছিল ওই রেডিয়ো।

বিমলের চেহারা কুচকুচে কালো। সুন্দর স্বাস্থ্য। তার চোখ দুটি টানাটানা। ছোটবেলায় সে ভীষণ দুরন্ত ছিল। একবার বাবা-মায়ের বারণ না শুনে সে মাছ মারাদের সঙ্গে নৌকোয় মেঘনা নদীতে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছিল। প্রায় তিন চার ঘণ্টা ঘোরার পর পাঁচ ক্রোশ দূরের গ্রামে তাদের নৌকো তীরে ভেড়াতে পেরেছিল। সে রাতে সে বাড়ি ফিরতে পারেনি। এদিকে সে ফিরছে না দেখে তার বাড়ির লোক ধরে নিয়েছিল সে মেঘনার বুকে তলিয়ে গেছে। বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গিয়েছিল।

পরদিন সকালে সে বাড়ি ফিরতেই প্রথমে তার বাবা তাকে কঞ্চির বেত দিয়ে এমন মার মেরেছিলেন যে বেত তার দেহে কেটে কেটে বসে গিয়েছিল।

সকালে মার খেয়ে সে কাঁদেনি। গুম হয়ে বসেছিল। বাড়ির বাইরে বেরোনো বারণ। তার ঘরের দাওয়াতে বসে বসে সে আবার দুষ্টবুদ্ধি আঁটছিল। পিঠটা যন্ত্রণায় জ্বলছে। মা এসেছিল তেল মালিশ করতে। মাকে সে কিছুতেই কাছে আসতে দেয়নি।

ওদের বাড়ির সামনে উঠোন। উঠোনের এক পাশে ধানের মরাই। একদিকে গোলা। আরও দূরে গোয়াল। দুধেল গাই ছিল দুটো। দুজোড়া হাল বলদ। একদিকে ঢেঁকি। পাশাপাশি বাড়ি ছিল দুই কাকার।

পাশাপাশি বাড়ি হলেও এক সঙ্গে চাষ করত তিন ভাই। এক সঙ্গে ধান কুটত মা-কাকিমারা। বিমলেরা ছিল দু ভাই। ছোট ভাই শ্যামলের বয়স পাঁচ। সে তখনো ন্যাংটো হয়ে ঘুরে বেড়াত। অত বড় ছেলে মাঝে মাঝে মাই খেত।

বিমলের ওপর ভার ছিল গোরুদের জাবনা দেবার। ঢেঁকিতে পাড় দেবার জন্যও ডাক পড়ত মাঝে মাঝে।

বিমল সেইদিনই ঠিক করেছিল সে পালিয়ে যাবে বাড়ি থেকে। কোথায় যাবে তা ভাবেনি। তবে পালিয়ে যাওয়াটা যে খুবই ঝুঁকির কাজ সে বুঝেছিল। কারণ দেশ পাকিস্তান হয়ে গেছে। মুসলমানদের হাতে গিয়ে পড়লেও তারা নাকি সুন্নত করে মুসলমান করে নেয়। তাদের পাঠশালায় দশ-বারোজন মুসলমান ছেলে পড়ত। তাদের মধ্যে একজন আনোয়ার আলি, তারই ক্লাসে পড়ত। সে বলেছিল, অনেক হিঁদুই নাকি মুসলমান হয়ে যাচ্ছে। মুসলমান হলে বিনা পয়সায় লেখাপড়া করতে পারা যাবে। খাওয়া-থাকাও ফ্রি। ঢাকায় নাকি সব ব্যবস্থাই আছে।

এই সব আকাশপাতাল ভাবছিল। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। বর্ষাকাল। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। চালের বাতা থেকে তক্ষক সাপ তিনবার ডেকে উঠল, তক্ষক। তক্ষক। তক্ষক।

ঘরে ঘরে আলো জ্বালাবার চল ছিল না সে সময়। রাতে পড়াশোনা বন্ধ ছিল। রান্নাঘরে শুধু একটা কেরোসিনের কুপি জ্বলছিল। মা রান্না করছেন সেখানে। কাঠের উনুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। মাঝে মাঝে নিবে যাচ্ছে। আবার চোঙার ভেতর

দিয়ে ফুঁ দিয়ে নিভন্ত কাঠ ধরানো হচ্ছে। বাবা দাওয়ায় বসে একটি কাটারি তক্তায় ঘষে ঘষে ধার দিচ্ছিলেন।

বিমল দাওয়ায় চাটাইর ওপর শুয়েছিল। তার পিঠের যন্ত্রণাটা বেড়েছে। ঠিক সময় অন্ধকারে খুট করে বাইরের দরজা খোলার শব্দ হল। দরজা মানে কঞ্চি আর চাঁচের দরজা। সেটা খুলে বেশ কিছুটা এগিয়ে এলে তাদের বাড়ির উঠোন পড়ে। উঠোনের পর দাওয়া।

বাবা হাঁক দিয়ে উঠলেন, কে?

অন্ধকারে ছায়ামূর্তি বলে উঠল, আমি মৌলবিসাহেব।

মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন। বাবার হাঁক শুনে পাশের বাড়ি থেকে দুই কাকা বেরিয়ে এসেছে। দিনকাল খারাপ যাচ্ছে। হিন্দুদের বাড়িতে চুরি-ডাকাতি লেগেই আছে।

মৌলবিসাহেবকে দেখে সবাই অবাক। রাতেরবেলা মৌলবিসাহেব! মৌলবির নাম শেখ কামালুদ্দিন। তিনি মিডল স্কুলের মৌলবি। বয়স হয়েছে। পাকা দাড়ি। নমশূদ্র সমাজের সঙ্গে তাঁর গভীর যোগাযোগ ছিল। মৌলবিকে এ পাড়ার সবাই শ্রদ্ধা করত। মৌলবিসাহেবের একমাত্র ছেলে ঢাকায় কোর্টে ওকালতি করে। সে ফজলুল হকের কৃষক পার্টি করে। গ্রামে খুব কম আসে। যখন আসে তখন সকলের সঙ্গে দেখা করে যায়।

সেই মৌলবিসাহেব রাতের বেলা?

তোমারে একডা খারাপ খবর দিতি আলাম।

কী খবর মৌলবিসাহেব? আপনার ব্যাটার কিছু হইছে নাকি?—মৌলবিকে দাওয়ায় চাটাইতে বসতে দিয়ে বাবা প্রশ্ন করলেন।

না, আমার পোলার কিছু হয় নাই। সে ভালোই আছে। তোমাগোর খুব বিপদ ভবেশ ভাই। এতদিন আমিই তোমাদের ভরসা দিয়া রাখছিলাম। আজ আমার কোনো ভরসা দিবার নাই।

কেন কি হইছে?

শোনো নাই কিছু? ধলাপুকুর থিকা কোনও খবর পাও নাই? পরান মণ্ডলের পোলার বউরে গুন্ডারা নিয়া গ্যাছে।

কারে কাজলেরে? এইতো সাতদিন হল বিয়া হল তার। আমরা নেমন্তন্ন গেছিলাম। অমন সুন্দর বউ। বাগদিপাড়ার মাইয়া। আপনি কয়েন কি মৌলবিসাহেব? কবেকার কথা কন?

কাইল রাতের খবর। আমাগোর পাড়ার কিছু লোক আছে এদের মাঝে। আনছার বাহিনীর যোগসাজশ আছে। খবরটা পাইয়াই তোমাদের দিতি আলাম। রাত না হলি তো বার হতি পারি না। লিগের লোকজনা চারধারে। আমার খবর তোমাদের বাড়িও হামলা হতি পারে। সময় থাকতি থাকতি এই বেলা হিন্দুস্থানে চইলা যাও ভবেশ

ভাই, আল্লার কিরা। এমন কথা তোমাগো কইতে হবে ভাবতে পারি নাই।

বিমল উৎকর্ণ হয়ে শুনছে। কড়ায় কি একটা চড়িয়ে দিয়ে এসেছিল মা। পোড়ার গন্ধ বেরুতেই মা ছুটে গেল রান্নাঘরে। তাড়াতাড়ি কড়া নামিয়ে চলে এসেছে দাওয়ায়।

মৌলবিসাহেব চলে গেছেন। ঠিক যেন বজ্রপতনের পরের মুহূর্ত। ঘটনার আকস্মিকতায় অবাক হয়ে গেছেন সবাই। ধলাপুকুর চরমুন্সির কয়েকটি গ্রাম পরেই। কাজল হল বিমলের মাসতুতো দাদার সদ্য বিয়ে করা বউ। চোদ্দো-পনেরো বছর বয়স হবে মেয়েটার। বউভাতে তারা সবাই গিয়েছিল। খুব ধুমধাম করে বিয়ে হয়েছিল মাসতুতো ভাই শঙ্করের।

মৌলবিসাহেব ঘটনার বিবরণ দিয়ে গেছেন। গতকাল রাতে একদল লোক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসে শঙ্করকে বেঁধে রেখে তার বউকে তুলে নিয়ে চলে গেছে। ওরা সঙ্গে পালকি নিয়ে এসেছিল। পালকি করে উঠিয়ে নিয়ে গেছে বউকে। প্রচণ্ড মারধর করে গেছে বাড়ির লোকদের। সোনাদানা, নগদ টাকা যা ছিল নিয়ে গেছে।

বিমলের বাবার নাম ভবেশ। দুই কাকা রমেশ ও তপেশ।

ভবেশ বড় বলে ভাইরা মান্য করে সবাই।

রমেশ বলল, দাদা তুমি যা কইবা তাই হবে।

ভবেশ বলছিল, আমার আর ভরসা নাই। বামুনপাড়ার, কায়স্থপাড়ার লোকেরা আগেই চলে গেছে হিন্দুস্থানে।

তপেশ বলেছিল, ওগোর সঙ্গে তুলনা করো ক্যান দাদা। ওগোর আত্মীয়স্বজন আছে হিন্দুস্থানে। আমাগোর কাছে কেডা? এই খেতি গোরু, পুকুর বাড়ি সব ফেইল্যা থুইয়া যাওন কি সোজা কথা? মৌলবিসাহেবের কথা ছাড়ান দাও। আমার সঙ্গে লিগের ন্যাতাদের খাতির আছে। আমাগোর কেউ কিছু কইব না।

ভবেশ গম্ভীর হয়ে যায়। অস্থিরভাবে পায়চারি করে। তারপর একটু ভেবে নিয়ে ডাকে, বড় বউ, শুনছ—

বিমলের মা গৌরী এসে দাঁড়ায় সামনে।

কী বলো?

শুনছ সব কথা?

শুনছি।

এখন তোমার মতটা কী?

গৌরী বলে, আমি মাইয়া মানুষ। আমি কতটুকুন বুঝি? তবে মৌলবিসাহেব বাড়ি বইয়া বলতি অ্যালেন যখন তখন নিচ্চয় কিছু—

তপেশ বলে, সেডাই তো সন্দেহ, ওঁর এত দরদ ক্যান? আমরা চলে গেলে এঁদের সবারই সুবিধা হয়; তাই না?

ভবেশ এবার ধমক দেয় ভাইকে—মৌলবি সাহেবরে সন্দেহ করস না। পাপ

হবে। উনি আমাদের ভালো চান। শোন! আমি ঠিক কইর‍্যা ফেলছি হিন্দুস্থানে যাবো। দুই-চারডা দিন সময় চাই শুধু। ধান টান যেটুকু আছে বেচার লাগব। কিছু নগদ পয়সা দরকার। এ ছাড়া আর কিছুর জন্য মায়া করি না। যদি বেঁচে থাকি, তাহলে আবার সব হবে।

তিনদিনের মধ্যে ওরা খবর পেয়েছিল তাদের মাসতুতো ভাইদের পরিবার দেশ ছেড়ে ছেড়ে চলে গেছে। তার দু দিন পরে রাত্তিরবেলা ভবেশ আর তার ভাই রমেশ পরিবারের সবাইকে নিয়ে নৌকোয় উঠল। এটাও মুসলমান মাঝির নৌকো। পরিস্থিতি বুঝে তারা চড়া দাম হেঁকেছিল। খুলনার ঘাটে পৌছে দেবে। নৌকোয় গিয়ে দেখল, আরও চারটি পরিবার যাচ্ছে তাদের পাশের গ্রামের কিন্তু তপেশ গেল না।

সে বলেছিল, আমি তোমাদের সম্পত্তি আগলাবো দাদা। যদি পাকিস্তানের অবস্থা বদলায় কোনও দিনও, তোমরা কিন্তু ফিরে আসবা। আমি তোমাদের এই খেতি জমিন, বাড়ি-ঘর সবই তোমাদের যেমন আছে তেমনি ফেরত দিমু।

কিন্তু সেদিন বিধাতা বুঝি অলক্ষ্যে হেসেছিলেন। ১৯৬৪ সালের দাঙ্গায় তপেশ মারা গিয়েছিল। তাকে টুকরো টুকরো করে কেটে তাদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল হামলাকারীরা। সেই আগুনে পুড়ে মরেছিল তপেশের ছোট ছেলে। বড় ছেলে তার মাকে নিয়ে কোনোরকমে পালিয়ে চলে এসেছিল ইন্ডিয়াতে।

তবুও দেশছাড়ার আগে অঝোরে কেঁদেছিল বিমলের মা আর কাকিমা। বর্ষার মেঘনা প্রমত্তা। ফুলে ফুলে উঠছে ঢেউ। মনে হচ্ছে এক একটা ঝাপটায় যেন তলিয়ে যাবে। আকাশের তারারা জ্বলজ্বল করে চেয়েছিল তাদের দিকে। বিমল নিস্পন্দ চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে। সারারাত এইভাবে চলার পর শেষ রাতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল জানে না। ভোর হতে সে তাকিয়ে দেখল মেঘনা পার হয়ে তাদের নৌকো ভৈরবে এসে পড়েছে। সারারাত দাঁড় বেয়ে বেয়ে মাঝিরা ক্লান্ত। ঘাটে নৌকো ভিড়িয়ে তারা বিশ্রাম নিল। ভবেশ বেরিয়ে গেল খাবারদাবার কিনে আনার জন্য। যাবার সময় শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিল বাক্সবিছানা সব ছইয়ের মধ্যে রেখে চাদর দিয়ে ঢেকে রাখতে। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবে, খুলনায় বিয়ে বাড়ি যাচ্ছে।

না, তেমন কেউ জিজ্ঞাসা করেনি। শুধু জল পুলিশের লঞ্চ তাদের নৌকোর ধারে এসেছিল। পুলিশের সঙ্গে তার কাকা রমেশের কী কথা হল চুপি চুপি। কাকা পকেট থেকে দশটা টাকা বার করে দিতেই তারা চলে গেল।

খুলনায় পৌছোল বিকেলবেলা।

খুলনার স্টিমার ঘাটে এসে দেখল তাদেরই মতো আরও অনেক পরিবার হিন্দুস্থান যাবার জন্য চলে এসেছে। ভবেশের মনে আছে ওখান থেকে রিকশা করে তারা রেলস্টেশনে গিয়ে পৌছেছিল। ট্রেন ছাড়বে পরদিন সকালে। টিকিট কাটার জন্য

স্টেশন মাস্টারকেও ঘুষ দিতে হল এক টাকা করে।

একেবারে শিয়ালদার টিকিট কেটেছিল তারা।

ভবেশ বলেছিল, একবার গিয়ে তো পড়ি শিয়ালদায়, তারপর দেখা যাক কী হয়।

খুলনা স্টেশনে গিয়ে জনারণ্য দেখে অবাক হয়ে গেল বিমল। সে ভেবেছিল তারা মাত্র কয়েকটি পরিবার চলে যাচ্ছে। কিন্তু খুলনা রেল-স্টেশনে এসে দেখল প্ল্যাটফর্মে তিল ধারণের জায়গা নেই।

বিমল কখনও ট্রেন দেখেনি। সে প্রথম ট্রেন দেখল।

অনেকগুলি ট্রেন তখনও স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। তার মধ্যে কয়েকটি গুডস ট্রেন। সাইডিং-এ গিয়ে একটি ইঞ্জিন ধাক্কা মারছে এক একটি কামরাকে। গুড়ুম করে শব্দ হচ্ছে। বিমল পরে শুনেছিল একে বলে শান্টিং করা।

ভবেশ বলেছিল বর্ডার না পেরোনো পর্যন্ত শান্তি নেই বাবা। মায়ের কাছে কাছে পাহারায় থাকবা। শ্যামলরে চোখে চোখে রাখবা। রমেশের দুই মেয়ে শ্যামা আর জবা। তারা অবশ্য মায়ের সঙ্গ ছাড়েনি এক মুহূর্ত। দুই দুরন্ত ছেলেকে নিয়েই ভবেশের ছিল যত ভয়।

ওই স্টেশন প্ল্যাটফর্মেই ভবেশের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল আরও নমশূদ্র পরিবারের। অনুকূল দাস এসেছিল তাদের পাশের গ্রাম থেকেই। মটবেড়িয়া গ্রাম থেকে এসেছিল সুরেন ঘরামি। চতুলিয়া থেকে নটবর মিস্ত্রি। সবাই এসেছে পরিবার নিয়ে। নটবর মিস্ত্রির সঙ্গে এসেছিল তার নব্বই বছরের বাপ ঘনশ্যাম মিস্ত্রি।

নটবর বলল, পড়শিরা কেউ আসে নাই। হিন্দুদের মধ্যে আমাদের পাড়ার আমরাই শুধু আসছি। বাপরে পড়শিরা রাখতে চেয়েছিল। তারাই বলছিল বুড়ারে কোথায় নিয়া যাইছ অনিশ্চিতের মধ্যে। তার চেয়ে থুইয়া যাও এহানে। কিন্তু যাবার বেলা বুড়ার সে কি কান্না। কচি ছেলের মতো কাঁন্দে বুড়া। কয়, আর ক-টা দিনই বা বাঁচবো। আমারে কোথায় থুইয়া যাও? মরতে হয় হিন্দুস্থানে গিয়া মরব।

বিমলের ভারি মায়া লেগে গিয়েছিল বুড়োর ওপর। মাটিতে একটা চাদর পেতে প্ল্যাটফর্মের ওয়েটিং হলে শুয়েছিল বুড়ো।

বিমল গিয়ে গায়ে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, দাদু, ও দাদু?

কেডা?

আমার নাম বিমল।

বিমল? কোন্ গ্রামে বাড়ি?

চরমুল্লি।

বাপের নাম ক?

ভবেশ মণ্ডল।

অ। চরমুল্লি? তোগোর গ্রাম দেখছি একবার। ফুটবল খেলতে গেছিলাম। তহন

তোর মতো ছোট ছিলাম। হিন্দুস্থান যাচ্ছস?

হ্যাঁ। তুমিও তো হিন্দুস্থান যাও তাই না দাদু?

হ। যদি মরি সেখান গিয়াই মরুম। টেরেন দেখছস?

হ।

কহন আমাদের টেরেন ছাড়বে কে জানে?

বাপে কইল কাইল সকালে।

কলকেতা তো যাই নাই কোনওদিন। একবার বরিশাল টাউনে টকিতে কলকেতার ছবি দেখছিলাম।

দাদু, ও দাদু।

অ।

কলকেতার বাড়িগুলা নাকি দশ-বিশ তলা উঁচা উঁচা।

হ। আরও উঁচা করতে পারত। কিন্তু উড়ো জাহাজ কোম্পানি থেকে মানা আছিল। তাহলে বাড়ির সাথে জাহাজের ধাক্কা লাগতে পারে।

বুড়োর সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল বিমলের। গোটা যাত্রীদলের কাছে বুড়ো ছিল পরগাছার মতো। সে কিছু কথা বলতে গেলে কেউ তার কথা শুনত না। শুধু বিমলই ছিল তার কথার একমাত্র শ্রোতা।

খুলনা স্টেশনটা ঘুরে ঘুরে দেখছিল বিমল। যত রাত্তির হচ্ছে পোঁটলা পুঁটলি বাক্স প্যাঁটরা নিয়ে মানুষ আসছে। স্টেশনের খোলা প্ল্যাটফর্মে ইট পেতে উনুন ধরিয়ে অনেকে রান্না চড়িয়ে দিয়েছে।

সমস্ত মানুষের চোখে আশা ও আতঙ্ক মিলিয়ে এক অদ্ভুত ধরনের উদভ্রান্তি। কেউ ভেবেচিন্তে সুবিধের পাঁজি খুলে ঘর ছাড়েনি। হঠাৎ এক উন্মাদনার বশে তারা ভেবেছে তাদের এই দেশ, এই মাটি, এই নদী আর তাদের কাছে নিরাপদ নয়। জীবনের দাবি তাদের কাছে আরও বড়।

বিমল দাঁড়িয়ে আছে স্টেশনের সামনে। এখন কোনো ট্রেন নেই। তাই গেট থেকে চেকারবাবুরা চলে গেছেন। চা-এর দোকানে গরম চা বিক্রি হচ্ছে। বাংলায় বড় বড় করে লেখা চা প্রস্তুতের প্রণালি।

বিমলদের গ্রামে চা-এর চল ছিল না সেই সময়। চা-এর দোকানও ছিল না। গ্রামে যারা দুএকজন শিক্ষিত উচ্চবর্ণের পরিবার ছিল তাদের বাড়িতে চা হতো, কিন্তু ছোটরা কেউ চা খেতে পারত না। বিমল কখনও চা খায়নি। এমনকী এত লোককে এক সঙ্গে চা খেতে দেখেনি। বিমল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চা খাওয়া দেখছিল। সেই সময় একজন এলেন, একটু বয়স্ক ভদ্রলোক। মাথার চুলে দু-একটা পাক ধরেছে। পরনে আধময়লা ধুতি। গায়ে লংক্লথের পাঞ্জাবি। সে সময় ইস্ত্রি করা জামা কাপড় পরাকে শৌখিনতা বলে ধরা হত। কাজেই ইস্ত্রির কোনও প্রয়োজনই ছিল না।

ভদ্রলোক বিমলকে দেখে বললেন, খোকা তুমি কি খুলনে থাকো?

বিমল বলল, না। আমরা বরিশাল থিকা আসছি।

যাবা কোয়ানে?

বিমল কী বলবে ভেবে পেল না। চারিদিকে পাকিস্তানের পুলিশের লোকজন ঘুরছে। সন্দেহের চোখে অনেকে তার দিকেও তাকাচ্ছে। তার বাবা বারণ করে দিয়েছিল কোথাও যাবি না। এহানে থাকবি। যদি দেখি এদিক-ওদিক ঘুরতাছিস তোরে ফেলে থুয়ে চলে যাবো কয়ে দিলাম।

কিন্তু বিমলের একজায়গায় চুপ করে বসে থাকতে ভাল লাগে না। সে চলে এসেছে প্ল্যাটফর্মের টিকিট ঘরের দিকে।

লোকটিকে সত্যি কথা বলবে কিনা সে ভেবে পেল না। অথচ দেখে তো মনে হয় হিন্দু। অন্তত কোনও বদ মতলব আছে বলে তো মনে হয় না।

তাকে চুপ করে থাকতে দেখে লোকটি বলল ঃ তোমরা নিশ্চয়ই হিন্দুস্থান যাও? তোমার বাবা কোয়ানে? আমি একটু কথা কবো। শোনো, তোমারে বলি, আমার বাড়ি বাগিরহাট। আমার বউ আর মেয়েরি হিন্দুস্থান পাঠাতি চাই। কলকাতায় আমার জ্যাঠারা থাকে। বেহালায় শখেরবাজার আছে সেখানে বাড়ি। তাদের সেখানি পৌছি দিলিই চলবে। তোমার বাবা কোয়ানে?

বিমল তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। বলল, আয়েন আমার লগে।

ভবেশ রমেশের সঙ্গে কি একটা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছিল। গৌরী বিমলকে দেখতে পেয়ে ধমকে উঠল। কোথায় থাকস। ফ্যান-ভাত রাঁধছি। খাইয়া আমায় উদ্ধার করো। তারপর হঠাৎ অপরিচিত ভদ্রলোককে দেখে মাথায় ঘোমটা টেনে সরে গেল।

ভবেশ বলল, বাবা, ইনি আসছেন তোমার কাছে। ভবেশ একটু সন্দেহ মেশানো দৃষ্টি নিয়ে তাকাল।

ভদ্রলোক বললেন, নমস্কার, আমার নাম বিধুভূষণ গায়েন। আমার বাড়ি বাগিরহাট। আপনি?

ভবেশ বলল, ভবেশ মণ্ডল। বরিশাল জেলার চরমুন্সি।

বিধুবাবু বললেন, বড় বিপদে পড়ে গেছি ভাইডি। আমি বাগিরহাট কোর্টে মোক্তারি করি। আমার গিন্নি আর মাইয়াডারে ওপারে পাঠাইয়া দিতি চাই। খুলনোর রবি চৌধুরীর যাবার কথা ছিল। তাঁরে তো দেখতিছি না। এখন আমি পড়িছি বিপদে। কোথাই বা এদের নিই যাই। বেহালায় আমার জ্যাঠারা থাকে শখেরবাজারে, দুই জ্যাঠা রেলি চাকরি করে। ঠিকানা টিকানা সব আছে। কলকাতায় পৌছে যদি ও দুডোরে শখেরবাজার পৌছে দিই আসেন।

ভবেশ অসহায়ভাবে বলল, দ্যাহেন, আমরা তো কলকেতেয় এক্কেবারে নতুন। নিজেদেরই কিছুই ঠিক-ঠিকানা নাই।

বিধুভূষণ বললেন, না, না, আপনাদের কোনও অসুবিধা হবেনানে। আমি ওদের হাতে খরচ খরচা যা লাগে দিয়ে দিচ্ছি। তেমন বুঝলি শুধু একটা ট্যাক্সি করে উঠেয়ে দেবেন।

আপনি সঙ্গে যাচ্ছেন না কেন?

মোটামুটি বাগিরহাটে আমার পসার ভালো। মক্কেলরা সবাই মোসলমান। তারা বলে মোক্তারসাহেব আমরা থাকতি আপনারা যাবেন না। আমরা আছি কী করতি? কিন্তু মন মানে না। ত্রিশ জন হিন্দু উকিল ছিলাম কোর্টে। এখন মাত্র পাঁচ জন আছি। হিন্দু মেয়ে নিয়া টানাটানির খবর আসছে। কেসও করছি কয়েকডা। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশকে এনকোয়ারি করতি পাঠালি রিপোর্টই আর আসে না। হিন্দুদের কাউরে রিলিফ দিতি পারতিছি না। সবুর মিঞার নাম শুনছেন তো?

শুনি নাই আবার? ওই তো খুলনেয় রায়ট লাগায়।

হ্যাঁ, ওই সবুর মিঞার লোকজন যা-তা অত্যাচার শুরু করে দেছে। কোনও প্রোটেকশন নাই। আমি যে কদিন পারি থাকি। প্রাণে মারলি মারবে। কিন্তু মাইয়াডা বড় হচ্ছে। আমার স্ত্রী তো একদম থাকতি চাইলেন না। আমার জ্যাঠারে লিখছি। তিনি তো লিখছেন, পাঠায়ে দাও। দেখা যাক কী করা যায়।

ভবেশ কি ভেবে বলল, ঠিক আছে, দ্যান আপনার পরিবারেরে আমার সঙ্গে। তারা আছে কোথায়?

বেনিয়াখামারে আমার এক বন্ধু আছে—মনমোহন চাটুজ্জে। তাদের কাছে রাখিছি। টেরেনের সময় কিছু জানতি পারলেন?

কাল ভোরে ছাড়বে।

টিকিট কখন দেবে?

শেষ রাতে। এহন যে লাইন ল্যাগছে দ্যাখছেন না। আপনার লাইনে লোক আছে কেউ।

না আমি তো জানি না। এখন কি করি কন দেখি।

ভবেশ বলল, আপনি আমারে টাহা দে যান। পরিবারেরে এখনই নে আসেন। লাইনে আমার লোক আছে। দেহি কি করতে পারি। টিকিট পিছু পাঁচ টাকা করে ঘুষ না দিলে নাকি টিকিট দেচ্ছে না।

বিধুভূষণ বললেন, ঠিক আছে ভাইডি। টাকার জন্যি আপনি ভাববেন না। আপনি শুধু আমায় সাহায্য করেন। ইস্টিশনে এসি চেনাজানা কাউকে না পেয়ে আমার হাত-পা পেটের মধ্যি সিঁধিয়ে গেছে।

ভবেশ বলল, আপনি কিছু ভাববেন না। ভগবানেরে ডাকেন ভালোয় ভালোয় যাতে ওপারে পৌছোতে পারি।

সেদিন সারারাত ভবেশরা কেউ ঘুমোয়নি। রাত দশটা নাগাদ বিধুভূষণবাবু তাঁর মেয়ে ও বউকে নিয়ে এলেন।

এই আমার মেয়ে ময়না। আর ইনি ওয়াইফ।

বিমল ময়নার দিকে তাকিয়ে দেখল। কালো গায়ের রং। একটু লম্বাটে চেহারা। তবে বেশ রোগা। বয়সে তার চেয়ে ছোট। বিমলের বয়স এখন বারো। ময়না তার চেয়ে দু বছরের ছোট, দশ বছর বয়স তার। ক্লাস ফাইভে পড়ে।

ময়নার মা-এর গায়ের রংও কালো। তবে ছোটখাটো শরীর। তাঁর হাতে ছিল একটি সুটকেশ। ময়নার হাতে একটি কাপড়ের পুঁটলি। ময়নার মা কোনও কথা বলছিল না। ঘোমটা টেনে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল।

গৌরী কাছে ডেকে নিয়ে এল। আয়েন দিদি। বয়েন। খাওয়া দাওয়া সাইরা আইছেন তো? ময়নার মা ঘাড় নাড়ল।

শেষ রাতে টিকিট দেওয়া শুরু হল। ভবেশ গিয়ে দেখল টিকিট ঘরের সামনে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। কোথা থেকে লাঠি হাতে কয়েকজন পুলিশ এসে গিয়েছে। বিহারী পুলিশ। পুলিশগুলিই বেশি করে গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলছিল। লাইনে দাঁড়ানো লোকগুলির কাছে গিয়ে পয়সা আদায় করছিল। আর যে দিতে অস্বীকার করছিল, তাকে রুল দিয়ে গুঁতোতে গুঁতোতে বার করে দিচ্ছিল।

টিকিট পেয়ে ভবেশের মনে হল হাতে স্বর্গ পেয়েছে। ভোরের আলো ফোটবার সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যাটফর্মে এসে ঢুকল বরিশাল এক্সপ্রেস। সবুজ রং করা গাড়ি। উর্দুতে আব বাংলায় লেখা পাকিস্তান রেলওয়ে।

তারপর ট্রেন থামামাত্র সবাই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কম্পার্টমেন্টের ভেতর। ভবেশ ও রমেশ দুজনেই শক্তি ধরত তখন। পেশিবহুল হাত দিয়ে তারা ভিড় সামলে তাদের গ্রামের লোকদের ওঠার জায়গা করে দিল। ভবেশ বিধুভূষণের মেয়ে বউকে উদ্দেশ করে বলল, বউঠান, তাড়াতাড়ি উঠে পড়েন। ওরা দুজনে উঠে গেল। কিন্তু বিধুভূষণ তাদের পিছনে উঠতে যাচ্ছিলেন। এক ঝটকায় তিনি দরজা থেকে প্ল্যাটফর্মের ওপর পড়ে গেলেন। ভবেশ তখন ভেতরে ঢুকে গেছে। সে বলল, এই দ্যাহো দ্যাহো উনি পইড়া গ্যালেন। তোমরা কেউ ধরো। কিন্তু কে ধরে তুলবে তাঁকে।

সবাই ওঠার জন্য ব্যস্ত।

ময়না শুধু জানলা দিয়ে বাবাকে পড়ে যেতে দেখে বাবাগো বলে কেঁদে উঠল।

বিধুভূষণ নিজে নিজেই উঠলেন। তাঁর তেমন কিছু আঘাত লাগেনি।

ট্রেন ছেড়ে দিল। প্ল্যাটফর্ম থেকে হাত নাড়তে নাড়তে বিধুভূষণ শুধু বললেন, কলকাতা পৌঁছিয়া চিঠি দিস।

বসার জায়গা নিয়ে ঝগড়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। ভবেশ তার দলের সকলের বসার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। ময়না ও তার মা-ও বসার জায়গা পেয়েছিল। কিন্তু তখনও যাত্রীদের অনেকে বসার জায়গা পায়নি। তা বাদে এক একজন যাত্রীর বাক্স-প্যাঁটরা হাঁড়ি কুড়ি বাসন কোশনের সংখ্যাও ছিল অনেক। সেই সবেতেই জায়গা

ভরে গিয়েছিল।

এদের মধ্যে একজনের সঙ্গে ঝগড়া বেঁধে গেল রমেশের সঙ্গে। লোকটি বলল, আপনাদের মাইয়াডারে কোলে লন না। তাহলে আমাদের একজন বসতে পারে।

রমেশ রেগে গেল।

আচ্ছা গাড়োলের মতো কথা কন আপনে। এত বড় মাইয়ারে কোলে লইয়া বসন যায়?

কিন্তু আমরাও তো টিকিট কাটছি। কলকেতা পর্যন্ত দাঁড়ান দাঁড়ান যাওয়া যায়?

সেডাতো আপনার দোষ। এত মালপত্র আনছেন ক্যান? মেঝের ওপর বইয়্যা ছসাতজন যাইতে পারে।

গাড়লের মতো কথা কনতো আপনে। আমরা কলকেতা যাইতেছি না। কয়ডা জিনিসই বা আনছি।

আনছেন তো মুলুক। যা আছিল, সব ছালায় বাঁধিয়া আনছেন, এখন দাঁড়ান গিয়া। ফ্যাচ ফ্যাচ করবেন না।

একটু একটু করে ঝগড়া বেধে গেল। ভবেশ এসে থামিয়ে দিল। সে ময়নাকে বিমলদের বেঞ্চে বিমলের পাশে বসিয়ে দল। একটা জায়গা হয়ে গেল। কোনোরকমে বসার জায়গা পেল লোকটির বউ।

একটু পরে ভবেশের সঙ্গে আলাপ জমে গেল লোকটির। দেখা গেল কোনওরকমে তার জায়গাও হয়েছে।

আলাপ-পরিচয়ে জানা গেল লোকটির নাম শিবকৃষ্ণ ঘরামি। ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ থানার বাজোরিয়া গ্রামে বাড়ি।

আরে, আপনে আমাদের স্বজাতি। তা আগে কইবেন তো? ন্যান বিড়ি খান একটা।

পকেট থেকে বিড়ি বার করে এগিয়ে দিল ভবেশ।

শিবকৃষ্ণ বিড়িটা নিয়ে বাঁ হাতের তালুতে ঠুকে বলল, আপনারা কত জনা? কোন গেরাম?

চরমুন্সি, বরিশাল জেলা।

আমাদের গেরাম বরিশালের বর্ডারে। গৌর নদীর কাছে।

গেরাম ছাড়লেন ক্যান? আপনাদের গেরামেও কি দাঙ্গা?

না ঠিক আমাদের গেরামে কিছু হয় নাই। পুলিশ থেকে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে দিল, গ্রামে দাঙ্গা লাগতে পারে। যারা চায় তারা থানায় এসি আশ্রয় নিতি পারে। তা থানায় দেখতে দেখতে দশ হাজার লোক হয়ে গেল। আমরা তখন ভাবলাম আর থাহা যায় না। গৌর নদীতে কয় কোরোশ দূরি যদি এই অবস্থা হয়, তাহলি আর তো পাকিস্তানে থাহা যায় না।

আমরা গেরামের আট-নয় ঘর নমশূদ্র পরিবার আইছি। আমার ভাইরে কপাল

ঠুকে রাখি আইছি।

আপনার কাজ-কাম কী ছিল?

সোনার কাম করতাম। কিন্তু যন্ত্রপাতি কিছুই আনি নাই। ওগুলোর ওপর আমার বড় মমতা ছেল। কিন্তু যদি বর্ডারে কাড়ি রাখি দেয়। সেই ভয়ে আনলাম না। ভিটের জিনিস ভিটেয় থুয়ে আইছি। ভগবানের কি ইচ্ছা জানি না। যদি তিনি দেন তো আবার সব হবে।

বিমল জানলা দিয়ে দুপাশের চলমান দৃশ্য গিলছিল। ট্রেনে চাপা তার কাছে যেন একটা স্বপ্ন। কি বিরাট জোরে ট্রেন ছুটে চলেছে অথচ তারা কেউ ছিটকে পড়ে যাচ্ছে না। সে শুনেছিল ট্রেন যখন চলে তখন সব কিছু নাকি এত জোরে দোলে যে কিছু একটা না ধরে কিছুতেই বসে থাকা যায় না। কিন্তু এই তো তারা দিব্যি বসে আছে।

আচ্ছা ওগুলো কিসের তার?

বিমলের মনে ছিল না কখন তার পাশে ময়না এসে বসেছে। সে ময়নার দিকে তাকাল। ময়নাও তাকিয়ে দেখছিল মুগ্ধ বিস্ময়ে। সে বাগেরহাটে ছোট ট্রেন দেখেছে। কিন্তু এত বয়স পর্যন্ত ট্রেনে ওঠেনি।

বিমল বলল, ওগুলো টেলিগ্রাপের তার। টরেটক্কা করে খপর হয়। ক্যান তোমাদের বাগেরহাটে টেলিগ্রাপ নাই?

ময়না বলল, আমি খেয়াল করি নাই। আমরা তো পশ্চিম-পাড়ে থাকি। শহরে বেশি আসি না।

তোমাদের বাগেরহাটে সাত গম্বুজ মসজিদ আছে না? কালা পাহাড় ধলা পাহাড় বলে দুইডা কুমির আছিল শুনছি, দ্যাখ্‌ছ?

একবার গেছিলাম। কুমির দেখিনি।

সারাপথ যেতে যেতে ময়নার সঙ্গে বেশ ভাব জমে গেল বিমলের।

বরিশাল এক্সপ্রেস কোনও স্টেশনে থামছিল না। শুধু যশোর স্টেশনে এসে থামল কিছুক্ষণের জন্য।

খুব খিদে পেয়েছিল বিমলের। ভবেশ লুচি-তরকারি কিনে বিমল ও ময়নাকে দিল। ময়নার মা দাম দিতে গিয়েছিল। ভবেশ বলল, অপরাধ নেবেন না বউঠান। ময়না কি আমার মাইয়া নয়? মোক্তারমশায় আমার ওপর যতটুকু ভার দে গেছেন ততটুকুন আমারে করতে দ্যান।

বেনাপোলে ট্রেন থামতেই সকলের মুখ থমথমে হয়ে উঠেছিল। যেন এক ভয়ংকর বিপদের মুখে পড়েছে ওরা। গৌরী তখন হরিচাঁদ ঠাকুরকে ডাকছে বারবার। তাদের সম্প্রদায়ের মহাপুরুষ হরিচাঁদ ঠাকুর। ঈশ্বরের সাক্ষাৎ অবতার বলে সবাই মানে তাঁকে। মা প্রায়ই বলত যখন কোনো বিপদ আপদ দেখবা হরিচাঁদ ঠাকুরে মনে মনে স্মরণ করবা। দ্যাখবা সব বিপদ কাইটা গ্যাছে গিয়া।

ভবেশ বেনাপোল আসার আগেই সবাইকে সাবধান করে দিয়েছে, কাস্টম কিংবা পুলিশের লোক আইলে তোমরা কেউ কথা কবা না। কী বলতে কি বলে ফ্যালবা। যা বলার আমি বলব।

ট্রেন থামতেই পুলিশ নিয়ে উঠল কাস্টমসের লোক। প্রত্যেকের বাক্স প্যাঁটরা খুলে তন্নতন্ন করে সার্চ শুরু করল। পেতলের থালা গেলাস যা দেখল নিয়ে নিল। বাক্সের মধ্যে পুঁটলি বেঁধে কিছু সোনার গহনা নিয়ে যাচ্ছিল একটি পরিবার। নতুন বউ। সবে বিয়ে হয়েছে। তাই হয়তো ভেবেছিল গায়ে গহনা পরে যাওয়া নিরাপদ নয়। সমস্ত গহনা নিয়ে নেওয়াতে নতুন বউ আর শাশুড়ির কাস্টম অফিসারের পা জড়িয়ে ধরে সে কী কান্না।

এবার অফিসারটি এল ভবেশদের কাছে।

কই যাও?

হিন্দুস্থান।

কতজন আছ?

আঠারো পরিবার।

তারপর বিধুভূষণ ও শিবকৃষ্ণ ঘরামির পরিবারের কথা মনে পড়তেই সংশোধন করে নিয়ে ভবেশ বলল, না, না বিশ পরিবার।

ঠিক করে বলো।

ঠিক কইছি ছার। বিশডা পরিবার আছি আমরা।

সোনাদানা সব নে যাচ্ছ হিন্দুস্থানে। পাকিস্তানের খাইয়া পাকিস্তানের পয়সায় বেইমানি? সোনা কি আছে বার করো?

কিছু নাই ছার। মাইয়াদের হাতে কানে যেডুক আছে।

সার্চ করে যদি পাই তাহলে চড় চাপড় খাবা কিন্তু। ইদ্রিস মিঞা ওদিকে হাঁ করি দ্যাছে কি—শাকিনা বিবিরে ডাকো। মাইয়া ছেলেদের বডি সার্চ করুক। কিছুক্ষণের মধ্যে একজন মহিলা এল। এরই নাম শাকিনা। কাস্টমসের লেডি ইন্সপেক্টর! সে এসে প্রথমেই গৌরীকে ধরল। তারপর বলল, আমার সঙ্গে নামো। অফিস ঘরে নে সার্চ করব।

কেঁদে উঠল গৌরী। ভবেশ অফিসারকে বলল, মিঞাছাহিব, একডু শোনেন।

অফিসার এসে বলল, কী কও?

ভবেশ ফিশফিশ করে বলল, পেলাটফর্মে নামেন না। একডু কথা ছেল।

প্ল্যাটফর্মে নেমে ভবেশ কানে কানে বলল, কেন মা বোনের ইজ্জত নে টানাটানি করতিছেন ছার। আমরা বিশ ফ্যামিলি আছি, একশ টাহা দিচ্ছি। বিশ্বাস করেন, সোনাদানা আমরা কোথায় পাব? চাষি মানুষ। আমাদের ঘরে ধান চাল ছাড়া আর কিছু থাহে না। এই টাকাডা নে আমাদের ছাড়ান দেন ছ্যর।

শেষ পর্যন্ত একশো বিশে রফা হল। ওরা আর সার্চ করল না।

ওরা চলে যাবার পর অফিসার বাহিনীর দু তিনজন এসে বলল, আমাদের টাহাটা দিয়া যান।

আপনারা কারা?

আনছার বাহিনী। এতক্ষণ ধরে আপনাদের পাহারায় ছেলাম। খরচটা দে যান।

খরচ কিসের খরচ?

সেডা পরে জেনে নেবেন। এহন বুদ্ধিমানের মতো যা পারেন দিয়া দেন।

দশটাকা দিতেই লোকগুলি খুশি হয়ে চলে গেল। বেনাপোল থেকে তিন ঘণ্টা পরে ছাড়ল ট্রেন। দারুণ আনন্দে তখন অধীর হয়ে উঠেছে সবাই। এর পরের স্টেশনই ভারত। না পরের স্টেশন কেন, মাত্র পাঁচমিনিট যাবার পরই কে যেন বলে উঠল আমরা ভারতে আইয়া পড়ছি। ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া.....

এক মুহূর্তের মধ্যে ট্রেনের ভেতর শোরগোল পড়ে গেল। সবাই জানালা দিয়ে ঝুঁকে দেখছে। ইন্ডিয়ার গাছপালা মানুষজন সব কি আলাদা নাকি? কই তা তো মনে হয় না। এমনকী একটি ঘাসের রং পর্যন্ত বদলায়নি। তাহলে এটার নাম ভারত ওটার নাম পাকিস্তান হল কেন?

নটবর মিস্ত্রির বুড়োবাবা ঘনশ্যামকে সবাই মিলে বাংকের ওপর তুলে দিয়েছিল। আধশোওয়া অবস্থায় দলামলা করে শুয়েছিল বুড়ো। সারা রাস্তা ধরে ঘুমিয়ে এসেছে। যশোরে বোধহয় একবার বলেছিল, ও লটবর, একটু জল।

নটবর ধমক দিয়ে উঠেছিল, জল এখানে পাব কোয়ানে? জল খেলে আবার প্রচ্ছাব লাগবে। জল খাইয়ো ইন্ডিয়ায় গিয়া।

দেখতে দেখতে ট্রেন এসে ঢুকল বনগাঁ জংশনে। ট্রেনের যাত্রীদের মধ্যে উল্লাস দেখে বুড়ো জিজ্ঞাসা করল, ও লটবর। হিন্দুস্থান আইল নাকি?

নটবর মিস্ত্রি প্রথম কথাটার জবাব দিল না। দ্বিতীয়বার ডাকল বুড়ো, অ লটবর।

ভবেশ এবার উঠে দাঁড়িয়ে বলল, হ্যাঁ দাদু আমাগোর দুঃখের অবসান হইল। বনগাঁয় আইসা পড়ছি আমরা।

বনগাঁ, তার মানে হিন্দুস্থান।

হ্যাঁ দাদু।

জয় বাবা হরিচাঁদ ঠাকুরের জয়। এহেনে কতক্ষণ থামবে বাপ?

তা কইতে পারব না দাদু। তবে থামব কিছুক্ষণ। বর্ডার ছিলিপ নেতে হইব এহান থেকে।

বনগাঁ স্টেশনে প্ল্যাটফর্মে নামার অনুমতি পেয়েছিল বিমল। একজনকে জিনিসপত্র চৌকি দেবার জন্য রেখে যাত্রীরা প্রায় সবাই নেমেছিল। বর্ডার স্লিপ নেবার জন্য দু-তিনটা লাইন পড়েছে। আর এক জাগয়ায় চিঁড়ে গুড় দেওয়া হচ্ছে তার লাইন। গোটা প্ল্যাটফর্ম জুড়ে থিক থিক করছে লোক। অনেকে ঘর-সংসার পেতেছে। তারা এসেছে পায়ে হেঁটে। গোরুর গাড়িতে। যশোর খুলনার লোক। বর্ডার পেরিয়ে এসে

বনগাঁ স্টেশনে উঠেছে। কোথায় যাবে এখনও ঠিক করতে পারেনি। তবে তারা কলকাতায় যেতে চায় না। কাছাকাছি কোথাও পুনর্বাসন চায়।

ভবেশের সঙ্গে স্টেশনে আলাপ হল একটি লোকের। নাম জীবন বিশ্বাস। বাড়ি তাদের গ্রামের কাছে চ্যাংরাখালিতে। সে চলে এসেছে ১৯৫১ সালে। এখন থাকে গোবরডাঙাতে। প্রথমে একজনের বাড়ি ভাড়া ছিল। এখন পাঁচকাঠা জমি কিনে বাড়ি করেছে। সে বনগাঁ কোর্টে চাকরি করে। রোজ যাতায়াত করে। ভালোই আছে এখন।

জীবন বিশ্বাস বলল, তহন তো অত ভিড় ছিল না। যারা আগে আসছে চাকরি-বাকরি পেয়েছে মোটামুটি। আমার মাইনর পাশ করা ছিল। চাকরি পাইয়া গেলাম।

কিন্তু ভবেশ তো অত লেখাপড়া শেখেনি। সে ক্লাস থ্রি পর্যন্ত পড়েছে। তার ভাই রমেশও ক্লাস থ্রিতে উঠে আর পড়েনি। চাষবাসটাই ভালো জানে সে। চাষ ছাড়া বেতের কাজ করতে পারে। কিন্তু পুরুষানুক্রমে চাষবাস করে এসেছে তাদের পরিবার। মাটি গায়ে না মেখে জামা-কাপড় পরে ভদ্রলোক হয়ে অফিসে কাজ করতে তার মন চায় না। আর অফিসে বসে কী কাজ করবে? আরদালির? বাবুদের ফাইফরমাশ খাটার? না একাজ সে করতে পারবে না। তাদের একটা বংশমর্যাদা আছে। সমাজে তাদের প্রতিপত্তি ছিল। বামুন কায়েতরাও তাদের সঙ্গে সম্ভ্রমের সঙ্গে কথা বলত। কখনও তারা ভাবেনি উদ্বাস্তু হয়ে এইভাবে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে।

যে করেই হোক চাষের জমি তার চাই। চাষ ছাড়া সে বাঁচতে পারবে না।

বিমল মুগ্ধ বিস্ময়ে বনগাঁ স্টেশনের জনস্রোত দেখছিল। স্টেশনের ওপরে একটি পতাকা উড়ছে। ওপরের দিকটা হলুদ, মাঝখানটা সাদা, নীচে সবুজ। সাদার মাঝখানে চক্র। সে শুনেছিল ইন্ডিয়ার পতাকা এইরকম তিনরঙের। তাদের পাকিস্তানের পতাকা সবুজ। মাঝখানে চাঁদ তারা। এই পতাকা প্রতি বছর তুলতে হত তাদের বাড়িতে। সব হিন্দু বাড়িতেই তুলতে হত। মুসলমানেরা কেউ তুলত, কেউ তুলত না।

বিমল দেখল স্টেশনের দেওয়ালে খবরের কাগজের ওপর লাল কালি দিয়ে সাঁটা। তাতে লেখা পুনর্বাসনের দাবিতে মহকুমা শাসকের অফিস ঘেরাও।

কোথাও ছাপানো পোস্টারে লেখা—বিরাট জনসভা। বক্তা—কম. বঙ্কিম মুখার্জি, জ্যোতি বসু। স্থান—বনগাঁ টাউন হল ময়দান।

আরও কতগুলি পোস্টার—চলিতেছে পথের পাঁচালী। হীরামহল সিনেমা।

ভবেশ এসে বিমলকে বলল, তোরা চিঁড়ার লাইনে দাঁড়া। আম বর্ডার ছিলিপের জন্য যাই।

বিমল লাইনে দাঁড়াতে গিয়ে দেখে কখন এসে তার পাশে দাঁড়িয়েছে ময়না।

বিমল বলল, তোর খুব খুদা লাগছে তাই না ময়না?

ময়না ঘাড় নেড়ে বলল, কই না তো?

বিমল বলল, আমারে মিছা কইসনা। তোর মুখ দেখা বুঝঝি আমি।

তুমি কি জান নাকি মুখ দেখে বোঝবা?

যদি কই জান।

ইস বিশ্বাস হয় না।

হ্যাঁরে মাইরি কই। তোরে ছুঁইয়া বলছি আমি যা ভাবি তাই হয়। একবার আমারে বাবায় খুব মারল, আমি দ্যাশে বইয়া বইয়া ভাবছিলাম পলাইলে ক্যামন হয়। দ্যাখ সেই পলান গেল তো? তবে একা না পলাইয়া সবাই মিলিয়া পলালাম।

ময়নার হাত ধরা ছিল বিমলের মুঠোর মধ্যে। হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেয়ে বিমল লজ্জা পেল। সলজ্জ হেসে ময়নার হাতটা ছেড়ে দিল।

পিছন থেকে ঠ্যালাঠেলি শুরু হয়েছে। একজন পুলিশ এসে রুল দিয়ে গুঁতোচ্ছে সামনে যাকে পাচ্ছে তাকে।

এই এগিয়ে চলো। এগিয়ে চলো।

অন্যমনস্কভাবে এগিয়ে যেতে যেতে বিমল ভাবছিল কেমন যেন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে সব কিছু। কিছুদিন আগেও দিগন্ত ছোঁওয়া আলপথ দিয়ে যেতে যেতে সে ভাবতে পারত না মেঘনার ওপারে কোনো দেশ আছে। শুধু মাঝে মাঝে অকূল গাঙে ভেসে যাওয়া নৌকোগুলোকে দূর থেকে দেখে মনে হত কোথায় কোন নিরুদ্দেশে যাত্রা করছে নৌকোগুলো। ওরা হয়তো হারিয়েই যাবে গহিন গাঙের ভেতর। তারও হারিয়ে যেতে ইচ্ছা করত এমন এক দেশে যেখানে গেলে আর ফিরে আসা যায় না। কেউ পিছনে তাকায় না সে দেশে। শুধু এগিয়ে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। সেই এগিয়ে চলার দেশেই যেতে ইচ্ছা করত বিমলের।

সেজন্যই কি আজ সে নতুন এক দেশে এসে হাজির হয়েছে। যেখানে এলে পিছন দিকে আর দেখার কিছুই থাকে না। কারণ পিছনটা অন্ধকারে ঢেকে যায়। পিছনের সমস্ত পায়ের চিহ্ন সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ে যায়। সামনেটাই শুধু আলোকোজ্জ্বল। আলেয়ার মতো দপ দপ করে জ্বলে ওঠা আর সঙ্গে সঙ্গে নিবে যাওয়া নয়। মশাল জ্বেলে কে যেন শুধু সামনের দিকে নিয়ে যায়।

বর্ডার স্লিপ নিয়ে ভবেশ ফিরে এসেছে। শুকনো চিঁড়ে আর গুড় আর জল খেয়ে পেট ভরে উঠেছে। আর এক জায়গায় গুঁড়ো দুধ দিচ্ছিল। কিন্তু সেটা দেখতে পায়নি বিমল। যাত্রীদের অনেকেই নিয়েছে। বিমলের মা বলেছিল শুকনা চিড়া খাবি ক্যান? জল দিয়া দেই। ভিজাইয়া খা। বিমল রাজি হয়নি। তারপর ট্রেন ছেড়ে দিল ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই। যাত্রীদের অনেকে বনগাঁ স্টেশনে নেমে গেছে। তাদের আত্মীয়স্বজনের কাছে গিয়ে উঠবে। গত সাত বছরে পূর্ব পাকিস্তান থেকে অনেক উদ্বাস্তু এসে পুনর্বাসন নিয়ে নিয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার সীমান্তবর্তী এলাকায়।

মাইগ্রেশনের অফিসার জিজ্ঞাসা করেছিল, তোমরা কোথায় পুনর্বাসন চাও?

ভবেশ বলেছিল যেহানে পাঠাবেন, যামু। তবে আমরা চাষি মানুষ। চাষের জমি

না হলে মারা পড়ব ছার।

তাহলে শিয়ালদায় চলে যাও। এখানে বেছে বেছে কিছু বিজনেস ফ্যামিলিকে গোবরডাঙা ক্যাম্পে পাঠাচ্ছি। বিজনেস লোন নিলে শুধু বাস্তুজমি আর লোন পাবে। চাষের জমি পাবে না।

আমরা চাষের জমি চাই।

শিয়ালদায় চলে যাও। ওখানে অফিসার আছে। তারাই ব্যবস্থা করবে।

দেখতে দেখতে স্টেশনগুলি পার হয়ে গেল। বরিশাল এক্সপ্রেস চাঁদপাড়া, ঠাকুরনগর হয়ে গোবরডাঙায় থামল। ঠাকুরনগরের কথা শুনেছিল ভবেশ। হরিচাঁদ ঠাকুরের বংশধর পি আর ঠাকুর এই গ্রাম বসিয়েছেন। ট্রেন থেকে দেখা যায় ছোট ছোট টিনের চাল। ছোট ছোট ঘর। ধান জমির মধ্যে নতুন বসত গড়ে উঠছে। বৃষ্টির জল জমে রয়েছে বাড়ির চারিদিকে। ভবেশ মনে মনে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল। অতবড় বাড়ি, উঠোন, মরাই, গোলা, সুপারি নারকেলের বাগান—সেই ছায়াঘন সবুজ গ্রাম কোথায় হারিয়ে গেল জন্মের মতো। তার মধ্যে ধু ধু মাঠের বুকে ছোট ছোট টিনের ছাউনি দেওয়া বাড়ি। গ্রামে তাদের গোয়ালঘরও এদের চাইতে ভালো ছিল।

এরই নাম সব ফিরে পাওয়া। না, সে যদি ফিরে পেতেই চায় সব কিছু আবার আগের মতো ফিরে পাবে।

শিয়ালদা স্টেশনে ট্রেন ঢুকতেই রীতিমতো ভয় পেয়ে গেল বিমল। একটা বিরাট ঘরের ভেতর তাদের ট্রেন এসে থেমেছে। আর একটু হলেই হয়েছিল আর কি। ট্রেনটা গিয়ে বিরাট ধাক্কা মারত দেওয়ালে।

আরও অনেক ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। হিস হিস করে গজরাচ্ছে অতিকায় সাপের মতো। স্টিমের ধোঁয়া উঠছে গল গল করে। শিয়ালদায় ঢোকার মুখেই কত লাইন দিয়ে কত ট্রেন একসঙ্গে যাচ্ছিল।

ট্রেন থেকে জিনিসপত্র নিয়ে নামল যাত্রীরা। ভবেশ বলল, আমাগোর দলের যারা যারা আছো তারা এহানে দাঁড়াও। গুনতি করেনি আগে।

একপাশে এসে দাঁড়াল ভবেশের পরিবার। তার দুই ছেলে বউ। রমেশের দুই মেয়ে বউ। অনুকূল দাসের পরিবার। সুরেন ঘরামির পরিবার। নটবর মিস্ত্রি। নটবরের বৃদ্ধ বাবা ঘনশ্যামকে ধরে নামানো হল। শিবকৃষ্ণ ঘরামির পরিবার আর বিধুভূষণের বউ আর মেয়ে।

বিধুভূষণের বউ বলল, —ও দাদা, আমারে বেহালা যাবার ব্যবস্থা করে দেন। সন্ধে হয়ে আসছে। আমি বেলাবেলি চলে যাই।

ভবেশ বলল, একটু বসেন বউঠান। এ দিকের হাল-গতিক বুঝে নেই একবার।

প্ল্যাটফর্মে ওদের অনেকক্ষণ বসতে দেখে একজন পুলিশ এসে বলল, এদিকে বসার হুকুম নেই। রিফিউজি তো? প্ল্যাটফর্ম পার হয়ে ওপারে যাও। অনেক লোক

বাস করছে দেখবে। সেখানে যাও।

প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে ওপাশে গিয়ে দেখতে পেল তিল ধারণের জায়গা নেই। গোটা প্ল্যাটফর্মটায় বিছানা পেতে বিভিন্ন উদ্বাস্তু পরিবার শুয়ে পড়েছে। হাঁড়ি কুড়ি সাজিয়ে রান্নাবান্না শুরু করে দিয়েছে রাস্তার ধারে। বাইরে আবার টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। হা ভগবান, এ-যে দেখছি কোথাও পা ফেলার জায়গা নেই।

এক পাশে কোনরকমে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। বিধুভূষণের বউ বার বার বলছে, ও দাদা, বেহালার একটা ট্যাসকি না হয় ডেকে দিন। ভবেশ বলল, ট্যাসকি ডেকে দিলে যাইতে পারবেন? একা একা যাইবেন। বেয়ালা ক কোরোশ পথ তা কেডা জানে? এক কাম করেন না কেন বউঠান। আজ রাতটুকু ইস্টিশনে কাটায়ে দেন। কাল সকালে আমি আপনারে দিয়া আসব।

কিন্তু বিধুভূষণের বউ রাজি নয়।

রমেশ বলল, তুমি এহানে থাকো দাদা। জায়গা টায়গা জোগাড় করার কায়দা পাও কিনা দ্যাখো। আমি বউঠানরে ট্যাক্সিতে উঠোয়ে দে আসতিছি।

বিমল বলল আমিও যাব কাকা।

রমেশ বলল, চল।

রমেশ জিজ্ঞাসা করল, বেয়ালা কতদূর হবে বউঠান?

বিধুভূষণের বউ বলল, তাতো বলতে পারি না বাবা। শখেরবাজার। চৌদ্দ নং রায়বাহাদুর রোডে আমার জাঠ শ্বশুররা থাকে। নাম হল ফণীভূষণ গায়েন আর ননীভূষণ গায়েন। এই যাঃ শ্বশুরের নাম বলে ফ্যালালাম।

রমেশ বলল, বিদেশে ওসব কিছু মানা লাগে না। এহানে পেয়োজোনটা বড়—বোঝলেন না। তবে কলকেতা খুব ঠগ জোচ্চোরের জায়গা। একা একা যাচ্ছেন। সঙ্গে টাকা পয়সা আছে। একটু সাবধানে যাবেন বউঠান। সোজাসুজি ট্যাক্সি না করে আমি বরং কারও কাছ থেকে আগে জানান নেই।

রমেশ ওদের নিয়ে স্টেশনের চত্বর পেরিয়ে রাস্তা পার হয়ে একেবারে বৈঠকখানা বাজারের সামনে চলে এল। পাশে লেখা ব্যারন হোটেল। সামনে মিষ্টির দোকান। ওপরে লেখা দ্বারিক ঘোষ।

রমেশের কাছে নামটা চেনা চেনা লাগল। তাদের গ্রামের একজন দ্বারিক ঘোষ কলকাতায় গিয়ে খাবারের দোকান দিয়েছিল। তার দোকান কিনা কে জানে। রমেশ দোকানের ভেতর গিয়ে বুড়ো মতো এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করল, আমার সঙ্গের ওই মেয়েছেলে বেহালা শখেরবাজার ক্যামনে যাবে কইতে পারেন?

কোথা থেকে আসছ?

পাকিস্তান থেকে।

লোকটি রমেশের কথার উত্তর না দিয়ে পালটা জিজ্ঞাসা করল, পাকিস্তানের অবস্থা কি রকম এখন?

কোন্ কথার কি উত্তর। তবু লোকটি যাতে না চটে তার জন্য সে উত্তর দিল তার কথার। বলল, অবস্তা জুতের নয়। তা নইলে দেশ ছাড়ি? বেহালা শখেরবাজারটা যদি কোথায় কন?

লোকটি বলল, সে-তো এখান থেকে অনেক দূর। বাসে করে যেতে হবে। নতুন লোক আগে কখনও তো আসেনি। তার ওপর মেয়েছেলে।

কেন তুমি যাবে না?

না, আমাদের আলাদা পরিবার। বাগেরহাটের বড় মোক্তার আছেন বিধুভূষণ গায়েন, তাঁর পরিবার।

বাগেরহাটের কথা শুনে লোকটি বলল, আমার বাড়িও তো বাগেরহাট।

বিধুভূষণ মোক্তারের নাম শোনেন নি? খুব বড় মোক্তার। ওঁর পরিবারই তো দাঁড়ায়ে আছে। বেহালা যাবেন। আসার সময় খুলনো স্টেশনে মোক্তারবাবু নিজে এসে পৌঁছায়ে দে গেছেন। এহন আমরা পড়ছি বিপদে। এদিকে ইস্টিশনে থাকার জায়গা নাই। ইস্টিশান ছাড়ে আসতেও পারি না। দাদারে থুয়ে আইছি। এহন বউডার বাচ্চাটার তো একটা গতি করার লাগে।

লোকটি দোকান থেকে বেরিয়ে বিধুভূষণের বউর কাছে গিয়ে বলল, নমস্কার। বাগিরহাট বাড়ি? বাগিরহাটের কোয়ানে?

পচ্চিম পাড়।

ও, আপনার স্বামী বাগেরহাট কোর্টে আছেন বুঝি? বলাই রায়চৌধুরী উকিলরে চেনেন?

হ্যাঁ। বলাইবাবু তো মারা গেছেন। তাঁর বউ ছেলে মেয়ে সব এপারে।

হ্যাঁ, বলাইবাবু আমার মামা। আমিও বাগিরহাটে থাকতাম। তবে কলকাতা আসিছি পঞ্চাশ সালে। এই দ্বারিকের দোকানে আমি চাকরি করি। আমার নাম অসীম কর।

বিধুভূষণের বউ বলল, তাহলে তো চেনা লোকই বার হয়ে গেল।

অসীম কর বলল, আপনি এক কাজ করেন। আমি একটা ট্যাক্সিতে চাপায়ে ট্যাক্সিওয়ালাকে সব বোঝায়ে দিচ্ছি। নম্বর নিয়ি রেখে দেব। আপনার কোনও ভয় নাই। পাঞ্জাবি ট্যাক্সি ডাকব। ওরা কোনও গোলমাল করে না।

কিছুক্ষণের মধ্যে একটা ট্যাক্সি এসে গেল। অসীম কর ট্যাক্সি ড্রাইভারকে সব বুঝিয়ে দিল।

বিধুভূষণের বউয়ের চোখে মুখে কৃতজ্ঞতা। সে অসীম করকে বলল, দাদা, এঁরে আমার ঠিকানাটা লিখে দেবেন। চোদ্দ নং রায়বাহাদুর রোড। পোঃ বেহালা। অসীম কর বলল, ঠিক আছে আমি লিখে নিয়ে নিচ্ছি। আমিও রেখে দিচ্ছি ঠিকানা। যদি কোনওদিন বেহালায় যাই, দেখা করে আসব।

আসবেন দাদা। অবশ্যই আসবেন। এই আমার মেয়ে ময়না। সাবা দাও মা।

তোমার দাদু হন।

ময়না প্রণাম করতেই অসীম কর বলে উঠল থাক থাক।

বিমলের দিকে ময়না তাকিয়ে দেখল বিমলের মুখ অন্ধকার হয়ে গেছে।

ময়না বলল, বিমলদা আসি।

বিমল বলল, এসো। তারপর তার বলার ইচ্ছা ছিল, সাবধানে যাইবা। ঠিকঠাক থাকবা। কিন্তু বলা আর হল না। হুশ করে চলে গেল ট্যাক্সিটা।

ট্যাক্সি যতক্ষণ চলে গেল ততক্ষণ সেদিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইল বিমল। হঠাৎ কেমন যেন মনটা হুহু করে উঠল বিমলের। সেদিন বাবার হাতে মার খেয়েও তার কান্না আসেনি। তার সহজে কান্না আসে না। একবার মাছ ধরতে গিয়ে হাবড়ে অর্থাৎ কাদায় পা বসে গিয়েছিল তার। কিছুতেই পা তুলতে পারছিল না। যত পা তুলতে যাচ্ছিল ততই তার পা বসে যাচ্ছিল। এইভাবে ঠায় রোদ্দুরে দু ঘণ্টা কাদার মধ্যে কোমর সুদ্ধ ডুবিয়ে বসেছিল সে। সে বুঝতে পারছিল কেউ তাকে উদ্ধার না করলে সে ক্রমশ তলিয়ে যাবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার চোখ দিয়ে জল বেরোয়নি।

এই অবস্থায় তাকে দেখতে পায় ছোটকাকা। তখন একটা কাছি তার দিকে ছুড়ে ফেলে দেয় সে। বলে কাছিটা প্রাণপণে ধরে রাখতে। সেই কাছি টেনে তবে তাকে উদ্ধার করা হয়।

আজ কিন্তু কলকাতার জনাকীর্ণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে তার মনটা হুহু করে উঠল। মনে হল তার পাশে কেউ নেই, সে একা, একাই সে তলিয়ে যাচ্ছে চোরা কাদার ভেতর। কিছুক্ষণ পরে বিধুভূষণের বউয়ের বেহালার ঠিকানাটা লিখে ফিরল রমেশ। বলল আয়, বাঁচা গেল। দাদা যত সব ঝামেলা পাকায়। এত সহজে পার পাওন যাবে ভাবি নাই।

শিয়ালদায় ফিরে বিমল দেখল ওদের দলের লোকরা কোনোরকমে একটু বসার জায়গা করে নিতে পেরেছে।

অনুকূল দাস বলল, অফিছারে বলেছে, একশো ফ্যামিলিরে ক্যাম্পে পাঠাবে। ওই জায়গায় আমরা থাকতে পারি।

দাদা কোথায়?

নাম লিখাতে গেছে। এহানে সাত বাহানা। এহানে নাম লেখাও, ওহানে নাম লেখাও। নাম না লেখালে আবার খাবার পাওয়া যাবে না। খিচুড়ি আর বাচ্চাদের দুধ দেচ্ছে।

সুরেন বলল, দুধ মানে পাউডারের দুধ গোলা। শুনছি নাকি গাধার দুধ শুকায়ে পাওডার তৈরি হয়।

অনুকূল বলল, কারে পড়লে এহন বাঘের দুধও খেতে হবে তা গাধার দুধ। নটবরের বাবা ঘনশ্যাম একটা চাদর পেতে শুয়েছিল। দুধের কথা শুনে সে বলল,

ও নটবর আমারে কিন্তু গাধার দুধ খাওয়াস না।

নটবর বলল, হ তোমার লনে অহন কালো গাইয়ের দুধ জোগাড় করি। ঘুমাও চুপ কইর‍্যা।

বুড়ো বিড় বিড় করে বলে, কলকেতা শহর বটে একখান। আমার যহন দুইকুড়ি বছর বয়স তহন ঢাক বাজাইতে নে আসছিল একবার। আমাগোর দ্যাশের মিত্তিরদের বাড়ি আছে কালীঘাটে। কালীমায়ের মন্দিরের পাশেই। সে সময় দেখছি কি কেতার শহর। বাপরে বাপ ট্রাম গাড়ি চলে টেরেনের মতো অথচ ধুয়ো নাই। ও বিমল।

বিমল বলে, কিছু কও নাকি দাদু?

তুমি বাইর হইছিলে না? টেরাম গাড়ি চোহে পড়ছে পথে?

বিমল বলল, কত টেরাম গাড়ি দ্যাখলাম। ঘন্টা দিতে দিতে যায়। রাস্তার ওপর লাইন পাতা। টেরেনের মতো অত বড় লাইন না।

ওপরে শিক দ্যাখছ। শিক দিয়া তারের সঙ্গে বান্ধা থাকে। তা নাহলে যদি ছিটকা পড়ে।

তার দ্যাখছি। বান্ধা তো দেখি নাই।

একটু পরে ভবেশ ফিরল। সঙ্গে একজন যুবক। তার হাতে লাল কাপড় জড়ানো। সে বলল, আপনাদের এখন তিন-চারদিন শিয়ালদা স্টেশনে থাকতে হবে। আমাদের ক্যাম্পগুলোতে আর জায়গা নেই। এখান থেকে আপনাদের ক্যাম্পে পাঠানো হবে। নটবর মিস্ত্রি বলল, আমাদের পুনর্বাসনের কী ব্যবস্থা?

লোকটি একটু বিরক্ত হয়ে বলল, গাছে না উঠতেই এক কাঁদি? এই তো আজকেই এলেন। ক্যাম্পে এক বছর ধরেও লোক রয়েছে। পুনর্বাসন অত সোজা ব্যাপার ভেবেছেন? জমিজায়গার ব্যবস্থা করতে হবে। পরিকল্পনা করতে হবে। আগে যারা এসেছে তারা আগেই পুনর্বাসন পেয়েছে। আপনারা যখন খুশি আসবেন, আর এসেই পুনর্বাসন?

রাতের বেলা যে একশো পরিবারকে ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হবে বলেছিল তারা পুঁটলি-পোটলা বেঁধে তৈরি হয়েছিল। কিন্তু ট্রাকের ব্যবস্থা করা যায়নি বলে তাদের যাওয়া হল না। শোনা গেল পরদিন সকালে তারা যাবে।

ওদের অনেকে পরামর্শ দিল, রাস্তায় কোনও গাড়ি বারান্দায় রাতটুকুর মতো আশ্রয় নিতে। কিন্তু ভবেশের কাছে প্রস্তাবটি মনঃপূত হল না। শিয়ালদা স্টেশন ছাড়লে আর তারা যে এখানে জায়গা পাবে তা মনে হয় না। শুধু বনগাঁ সীমান্ত নয়, গেদে সীমান্ত দিয়েও উদ্বাস্তু আসছে। হাঁটাপথে যারা বনগাঁ সীমান্তে এসেছে তারাও লোকাল ট্রেনে করে আসছে।

তাছাড়া শিয়ালদা স্টেশনে পায়খানা আছে। জল আছে। বাইরে গেলে এসব কোথায় পাবে?

সে রাত্তিরটা কোনওরকমে কাটল। পরদিন সকালে ট্রাক এসে একশো পরিবারকে

নিয়ে গেল। এই ট্রাক নাকি যাবে ধুবুলিয়া ক্যাম্পে। সকালবেলা পাওয়া গেল পাউরুটি আর দুধ। শোনা গেল আজ থেকে তাদের চাল-ডাল দেওয়া হবে। আর খিচুড়ি খেতে হবে না।

কিন্তু শিয়ালদা স্টেশনটা যেন নরক। ভবেশ ভাবল, এ কোথায় এল সে। এখানে মেয়েদের কোন আবরু নেই। বাইরের কলে কাড়াকাড়ি করে স্নান করে মেয়েরা। কাপড় ছাড়বার মত এতটুকু আড়াল নেই। শিয়ালদা স্টেশনে তিনদিনের জায়গায় দশদিন থাকতে হয়েছিল তাদের। কিন্তু এই দশদিনে যেন দশ বছরের অভিজ্ঞতা হল তার।

ব্লিচিং পাউডারের উগ্র গন্ধ সবসময় লাগে নাকে এসে। তাদের পা মাড়িয়ে দিয়ে প্যাসেঞ্জাররা ট্রেন ধরতে যায়। ট্রেন ছাড়ার সময় হলে আর কারও দিগ্‌বিদিক জ্ঞান থাকে না। ছুটতে থাকে বাবুরা উর্ধ্বশ্বাসে।

সবচেয়ে মুশকিল হয় বুড়ো ঘনশ্যাম মিস্ত্রির। একে তো পায়খানা পেচ্ছাবের বেগ চাপতে পারে না বুড়ো। পায়খানায় নিয়ে যেতে যেতেই কাপড়চোপড় ময়লা করে ফেলে। সেই কাপড়েই পড়ে থাকে। দুর্গন্ধ ছড়ায়। অন্যান্য লোকেরা বলে, বুড়োডারে নিয়ে এলে ক্যান কও তো? জোয়ান বাচ্চারা বাঁচে না, তার উপর বুড়া। তিনকাল গিয়া এককালে ঠেকছে তারও আবার মুসলমানের ভয়?

খিচুড়ি সহ্য হয়নি বুড়োর। পেট ছেড়ে দিয়েছে তার। নটবর ডাক্তারের কাছে গেল। রেডক্রসের ডাক্তার বসে। সঙ্গে নার্সও আছে জনা দুয়েক। নটবরের কথা শুনে ডাক্তারবাবু বললেন, এ তো দেখছি ডিসেন্ট্রি। হাসপাতালে নিয়ে যাও। আমি লিখে দিচ্ছি, ভর্তি করে নেবে। আমাদের অ্যাম্বুলেন্স আছে। কাছেই হাসপাতাল।

বাবু, আমাদের যে এহান থে ক্যাম্পে পাঠাবে। বুড়ো বাপ এহানে পড়ে থাকলে তারে ফ্যালায়ে যুয়ে যাই ক্যামনে?

তাহলে এখানে থেকে মরো। ডাক্তারবাবু রেগে গেলেন।

রাগ করবেন না ডাক্তারবাবু। আপনে একটা পরামর্শ দ্যান।

আমি কি পরামর্শ দেব? তোমাদের ক্যাম্পের অ্যালটমেন্ট আসতে দেরি আছে। তিন চারদিনের মধ্যে যদি না আসে তাহলে পরের অ্যালটমেন্টে যাবে।

কিন্তু ঘনশ্যাম মিস্ত্রির অবস্থা আরও খারাপ হয়ে গেল। বুড়োর চোখে পাতা পড়ে না। অচৈতন্য অবস্থায় শুয়ে আছে। এমন কী পাশ ফিরে শোবার সময় কখন যে গড়িয়ে যাত্রীদের চলাচলের রাস্তার ওপর তার হাতটা হেলে পড়েছে তা খেয়াল নেই।

ছুটে ট্রেন ধরতে গিয়ে একজন যাত্রী জুতোসুদ্ধ পা দিয়ে মাড়িয়ে দিল ঘনশ্যাম মিস্ত্রির শীর্ণ হাতটি। অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে উঠল ঘনশ্যাম। কিন্তু চোখ চাইবার শক্তি নেই তার তখন।

নটবর মিস্ত্রির বউ চিৎকার করে উঠল, চোখের মাথা খেয়ে শহরের বাবুরা,

যায়। বুড়োটাকে মাড়িয়ে চলে গেল। এরা কি মানুষ।

কয়েকজন কৌতূহলী যাত্রী দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, কী হয়েছে গো?

নটবরের বউ জানাল ঘটনাটি।

একজন বলল, আহারে। বুড়ো তো অসুস্থ দেখছি। হাসপাতালে নিয়ে যাও।

আর একজন বলল, রিফিউজিদের জন্য শিয়ালদা স্টেশন দিয়ে হাঁটবার উপায় নেই। এমন মৌরীসপাট্টা গেড়ে বসেছে সহজে যাবে বলে তো মনে হয় না। আবার গায়ে পা লেগে গেছে অমনি এমন করছে যেন মেরে ফেলেছে কেউ।

সেদিন দুপুরবেলা ঘনশ্যামকে ভর্তি করা হল নীলরতন সরকার হাসপাতালে।

তিনদিন কেটে গেল। ভবেশের পকেটে পাঁচশো টাকা ছিল। আসার সময় পথে এই ক-দিনে দুশো টাকা খরচ হয়ে গেছে। বেনাপোলে মেয়েদের শাড়িগুলোও কাস্টমস নিয়ে নিয়েছিল। দুই বউর জন্য দুটো শাড়ি কিনতেই বেরিয়ে গেল পঞ্চাশ টাকা।

শিবকৃষ্ণ বলল, সবাই কিছু না কিছু কামাইর ধান্দা করছে। আপনেও দেখেন না দাদা, যদি আমাদের কাজকাম কিছু পাওয়া যায়।

অনুকূল বলল,আমরা আর কি কাম জানি, চাষি লোক। তবে মোট বইবার পারি। কুলিগিরি বলেন তো করতে পরি। বাবুদের মাল বইলে মাল পিছু আট আনা। দিনে পাঁচ ছয় টাকা কামাই করলেই যথেষ্ট।

কিন্তু সুরেন ঘরামি ওদের উৎসাহের মুখে জল ঢেলে দিল। বলল, ও গুড়ে বালি জামাই। লাল পোশাক পরা হিন্দুস্থানি কুলিরা আছে। মহাবদ। কারুরে লাইনে ঢুকতে দেয় না। ওদের হাতে গুন্ডা বদমাইশ আছে। একেবারে ছোরা বসায়ে দেবে।

পয়সা রোজগারের নেশা বিমলকেও পেয়ে বসেছিল। সে একদিন সকালে হ্যারিসন রোডে এক চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিল। দোকানে খদ্দেরের ভিড় লেগেই আছে। চা ছাড়াও গরম গরম শিঙাড়া ভাজা হচ্ছে। তার খুব খেতে ইচ্ছে করছিল।

একটি লোক, তার বাবার বয়সি হবে তার দিকে তাকিয়ে বলল, এই খোকা, কিধার থাকো?

বিমল আঙুল দিয়ে শিয়ালদা স্টেশনের দিকে দেখিয়ে দিল।

রিফিউজি হ্যায়?

বিমল হিন্দি কথা বুঝতে পারত না। হিন্দুস্থানে এসেই সে প্রথম হিন্দি শুনেছে। এখন একটি দুটি শব্দ সে বুঝতে পারে।

সে বলল, হ্যাঁ।

আমার সাথে চলো। আচ্ছা কাম মিলবে।

কোথায়? বিমল এই প্রথম কথা বলল।

বড়োবাজার। ওখানে আমার গদি। তবে আমার বাড়িতে থাকবে। বাড়ির কাম

কাজ করবে। মাঝে মাঝে গদিতেও দরকার হবে। বিশ রুপেয়া মাসে মিলবে। খানা ফ্রি। কপড়া উপড়া সব হামি দেবে।

বিমলের কি মনে হল, সে হঠাৎ দৌড় লাগাল। একটা ফুটপাথের ভিড়ের মধ্য দিয়ে গলিয়ে সে শিয়ালদা স্টেশনের সামনের ফুটপাথে এসে হাঁপাতে লাগল। তখন বেলা দশটা বাজে। অনর্গল জনস্রোত পঙ্গপালের মতো রাস্তা পার হচ্ছে। লোক পারাপারের জন্য ট্রাম বাস থেমে রয়েছে। বিমল ছুটতে ছুটতে শিয়ালদা স্টেশনের ভেতরে গিয়ে তবে দাঁড়াল।

কাজের সন্ধানে এদিক-ওদিক ঘুরছিল ভবেশ। একজন বলল, বড়বাজারে গেলে লরি থেকে বস্তা নামাবার কাজ পাওয়া যায়। প্রতি বস্তা নামালে চার আনা।

আর একজন বলল, দুপুরের ট্রেনে যেসব তরকারি আসে তারা তরকারির ঝুড়ি বইবার জন্য লোক চায়। কুলিরা এইসব মোট বয় না। ট্রেন থেকে নামিয়ে এইসব ঝুড়ি সামনের কোলে মার্কেটে পৌঁছে দিলে দু টাকা করে পাওয়া যায়। সারা দিনে গোটা চারেক ঝুড়ি বইতে পারলে আট টাকা।

সুরেন ঘরামি, অনুকূল, নটবর, রমেশ সবাই রাজি হল।

খবরটি এনেছিল অনুকূল। সে কার সঙ্গে কথা বলে এসেছিল। দুপুরের দিকে সব ট্রেনেই ঝুড়ি ভর্তি আনাজ আসে। বেগুন, শাকপাতা, কুমড়ো, পটল।

এক একটা ঝুড়ি প্রচণ্ড ভারী। প্রায় দেড়মণ ওজন। মাথায় গামছা দিয়ে তার ওপর ভারী ঝুড়ি চাপাতেই চোখে যেন অন্ধকার দেখল ভবেশ। তারপর টলতে টলতে সে এগুলো বাজারের দিকে।

তার সামনে ঝুড়ির মালিক চলেছে। দ্যাখো, ফেলে দিয়ে আমার সব্বোনাশ কোরো না। বহু টাকার মাল কিন্তু। পারবা তো, দেখো।

কোনওরকমে ঝুড়িটা নামাবার পর ভবেশ দেখল তার চোখের সামনে গোটা পৃথিবীটা ঘুরছে।

লোকটি বলল, বোসো, বসে জিরিয়ে নাও।

জল খাবা? ও যতীন, লোকটারে একটু জল খেতি দাও। জল খেয়ে সুস্থ হোক।

যতীন বলে যে লোকটি, সে বলল, তোমার আর জ্ঞানগম্যি হল না ভাগনে। শিয়ালদার রিফুজিরে দিয়ে মাল বহাচ্ছ। ওদের সুখের শরিল। গর্মেন্টের পুষ্যিপুত্তুর সব। বিনি পয়সায় খাবারদাবার যত্নআত্তি। ওরা বইবে এই ভারী মোট।

ওদের মধ্যে রমেশ আর সুরেন ঘরামিই মাল বওয়ার কাজে পাকাপাকি লেগে গেল। বাকিরা প্রথম দিন মাল বয়েই আর পারল না।

রমেশই দাদাকে বলল, তোমাকে আর মাল বইতে হবে না দাদা। তুমি আমাদের ক্যাম্পে যাওনের ব্যবস্থাটা আগে সামাল দাও। এর মধ্যে ধরাধরি ব্যাপার আছে। ঘুষ ঘাষও নাকি চলে। যে যা খেতে চায় দিয়া দাও। আগে তো এই নরক থেকে বার হই।

রমেশ যা বলেছিল তার কিছুটা সত্যি। গতকালও চার পাঁচ ট্রাক রিফুজি গেছে মেদিনীপুর ক্যাম্পে। কিন্তু তারা তাদের পরে এসেছে।

আবার এর মধ্যে ক্যাম্পে যেতে চায় না এমন রিফুজিও আছে বেশ কিছু। হরিপদ দাস পাবনা থেকে এসেছে। তার সঙ্গে আছে আরও পাঁচটা ফ্যামিলি। ওরা নাকি মানা ক্যাম্পে গিয়েছিল। ছমাস সেখানে থাকার পর চলে এসেছে। রুজি রোজগারের ব্যবস্থা নেই। কাছে লোকালয় নেই। প্রচণ্ড গরম। চাল আসে তো ডাল আসে না। ডাল আসে তো তেল নেই। ওরা চেয়েছিল বাংলার মধ্যে পুনর্বাসন। কিন্তু ওদের নাকি দণ্ডকারণ্য পাঠাবার চেষ্টা হচ্ছে।

ওরা তাই চলে এসেছে শিয়ালদায়। ওদের পরিবারের সবাই কোনও না কোনও কাজ করছে।

হরিপদ ওদের বোঝাবার চেষ্টা করল, ক্যাম্পে না গিয়ে অনেকে কলকাতার আশেপাশে জায়গা জমি জবরদখল করে আজ সেখানে কলোনি তৈরি করে নিয়েছে। এখনও তার আশেপাশে জায়গা পাওয়া যায়। কলকাতার কাছে থাকতে পারলে কাজের অভাব নেই।

কথাটা গভীরভাবে ভাবায় ভবেশকে।

কিন্তু তবু ভবেশ মন থেকে সায় দিতে পারে না। যে মাটি-সে ফেলে এসেছে সেই মাটির ছোঁয়া থেকে চিরকালের জন্য বঞ্চিত হয়ে শহরবাসী হয়ে থাকাটাকেও সে মেনে নিতে পারে না।

এর মধ্যে একদিন সুখবর এসে গেল। তাদের ক্যাম্প অ্যালটমেন্ট হয়ে গেছে। বিষ্ণুপুর ক্যাম্পে যেতে হবে তাদের। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের কাছে বাসুদেবপুর। কাল সকালবেলা ট্রাক এসে নিয়ে যাবে তাদের। কিছু ফ্যামিলি যাবে কুপার্স ক্যাম্পে।

ইতিমধ্যে ঘনশ্যাম মিস্ত্রিও সুস্থ হয়ে উঠেছে। হাসপাতাল থেকে তার ছুটি হয়ে গিয়েছিল অনেক দিন। কিন্তু নটবর মিস্ত্রি নিয়ে আসছিল না। বুড়ো রোজ বলত, আমারে ফ্যালায়ে থুয়ে চলে যাসনে তোরা। নটবর একদিন রেগে গিয়ে বলল, ভাবছিলাম তোমার মরণ হবে। তা তোমার কি মরণ আছে?

ঘনশ্যাম বলে, এত তাড়াতাড়ি আমার মরণ নাইরে লটবর। তোগোর নতুন ভিটা না দেখ্যা মরণ নাই আমার। আমার ইচ্ছামৃত্যু জানবি।

যাবার প্রস্তুতি হিসাবে বিকেলবেলা ঘনশ্যামকে নিয়ে এল নটবর।

বিকালবেলা হরিপদর সঙ্গে দেখা ভবেশের। হরিপদর সঙ্গে একজন যুবক বয়সি লোক। প্যান্ট-শার্ট পরা, হাতে ঘড়ি, মুখে সিগারেট। তেল চুকচুকে শহুরে চেহারা।

হরিপদ বলে, এই যে ভবেশ মণ্ডল। শুনলাম কাল নাকি ক্যাম্পে যাবা?

ভবেশ বলল, হ্যাঁ। টিকিট ফিকিট সব হইয়া গ্যাছে গিয়া।

হরিপদ বলল, আমায় একবার জিজ্ঞাসাবাদ পর্যন্ত করলা না। তোমাদের জন্য আমি আবার এই ভদ্রলোকেরে ডাকায়ে নিয়ে আলাম। এর নাম জীবনলালবাবু।

জীবনলাল নমস্কার করতেই ভবেশ একটু অবাক হয়ে ঘাবড়ে গিয়ে প্রতি নমস্কার করল।

এনার ইট ভাটি আছে বারাসাতের কাছে। তোমাদের সবাইকে কাজ দেতে চান। হৃদয়পুরের গ্রামের ভেতর জঙ্গল ছাপ করে অনেক রিফুজি বসে গেছে। পড়ান (পতিত) জমি। মালিকের ঠিক ঠিকানা নেই। বসে পড়লেই হইল। সরকার থেকে জীবনবাবুই বৈধকরণ করায়ে দেবেন। কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে খাতির আছে ওনার। ইটভাটায় সবাই কাজ পাবা। এক একজনার দশ টাকা করে রোজ। বলো তো কাল শেষ রাতের টেরেনেই তোমাদের রিদয়পুর ইস্টিশনে নিয়ে ফেলি। কাল বাদ দিয়ে পরশু থেকেই কাজে লাগে যাবা। বিষ্ণুপুর ক্যাম্পে লোভ দেখায়ে নিয়ে যাচ্ছে, কতদিন থাকতে হবে জানো কিছু? পুনর্বাসন না ঘোড়ার ডিম। ওসব দেখা আছে আমার। আমাদের দলও রিদয়পুর যাচ্ছে। রাজি হও তো বলো।

ভবেশ বলে, কিন্তু আমরা তো সবাই ক্যাম্পে যেতে রাজি হইছি। এহন কি আর ছাড়ান যায় নাকি?

হরিপদ বলল, তুমি চাইলে একশোবার যায়। তুমি যদি সরকারের টাকা না নাও নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াও, তাহলে কার কি বলার থাকতে পারে? এই সুযোগ ছেড়ো না।

জীবনলালবাবু বলেন, তোমাদের ঘর তৈরির জন্য আমি হাজার টাকা করে অ্যাডভান্স দেব।

তার মানে?

হরিপদ বুঝিয়ে দেয়, অ্যাডভ্যান্স মানে দাদন। তোমার মজুরির টাকা থেকে দুটাকা করে বাদ যাবে।

ভবেশের মনটা নরম হয়ে আসে। ইটভাটার কাজ সে দেখেছে। এমন কিছু পরিশ্রম নয়। তাছাড়া কলকাতার কাছাকাছি যদি থাকতে পারে তাহলে বরিশাল যাবার পথও খোলা থাকে। কেউ কেউ তো বলছে হিন্দুস্থান পাকিস্তান আবার এক হয়ে যাবে একদিন।

ওকে নিমরাজি দেখে হরিপদ বলে, কাল রাত চারটের সময় আমি আসব। যদি ঘুমোয়ে পড়ো আমি তোমায় জাগাব। এ সুযোগ আর হাতছাড়া কোরো না।

সন্ধ্যা নেমে আসে শিয়ালদহ স্টেশনে। তবে কখন যে বেলা গড়িয়ে যায় আকাশের দিকে না তাকালে তো বোঝা যায় না। সন্ধ্যা হওয়ার আগেই বিজলি বাতিগুলো জ্বলে ওঠে। হাজার হাজার মানুষের ভিড় সমুদ্রের ঢেউয়ের মতোই আছড়ে পড়ে সেখানে। এত মানুষ আছে কলকাতা শহরে। এত এত লোক থাকতেও এরা কেমন নিশ্চিন্তে মেনে নিয়েছে কিছু মানুষের এই ভাগ্যবিপর্যয়কে।

ভবেশ এখনও ঠিক করে উঠতে পারছে না সে কী করবে? বিষ্ণুপুর যাবে না হৃদয়পুর ইটভাটায়? সে দলের নেতা।

সে যা বলবে তাই করবে তার সঙ্গের মানুষগুলো। ভালো হোক মন্দ হোক পরিণামের জন্য সেই-ই দায়ী হবে।

সাউথ স্টেশনের পাশটা দিয়ে সে হেঁটে আসছিল। ওই জায়গাটা একটু আলো-আঁধারি। এদিকটায় কখনও সন্ধ্যার পর হাঁটিহাঁটি করেনি ভবেশ। কিন্তু আজ হাঁটতে গিয়ে দেখল কয়েকটি সোমত্ত মেয়ে ঘোরাঘুরি করছে অন্ধকারের মধ্যে। এ মেয়েগুলোকে সে চেনে। শিয়ালদায় তাদের মতো উদ্বাস্তুদেরই মেয়ে। কিন্তু একজনকে দেখে চমকে উঠল সে। হরিপদর মেয়ে। কথা বলছে যার সঙ্গে সকালবেলাই তার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। জীবনলাল। জীবন এখানে অন্ধকারে হরিপদর মেয়ের সঙ্গে কী করছে?

জীবন বা মেয়েটি কেউ ভবেশকে দেখেনি। তারা ফিশফিশ করে কথা বলতে বলতে বেরিয়ে গেল ট্রাম রাস্তার দিকে।

ভবেশের মাথা গরম হয়ে গেল। সে দ্রুত পা চালিয়ে চলে এল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে। ভবেশের বউ তখন চুল বাঁধছে। তার জা রমেশের বউ চুল বেঁধে দিচ্ছে। তাকে হঠাৎ এ সময় দেখে ভবেশের বউ অবাক হয়ে গেল।

কিছু বলবা নাকি?

বড়খোকা কোথায়?

ঘুরতিছে পেলাটফর্মের কোথাও। ক্যান কিছু হইছে নাকি?

জিনিসপত্র বাঁধাছাদা হইছে তো। কাল টেরাকের কথা মনে আছে তো?

জিনিসপত্তর আর কি? এই তো বাশকোটা আর বিছানাটুক। এর আর বাধাছাঁদা করতে কত সময় লাগবে?

শোনো, কাল রাত চারটের সময় হরিপদ এসে যদি রিদয়পুরে যাবার জন্য টানাটানি করে কেউ যাবা না কিন্তু।

কে হরিপদ? রিদয়পুর যাবার কথা আসতিছে কোথা থেকে? ক্যাম্প তো বিষ্টুপুর।

হ্যাঁ, মনে রাখবা, বিষ্টুপুর—রিদয়পুর না। রিদয়পুরে অনেকে লোভ দেখায়ে নে যেতে পারে। কিন্তু রিদয়পুরে গেলে মানুষ আর মানুষ থাকবে না। মানুষেরে সেখানে নষ্ট করে ফেলানের জন্যি নিয়ে যাওয়া হয়। গুখোর ব্যাটা, হালার পুত আসুক না কাল। আম্মো নমশূদ্রের পোলা। আম্মো দ্যাখব। দ্যাশ ছাড়ছি বলে পাইছে কি? আমারে জানোয়ার পাইছে?

গৌরী বলে, তোমার কি হল কও দেখি। মাথা গরম করো ক্যান। এহানে একটু শোও দেহি। শরীল ভালো নেই মনে হচ্ছে। আমার মাথা খাও, এহানে বসো একডু।

ঠিক সেই সময় বিকট স্বরে কোন রেল ইঞ্জিন সিটি দেয়। এক উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর চাপা দেবার পক্ষে তা যথেষ্ট।

শিয়ালদা স্টেশনের গতি এক মুহূর্তের জন্যও থেমে থাকে না। সব সময় সেখানে অসংখ্য কণ্ঠের কলগুঞ্জন। অসংখ্য পায়ের শব্দ। মাইক্রোফোনে শুধু ট্রেন ছাড়ার

ঘোষণা। প্রতিটি মানুষ তার নিজের কক্ষপথেই আবর্তিত হচ্ছে। তার নিজের সমস্যাতেই সে দীর্ণ। নিজের নির্দিষ্ট ট্রেন ধরতেই সে ব্যস্ত। কারও সময় নেই কোনো অখ্যাত গ্রামের অখ্যাত এক সাধারণ মানুষের দুঃখবেদনার কথা শোনার।

তবু ভবেশের মতো দুখি মানুষেরও মন বোঝার মতো কেউ না কেউ থাকে। সে তার ধর্মপত্নী।

সে বোঝে কোথায় মনের গোপনে দুঃখ পেয়েছে ভবেশ। কুড়ি বছর ধরে সে তার স্বামীকে দেখছে।

দেশে থাকতে কত ঘটনায় সে রেগে গেছে। অজগরের মতো ফুঁসেছে। তার হাতে সেও মার খেয়েছে অনেকবার। স্বামীর হাতে চড়চাপড় খাওয়া এ তাদের সমাজের কোনও অভিনব ঘটনা নয়। বরং এটাই স্বাভাবিক। মার খাওয়ার পরই বরং স্বামী বেশি করে কাছে টেনে নেয়। কিন্তু স্বামীকে অনেকদিন সে দুঃখ পেতে দেখেনি। ভেতরে ভেতরে কাঁদতে দেখেনি।

আজ ভবেশের বউ বুঝতে পারল, ভবেশ কাঁদছে।

দেখতে দেখতে দেড় বছর কেটে গেল বাসুদেবপুর ক্যাম্পে। শিয়ালদা স্টেশনের নরকযন্ত্রণার পর মোটামুটি ভালোই লাগছে এই বাসুদেবপুর ক্যাম্পে এসে। তবু এখানে হারানো সবুজটাকে খুঁজে পাওয়া যায়। দিগন্ত বিস্তৃত ধানের খেতে ভবেশ মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে মাঠের কাজ দেখে সে।

তার মনে আবার স্বপ্ন এমনি মাঠে এক হাঁটু জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে সে ধান চারা রুইবে। আকাশের বৃষ্টি নামবে ঝরনাধারার মতো। সেই বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে ধানচারাগুলিকে শিশুর মতো কোলে করে আগলে বেড়ানো; তারপর একে একে মাটির সঙ্গে তাদের মেলবন্ধন ঘটিয়ে দেওয়ার মধ্যে যে কি অসীম আনন্দ লুকিয়ে আছে তা সে ভেবে পায় না।

এ জায়গাটাও আগে ঝোপঝাড় জঙ্গল ছিল। সেগুলো সাফ করে সারি সারি ত্রিপলের তাঁবু পড়েছে। প্রতিটি পরিবারের জন্য এক একটি তাঁবু। তাবুর সংলগ্ন জায়গাগুলিকে মাটি দিয়ে প্রত্যেকে উঁচু করে নিয়েছে। চারপাশে ছোট নালি কাটা। যাতে বর্ষার জল চলে যেতে পারে। তবু বর্ষার সময় খুব বিশ্রী অবস্থা হয় এখানে। প্যাচপেচে কাদায় ভরে যায়। রান্নাবান্না করা যায় না অনেক দিন। বৃষ্টিতে বিছানাপত্র ভিজে যায়। গরমের দিনেও বেশ কষ্ট। বিশেষ করে বাঁকুড়ার এই অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে

সব পুকুর শুকিয়ে যায়। কুয়োর জলও পাওয়া যায় না। তখন গাড়ি করে জল আসে।

এখানে আসার পর মাসখানেক সময় গুছিয়ে নিতেই গেল। চারদিকে অব্যবস্থা। এটা পাওয়া যায় তো ওটা পাওয়া যায় না। গোলমাল বিক্ষোভ লেগেই আছে প্রতিদিন। সমস্ত রাগ ক্যাম্পের অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের বিরুদ্ধে। সেই নাকি রিফিউজিদের সব টাকা চুরি করছে।

ভবেশ সেদিন গিয়েছিল অফিসে। তার ভাগ্যে যে ত্রিপলটি পড়েছে তাতে বড় বড় দুটো ফুটো। সামনে বর্ষা আসছে। এখন থেকে না পালটালে মুশকিলে পড়বে। অথচ দুতিনবার এ নিয়ে অভিযোগ জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি।

অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এখনও অফিসে নেই। কিন্তু তার ঘরে একটি ছেলেকে বসে থাকতে দেখে ভবেশ আশ্চর্য হয়ে গেল। ছেলেটিকে তার চেনা চেনা মনে হচ্ছে। ধলাপুকুর গ্রামে তার শালির ছেলে শঙ্করের বন্ধু না ছেলেটি? শঙ্করের বিয়েতে তার সঙ্গে শেষ দেখা। খুব হইচই করে বাড়ি মাতিয়ে রেখেছিল সে সময়।

ছেলেটির নাম রবীন সেনগুপ্ত। বদ্যির ছেলে। বাড়ি ছিল ঢাকায়। শঙ্করই তার বন্ধুর জীবনের কথা শুনিয়েছিল। গল্পের মতো সে কাহিনি।

শঙ্কর বছরখানেক আগে কলকাতায় চলে গিয়েছিল। বরাবরই একটু বাউন্ডুলে ধরনের ছেলে শঙ্কর। পাকিস্তান হবার পর তাদের গ্রামের অনেকে হিন্দুস্থান চলে গিয়েছে। তারও হঠাৎ খেয়াল হয়েছিল যাই ওদিককার ভাবগতিক একবার দেখে আসি। কি জানি দেশ ছাড়তে হয় যদি কোনও দিনও।

কলকাতায় গিয়ে শঙ্কর রিফিউজি হয়ে নাম লিখিয়েছিল। একলাই ছিল সে। উঠেছিল কাশীপুর ক্যাম্পে। ওই ক্যাম্পে থাকার সময় রবীনের সঙ্গে আলাপ। ক্যাম্পের পাশেই চায়ের দোকান। সেখানে রবীন কাজ করত। রবীন হয়তো বয়সে দুতিন বছরের ছোট হবে। শঙ্করের তখন আঠারো বছর বয়স। দুজনের মধ্যে খুব ভাব হয়ে গেল। ভাব হয়ে গেল এই কারণে যে শঙ্কর ও রবীন দুজনেই ডাকাবুকো ধরনের বেপরোয়া ছেলে।

রবীন তার জীবনের কথা বলেছিল শঙ্করকে। তার দেশ ছিল ঢাকা জেলার এক গ্রামে। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তার বাবা-মা মারা যায় ওলাওঠায়। অনাথ শিশুকে তখন মানুষ করতে থাকে গ্রামের একটি স্ত্রীলোক—যে লোকের বাড়ি বাড়ি দুধ দিত। এইভাবে পাঁচ বছর পর্যন্ত কাটে। সে সময় রবীনের দাদামশাই সন্ধান পেয়ে রবীনকে নিজের কাছে নিয়ে যায়। এরপর দেশ ভাগ হয়ে গেল। দাদু মারা গেলেন। দাদুর একমাত্র ছেলে মামা চলে এলেন কলকাতায়। তিনি জায়গা পেলেন এক জবরদখল কলোনিতে। রবীনেরও সেখানে আশ্রয় জুটল। মামা তাকে স্কুলেও ভর্তি করে দিলেন। ১৯৪৮ সাল সেটি। রবীন যাদবপুরের কাছে একটি স্কুলে ক্লাশ টুতে ভরতি হল। ক্লাস এইটে পড়ার সময় দুটো ঘটনা ঘটল তার জীবনে। মামার বিয়ে হল। নতুন

মামীমার সঙ্গে রবীনের সংঘাত শুরু হল। দ্বিতীয়ত হেডমাস্টারের সঙ্গে মুখে মুখে তর্ক করায় অ্যানুয়াল পরীক্ষার পর তিনি রবীনের প্রোমোশন আটকে দিলেন। বললেন, গার্জিয়ানকে ডেকে নিয়ে আসতে।

রবীন সেদিনই ঠিক করেছিল সে আর বাড়ি যাবে না। বাড়ি থেকে সে পালাবে। তার এক সঙ্গী জুটে গেল। তার সহপাঠী কমল। কমলও পরীক্ষায় ফেল করেছিল।

দুবন্ধুর কারও কাছে পয়সা ছিল না। যাদবপুর থেকে দু বন্ধু হেঁটে গেল হাওড়া স্টেশনে। কিন্তু পকেটে পয়সা নেই। বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়তেও সাহস হল না। এদিকে দুদিন খাওয়াদাওয়া জোটেনি কারও। তিন দিনের দিন কমল বলল, আমি আর পারছি না। আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। তুইও ফিরে যা।

কিন্তু রবীন বাড়ি ফিরতে চায়নি। সে একাই থেকে গেল হাওড়া স্টেশনে। কিন্তু খিদে সহ্য করতে না পেরে সে চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। সে ঠিক করল যখন ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ঢুকবে তখন সে ঝাঁপ দেবে।

কিন্তু সেই চরম মুহূর্ত আসার আগে একজন ধরে ফেলল তাকে। বলল, এখুনি মারা পড়ছিলে ছোকরা। প্ল্যাটফর্মের অত ধার ঘেঁসে কি কেউ দাঁড়িয়ে থাকে?

লোকটি বুঝতে পারেনি যে, রবীন আত্মহত্যা করার উদ্দেশ্য নিয়েই ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। বড়বাজারে এক দোকানে কাজ করে। এমন কোনও তালেবর লোক নয়। সামান্য এক দোকান কর্মচারী। কিন্তু লোকটি যে তার প্রতি সহানুভূতিশীল সেটি বোঝা গিয়েছিল। সে তাকে নিয়ে এসেছিল বড়বাজারে। খাবার জন্য কিছু পয়সা দিয়েছিল। তারপর বলেছিল এটা হল বড়বাজার, এখানে পয়সা উড়ে বেড়াচ্ছে। ধরে খেতে পারলেই হল।

কিন্তু উড়ে যাওয়া পয়সা ধরে ফেলা অত সহজ ছিল না। প্রচুর পরিশ্রম করে সে পয়সা পকেটে তুলতে হত। রবীন কাজ পেয়েছিল ঠ্যালা চালাবার।

কলকাতার প্রচণ্ড রোদ্দুরে পিচ গলা গরমের মধ্যে সে রাস্তায় ঠ্যালা চালাত। এক একটা ঠ্যালায় দুজন করে লোক থাকে। সে ছিল এ দুজনের একজন। রাতে থাকত গাড়ি বারান্দার নীচে। কিছুদিন পরে অসহ্য হয়ে উঠল এ জীবন। এই প্রচণ্ড পরিশ্রম সহ্য করা মুশকিল হয়ে উঠল তার পক্ষে। সে ইতিমধ্যে খবর নিল কাশীপুরের একটি চায়ের দোকানে বয় চাইছে।

কাশীপুরের ওই চায়ের দোকানটি কাশীপুর ট্রানজিট ক্যাম্পের একদম লাগোয়া। দোকানের অধিকাংশ খদ্দের ক্যাম্পের বাসিন্দা। অনেক সময় চা করে ক্যাম্পের ভিতর নিয়ে যেতে হত অর্ডার সাপ্লাইয়ের জন্য। এইভাবে যেতে যেতে রবীনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল শঙ্করের।

মাস ছয়েক পরে শঙ্করই রবীনকে বলল,

আমি দ্যাশে ফিইর‍্যা যামু ঠিক করছি। তুইও আমার সঙ্গে চল।

কোথায় যেতে বলছ? পাকিস্তানে?

আমাদের কাছে পাকিস্তানই কি বা হিন্দুস্থানই কি। আমাদের কাছে সবই সমান। হিন্দুস্থানে সুখটা তো দেখছি। তার চাইতে গাঁয়ে চল। খাওয়া পরার চিন্তা থাকবে না। ভালো না লাগলে চইল্যা আসবি।

অতএব রবীন একদিন শঙ্করের সঙ্গে বরিশাল এক্সপ্রেসে চেপেছিল।

ভবেশ এইটুকু জানত রবীন সম্পর্কে। দেশ ছাড়ার সময় সে শঙ্করদের আর খোঁজখবর নিতে পারেনি। ধলাপুকুর গ্রামের আর কাউকে পায়নি, যাদের কাছ থেকে গ্রামের খবর নিতে পারে। এতদিন পরে রবীনকে পেয়ে সে যেন হাতে চাঁদ পেল।

আরে রবীন না? চেনা চেনা লাগে।

রবীন বলল, আমি আপনাকে চিনছি। শঙ্করের মেসো তো আপনি।

হ শঙ্কর কোথায়? সে বাঁচে আছে?

শঙ্কর কোথায় আমি জানি না। আমার আগেই ওরা পাকিস্তান ছাড়ছে।

আমার নাম কিন্তু এখন রবীন সেনগুপ্ত নয়। ও নামে ডাকলে এখানে কেউ চিনবে না।

তার মানে?

আমার নাম এখন সুধীরঞ্জন দাস। ক্যাম্পে সবাই আমাকে রঞ্জু বলে ডাকে।

ভবেশ শুনেছিল, খুনের আসামিরা নাকি নাম পালটে অন্য জায়গায় চলে আসে। তাহলে রবীনেরও কি সেইরকম কোনও ঘটনা ঘটেছে নাকি?

সে বলল, ব্যাপারটায় কেমন খটকা লাগে—

রঞ্জু হেসে বলল, না যা ভাবছেন তেমন কিছু নয়।

তাহলে?

পরে সব কমু। আগে কয়েন আপনারা কবে আসলেন?

এই তো এহনও একমাস পোরে নাই।

আমিও আসছি মাসখানেক। সঙ্গে মা-ও আসছে।

মা? তুমি তো একলা ছেলে? শঙ্করে যে বলছিল তোমার তিনকুলে কেউ নাই।

নাই। পাইতে কতক্ষণ। আমি আমার মাকে খুঁজে পাইছি। মায়ের ইচ্ছেতেই আমার নতুন পরিচয়—রবীন থেকে সুধীরঞ্জন।

এ যে দেখছি ধাঁধার মতো কথা কও রবীন—

আমাকে রঞ্জুই বলুন।

আচ্ছা তাই হবে। তা ভাবগতিক বুঝতাছ কেমন? তোমার কি মনে হয়? আমরা কী পুনর্বাসন পাব?

পুনর্বাসন তো নিশ্চয়ই। তবে কোথায় হবে সেটা নিয়েই এখন সমস্যা। আমরা সবাই চাই বাংলার মধ্যে পুনর্বাসন।

তোমরা সবাই মিলা একটা কিছু ঠিক করো। যেহানেই হোক, আমরা চাষি মানুষ।

গোরু-জমিন-লাঙল যেহানে পাব সেহানেই যাইতে চাই। শঙ্করের খবর তাহলে কিছু রাখো না?

না, তার বউকে ধরে নিয়ে গ্যাছে গুন্ডারা—সে খবর নিশ্চয়ই শোনছেন?

হ্যাঁ। সেই খবরতো দেশে বইয়া মৌলবিসাহেব আমাদের দেলেন—গেরামের অবস্থা যে অত খারাপ হয়ে যাবে তা ভাবিনি। ধলাপুকুর গ্রাম থিকা সব নমশূদ্ররাই চলে আসছে। গোটা পাড়া একদম শ্মশান। কিন্তু কে কোথায় আছে আমি জানি না। রঞ্জু বলে : হয়তো দেখা হয়ে যাবে। যেমন হঠাৎ আপনাদের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল।

তোমারে পাইয়া যেন আত্মীয়দের পাইলাম। হাজার হোক জোয়ান ছাওয়াল তুমি। কলকেতেয় তুমি পড়াশোনা করছ। প্যাটে বিদ্যে আছে। তুমি থাকলে আমাগোর একটা আশা ভরসা।

আপনাদের পরিবারের সবাই এসেছে?

আমার এক ভাই আসেনি। দু ভাই শুধু আসছি। চলো আমার ক্যাম্পটা দেখবা।

আপনি অফিসে কিসের লাইগা?

একটা ফুটা তেপল দেছে। সেডা পালটাবার জন্য খালি ঘুরায়।

রঞ্জু বলল, ওটা আমার ওপর ছাইড়্যা দেন। অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের লগে আমার খুব খাতির হইয়া গ্যাছে গিয়া। আমি ব্যবস্থা করে দেব।

সেদিন যেতে যেতে রঞ্জু শুনিয়েছিল তার নতুন জীবনে উত্তরণের কাহিনি। কীভাবে রবীন থেকে সুধীরঞ্জন হল সেই গল্প।

ধলাপুকুর গ্রামে এসে পাঁচটি মাস কোথা দিয়ে কেটে গিয়েছিল রবীনের। রবীন ভেবেছিল এখানেই সে বাকি জীবনটা চাষবাস করে কাটিয়ে দেবে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর।

শঙ্করের বিয়ের পর এক সপ্তাহ কেটেছে কি কাটেনি। হঠাৎ দাঙ্গা বেধে গেল আশেপাশের গ্রামে। মুহূর্তের মধ্যে সে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ল ধলাপুকুর গ্রামে। রাতের অন্ধকারে শঙ্করদের বাড়ি আক্রমণ করল গুন্ডারা। শঙ্করের সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী কাজলকে মুখে কাপড় বেঁধে নিয়ে চলে গেল গুন্ডারা। শঙ্কর বাধা দিতে গিয়ে আহত হল। তাদের বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে হামলাকারীরা চলে গেল।

রবীন সে রাতে পাশের গ্রামে এক নেমন্তন্নে গিয়েছিল। দাঙ্গার খবর শুনে সে পরদিন ধলাপুকুরে গিয়ে দেখল গ্রাম ফাঁকা। হিন্দুরা ভোর না হতেই সবাই পালিয়েছে। শুধু সেই শ্মশানের মতো স্তব্ধ হিন্দু পাড়ায় একটি মাত্র প্রাণী যেন শ্মশান জাগিয়ে বসেছিল—সে বুড়ি চারুবালা। চারুবালা দাস। চারুবালা নমশূদ্র সম্প্রদায়েরই মানুষ। কিন্তু তার তিনকুলে কেউ নেই। সে ভিক্ষে করে চেয়েচিন্তে সংসার চালাত।

সকালবেলা সবাই যখন গ্রাম ছেড়ে পালায় তখন চারুবালাকে কেউ সঙ্গে করে নিয়ে যায়নি। কারণ চারুবালা নিঃস্ব। তার কোনো সহায়সম্পদ নেই। তা তার বয়স

হয়েছে। বয়সের ভারে একটু রুগ্ণ হয়ে গেছে।

রবীনকে দেখে কেঁদে ফেলল চারুবালা।

আমারে তুই এহান থেকে নিয়ে চল বাবা। সবাই আমারে ফেলায়ে থুয়ে গেছে।

তুমি কোথায় যাবে ঠাকুমা?

হিন্দুস্থান যামু।

কেন এখানে থাকবা না?

আর কার ভরসায় থাকব বাপ। আর কেডা আছে আমার? আমারে তুই হিন্দুস্থান নিয়া চল।

রবীন বলেছিল, তুমি হিন্দুস্থানে গিয়ে কি কববা বুড়ি? তুমি এহানে ভিক্ষা করে খাও, হিন্দুস্থানে গিয়াও ভিক্ষা করবা। তার চেয়ে তুমি এই বয়সে আর গাঁ না ছেড়ে শঙ্করদের বাড়ি পাহারা দাও। তোমারে কেউ কিছু বলবে না।

বুড়ি বলেছিল, যদি মরি তাহলে হিন্দুস্থানের মাটিতেই মরব। যারা আমার দুধের মেয়ে কাজলেরে নিয়া গেছে তাদের দ্যাশে আমি থাকব না। তুই যদি আমায় না নিয়া যাস আমি গলায় দড়ি দে মরব।

তোর মত ঠিক আমার এক বেটা ছেল, গোপাল আমার। তার নাম ছিল সুধীরঞ্জন। আজ আমার রঞ্জু বেঁচে থাকলে তোরে অত সাধতাম না। বল নিয়া যাবি আমায়?

রবীনের হঠাৎ কী যেন হয়ে গেল তখন। তার মায়ের কথা মনে হল। তার মাকে কোনও দিন দেখেনি সে। জন্মে পর্যন্ত সে মাতৃস্নেহ পায়নি। সে মানুষ হয়েছে পরের কাছে, অনাদরে অবহেলায়। তার মন সামান্য একটু স্নেহের জন্য বর্ষার চাতকের মতো উন্মুখ হয়ে ছিল। কিন্তু কোনও দিন সে এটা বোঝেনি। তার ষোলো-সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত নিজের কথা ভাববার এতটুকু অবসর সে পায়নি। তার জীবন ছুটে চলছিল এক দ্রুতগামী ট্রেনের মত। এক একটা স্টেশনে ট্রেনটি সামান্য কিছুক্ষণের জন্য থেমে আবার ছুটে চলছে। তার মধ্যে কোথাও যেন বিরাম বিশ্রাম ছিল না।

সেদিনের পটভূমিও ছিল বিচিত্র। গতকাল রাতে চোখের সামনে অনেকগুলি বাড়ি জ্বলছে। আগুন নেভাবার লোকও কেউ ছিল না। শঙ্করদের বাড়িও ধ্বংসস্তূপ এখন। যদিও তাদের পুকুর, বাগান, ধানি জমি সবই পড়ে আছে। কিন্তু তাদের ভিটেবাড়ির চিহ্নমাত্র নেই। সারা গ্রাম জুড়ে শ্মশানের নিস্তব্ধতা। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রেতিনীর মতো যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে চারুবালা।

রবীনও যেন ভাগ্যচক্রের আবর্তনে এই মহাপ্রলয়কালে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছে। সে বুঝতে পারছে তার আবার যাবার সময় হয়েছে। জীবনের এই অধ্যায়টিও শেষ হয়ে গেল রবীনের।

কিন্তু তার চারণিক জীবনে, একা যাত্রাপথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে এ কোন্

নারী। চারুর বয়স ষাটের ঘরে। দারিদ্র্যের আর শোকের ভারে সে শীর্ণা নদীর মত কোনও মতে বহে চলেছে।

এই বৃদ্ধা তার মা। তাঁকে সন্তান বলে ডেকেছে। বহুকাল আগে তার হারিয়ে যাওয়া সন্তানের নাম ছিল নাকি সুধীররঞ্জন।

রবীন তাকিয়ে দেখেছিল বৃদ্ধার চোখ দিয়ে দল গড়িয়ে পড়ছে।

গ্রামে ছ'মাস থাকার সময় এই বৃদ্ধাকে নিয়ত দেখেছে সে। সে ছিল এক রকম অন্তোবাসী। জমি জায়গা ছিল না। ঝুপড়ি করে বাস করত। এর ওর দয়ায় জীবিকা নির্বাহ করত! সবাই তাকে বলত রঞ্জুর মা। কোনও দিনও সে সম্মান পায়নি, ভালোবাসা পায়নি। বুড়ি বলত আপন মনে আমার মরণ হয় না ক্যান। যম আমারে নেয় না ক্যান? আমার রঞ্জু, প্যাটের শত্তুর আমার, আমারে ফ্যালায়ে থুয়ে কোথায় গেলি তুই—

রবীন আর ভাবেনি। সে বলেছিল, মা, আজ থেকে আমি তোমার ছেলে রঞ্জু। আমি তোময় নিয়ে যাবো চলো আমার সঙ্গে।

রঞ্জুর সঙ্গে সবচেয়ে বেশি ভাব হয়ে গেল, বিমলের। রঞ্জুর বড় বড় চোখ, এক মাথা চুল, চোখে স্বপ্নালু দৃষ্টির মধ্যে কেমন যেন এক রহস্যময় মায়া আছে যা যে কোনও মানুষকে অল্প সময়ের ভেতর আকৃষ্ট করে ফেলতে পারে।

বিমল যখন রঞ্জুর সতেরো বছরের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা শোনে তখন সে অবাক হয়ে যায়।

বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে বিমলের পরিচয় মাত্র কিছুদিনের। চরমুন্সী আর তার আশপাশের গ্রামের সীমানা পেরিয়ে সে আগে কখনও বৃহত্তর পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ পায়নি।

দেশত্যাগ, শিয়ালদহ স্টেশনে কিছু দিনের জীবন তার কাছে এক বিরাট পরিবর্তন। কিন্তু সে তো আর কিছুই জানে না কলকাতার জীবন সম্পর্কে। যেমন করে রঞ্জুদা জানে। রঞ্জুর কাছে সে শোনে এই শহরে ফুটপাথে শুতে গেলেও পুলিশকে দিনে চার আনা আর মস্তানদের সরদারকে আর চার আনা করে দিতে হয়। সরদাররাই ঠিক করে দেয় কে কোথায় শোবে। কে কোথায় ভিক্ষে করবে। এমন কী কে কোন্ এলাকায় পকেট মারবে।

সে মুগ্ধ বিস্ময়ে শোনে কলকাতার অপরাধ জগতের কথা। কলকাতা থেকে অপরাধের কাজের জন্য ছেলে নিয়ে যেতে দিল্লি বম্বে থেকেও লোক আসে। তারা মোটা মাইনে দেবার লোভ দেখিয়ে ছেলেদের নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে গিয়ে তাদের অপরাধের কাজ শেখানো হয়।

এই অপরাধের দুনিয়ার মধ্যে থেকেও রঞ্জু অপরাধী হয়নি। সব সময় সৎভাবে পরিশ্রম করে জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করেছে। যখন সে ঠ্যালা চালাত প্রচণ্ড রোদের মধ্যে, তখন কোনওরকমে ঠ্যালা যদি মোটরগাড়ির কোনও অসুবিধা সৃষ্টি করত

তাহলে মোটরের ড্রাইভারেরা হাত বাড়িয়ে চড়চাপড় মারত। নো-এন্‌ট্রি এলাকায় ঢুকে পড়লে পুলিশের ব্যাটনের বাড়ি খেতে হত।

সে যখন চা-এর দোকানে কাজ করত তখন কাপডিশ ভাঙলে মাইনে থেকে কেটে নেওয়া হত। আর কোনো খদ্দের যদি অভিযোগ করত, মালিক পিঠে একটা লাথি মেরে বলত, শুয়োরের বাচ্চা নিকালো হিঁয়াসে।

প্রতিদিন প্রাণধারণের গ্লানি সহ্য করে টিঁকে থাকাটাই কঠিন এই শহরে। তোমার যদি টাকা না থাকে, ক্ষমতা না থাকে, প্রতিপত্তি না থাকে, কেউ তোমাকে মানুষ বলে মনে করবে না।

তার চেয়ে এই ক্যাম্পে অনেক ভালো আছে উদ্বাস্তুরা। এখানে আশ্রয় আছে। নিরাপত্তা আছে। নিয়মিত ডোলের ব্যবস্থা আছে। আর আছে অধিকার প্রতিষ্ঠা করার মত মানসিকতা। রঞ্জুদা এইজন্য সবাইকে বলে, তোমরা এখানে আছ কারও দয়ায় নয়। আপন অধিকারে। বাস্তুহারা করল কারা? গদির ওপর বসল যারা। এই হাজার হাজার বাস্তুহারারাই কিন্তু দেশের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করল। স্বাধীনতা ক্ষুদিরাম নেতাজি সুভাষ, গান্ধি, নেহরুর জন্য যতটা এসেছে তার চেয়েও বেশি এসেছে এই ছিন্নমূল মানুষগুলির জন্য। কারণ দেশ ভাগ না হলে আর স্বাধীনতা এখনই আসত না। আর দেশভাগ হল তো উদ্বাস্তুদের মূল্যে। স্বাধীনতা না এলে, দেশ পরাধীন থাকলে তাদের তো এইভাবে শিবিরে থাকতে হত না।

রঞ্জুর কথাবার্তা একেবারে অন্য ধরনের। তার মধ্যে বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ সব সময় জ্বলছে। একটু দাহ্য বস্তু পেলেই সঙ্গে সঙ্গে আগুন জ্বলে যাবে।

সম্প্রতি উদ্বাস্তুদের আন্দামান পাঠাবার প্রশ্ন নিয়ে ভাবিত হয়ে পড়েছে রঞ্জু। তার মতে আন্দামান নয়, দণ্ডকারণ্যেই উদ্বাস্তুদের পাঠানো হোক।

রঞ্জু বলে আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না আমাদের দণ্ডকারণ্যে না পাঠিয়ে আন্দামান পাঠানো হচ্ছে কেন? কথা ছিল আমাদের মেনল্যান্ডের মধ্যেই পুনর্বাসন দেওয়া হবে।

ভবেশ বলে, দণ্ডকারণ্যই হোক আর আন্দামানই হোক, ফয়সালা করার ভার তোমার ওপর দিলাম রঞ্জু। শুনতাছি পূরবী মুখার্জি আইবেন। তাঁর সামনে তুমি কথাটা পাড়বা। তারপর তোমার যা ভালো মনে হয় করবা।

রমেশ বলে, তোমাদের কোনও কথাই আমি বোঝতে পারি না। আমরা বাঙালি, বাঙলার মধ্যে পুনর্বাসন পাব না ক্যান?

রঞ্জু বলে, আমিও তোমাদের সঙ্গে একমত। মাথা গরম করবা না রমেশদা, একটা জিনিস অবশ্য বুঝতে হবে। বাংলার মধ্যে পুনর্বাসন পাওয়া মুশকিল। আমরা দেরী করে আসছি। ফরটি নাইন-ফিফটি পর্যন্ত যারা আসছে তারা বাংলার মধ্যেই পুনর্বাসন পাইছে। আমরা চাই চাষের জমি। বাংলায় এত চাষের জমি কই? দণ্ডকারণ্যে চাষের জমি আছে। আমরা দণ্ডকারণ্য যাইতে চাই।

ক্যাম্পের আর একজন যুবক তরুণ হালদার বলে উঠল, দণ্ডকারণ্যে পাথুরা জমি। পাহাড় পর্বত চারিদিক। রামের বনবাস হইছিল সেই দ্যাশে। আমরা আর নতুন করিয়া বনবাসী হইতে চাই না। রঞ্জু প্রতিবাদ করে ফ্যাচর ফ্যাচর কোরো না তরুণদা। রামায়ণের কাল এখন আছে নাকি? সে সময় এই বাঁকুড়াও তো জঙ্গল ছিল। দণ্ডকারণ্যে জঙ্গল কেটে নতুন নতুন বসত তৈরি হচ্ছে। অনেক রিফিউজি সেখানে গেছে। আন্দামান সম্পর্কে আপত্তি জানাও, সেটা বুঝি। কিন্তু দণ্ডকারণ্যের চান্সটা ছাড়া উচিত হইব না।

এই নিয়ে নিত্য বচসা লেগেই আছে। ক্যাম্পে এখন সকলের সামনেই অনিশ্চয়তা। ক্যাম্পে দারুণ উত্তেজনা চলছে। এছাড়া ক্যাম্পের নানা সমস্যা নিয়ে বিক্ষোভ তো লেগেই আছে।

বাঁকুড়ার বামপন্থী নেতারা প্রায়ই এসে বক্তৃতা করে যাচ্ছেন। তাঁদের বক্তব্য : সরকারের সুষ্ঠু পুনর্বাসন নেই। দিনের পর দিন উদ্বাস্তুদের ক্যাম্পে ফেলে রাখা হয়েছে। পুনর্বাসনের উচ্চবাচ্য হচ্ছে না। তাছাড়া শুধু পুনর্বাসন দিলে চলবে না। অর্থনৈতিক পুনর্বাসনও চাই।

ইতিমধ্যে জানা গেল উদ্বাস্তু মন্ত্রী ক্যাম্প পরিদর্শন করতে আসছেন।

মন্ত্রীর প্রোগ্রাম কী হবে তা নিয়ে আগে থেকে আলোচনা করার জন্য জিপে করে অফিসাররা প্রায় রোজই আসতে লাগলেন। অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের সঙ্গে মিটিং রোজই বসতে লাগল।

ক্যাম্পের রাস্তাঘাটগুলো মেরামত হতে লাগল। পিছনের জঙ্গলটা সাফ হয়ে গেল। হাইওয়ে থেকে একটি সুন্দর মোটর রাস্তা করে দেওয়া হল।

ঠিক হল, ক্যাম্পবাসীদের পক্ষ থেকে মন্ত্রীকে একটি সম্বর্ধনা দেওয়া হবে। জেলা কংগ্রেসের সভাপতি সভাপতিত্ব করবেন। মন্ত্রী সেদিন রাতটা বিষ্ণুপুর পি ডবলু ডি বাংলোতে থেকে পরদিন ভোরে সিউড়ি চলে যাবেন।

উদ্বাস্তুদের মধ্য থেকে একজন মন্ত্রীকে স্বাগত জানাবে ঠিক হল। কিন্তু কে বক্তৃতা দেবে? সবাই বলল, আমাদের হয়ে বলবে রঞ্জু।

তখন রঞ্জুকে শিখিয়ে দেওয়া হল কীভাবে বক্তৃতা দিতে হবে।

রঞ্জু বলল, ঠিক আছে আমি বলব। কিন্তু আমি তো মন রাখা কথা বলতে পারব না। অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বললেন, তুমি তোমাদের বক্তব্য বলতে পারো। তবে মন্ত্রীর সামনে আমার কাজের সমালোচনা কোরো না। তাহলে আমার চাকরি চলে যাবে। রঞ্জু বলল, না খামোখা আপনাকে টানতে যাব না। তবে আমাদের কথা আমরা বলব।

মন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে একটা উৎসবের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। জেলার প্রথম উদ্বাস্তু শিবির সফরে আসছেন মন্ত্রী। তাছাড়া এটা মন্ত্রীর নিজের জেলা। এখানে তাঁর বাঘের মতো শক্তি। সবাই তটস্থ। বিরাট প্যান্ডেল করা হয়েছে। উদ্বোধনী

সঙ্গীত গাইবার জন্য বিষ্ণুপুর থেকে গানের স্কুলের মেয়েদের আনা হয়েছে, মন্ত্রীর সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্বাস্তু ত্রাণ দফতরের অফিসাররা আসছেন। বাঁকুড়ার এস পি এসে ঘুরে গেছেন। দুবার। জেলাশাসক থাকছেন। মহাকরণের উদ্বাস্তু ত্রাণ সচিব থাকছেন।

অবশেষে নির্ধারিত সময়ের আধ ঘণ্টা পরে মন্ত্রী এলেন। বিমল মন্ত্রীকে দেখে হতাশ হল। সে ভেবেছিল মাথায় পাগড়ি পরা যাত্রার দলে যেমন দেখা যায় তেমনি কেউ হবে। অন্তত ঝলমলে পোশাক থাকবে। তা না সাদামাটা একজন মহিলা, পরনে খদ্দরের শাড়ি। গায়ের রং কালো, আমাদের মা মাসির মতো চেহারা।

মন্ত্রী ঘুরে ঘুরে সব দেখলেন। ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে চারিদিকে। তার উগ্রগন্ধ নাকে লাগছে। মন্ত্রী মেয়েদের জিজ্ঞাসা করলেন, কোনও অসুবিধা হচ্ছে কি না। তারা উত্তর দেবে কি হাসতে লাগল।

মন্ত্রী গাল টিপে বাচ্চাদের আদর করলেন। মায়েদের সঙ্গে কথা বললেন।

মন্ত্রী স্টোরে গিয়ে দুধ পাউরুটির হিসাব নিলেন। স্টক শেষ হয়ে গেছে। নতুন স্টকের জন্য মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল। তিনি নোট নিলেন।

বিমলের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হতেই মন্ত্রী তাকে বললেন, তুমি কী পড়ো?

এখন পড়ি না।

কোন্ ক্লাস পর্যন্ত পড়েছিলে?

ক্লাস ফোর।

মন্ত্রী ডি.এম-কে বললেন, অবিলম্বে স্কুলের ব্যবস্থা করতে।

মন্ত্রী বক্তৃতায় বললেন, আমার ভাই ও বোনেরা, আপনারা যে কষ্ট সহ্য করেছেন দেশের প্রকৃত ইতিহাস যদি কোনও দিন লেখা হয় তাহলে আপনাদের কথা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। উদ্বাস্তু সমস্যা আজ দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা। এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান না হলে দেশের কোনও সমস্যারই সমাধান হবে না। আন্দামানে আপনাদের পুনর্বাসনের জন্য ভারত সরকার এক বিরাট পরিকল্পনা করেছেন। সেখানে অনেকগুলি দ্বীপে নতুন উপনিবেশ গড়ে তোলা হবে। ভারতের বিভিন্ন দেশের মানুষ সেখানে আসবেন। তবে নেহরুজি ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে বাঙালি উদ্বাস্তুরা আন্দামানে অগ্রাধিকার পাবে। আপনারা এ সুযোগ নষ্ট করবেন না। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা ডা. বিধানচন্দ্র রায় অনেক ভেবেচিন্তেই আন্দামানকে উদ্বাস্তুদের হাতে তুলে দিতে চান। আপনারা রাজি হলেই আমরা আপনাদের আন্দামানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করব।

রঞ্জু এবার বলতে উঠল। সে ইতিমধ্যেই কলকাতার ভাষা রপ্ত করেছে। সে বলল, মাননীয়া মন্ত্রী যে আমাদের মধ্যে এসেছেন তার জন্য আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু আজ এক বছরের ওপর আমরা ঘরছাড়া—শিয়ালদা স্টেশনে আমরা অনেকেই কুকুরের মতো জীবন কাটিয়েছি। এখানে আমরা সরকারি সাহায্য পাচ্ছি

একথা সত্যি। কিন্তু এভাবে পরগাছা হয়ে বেঁচে থাকতে আমরা আসিনি। আমরা নিজেরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই। কখনও আমরা শুনছি আমাদের ওড়িশা পাঠানো হবে, কখনও শুনছি নৈনিতাল, কখনও দণ্ডকারণ্য। এখন শুনছি আন্দামান। মাননীয়া উদ্বাস্তু মন্ত্রীর কাছে আমার একমাত্র নিবেদন যে, এভাবে আমাদের নিয়ে খেলা না করে একটা সুষ্ঠু নীতি সরকার ঠিক করুন।

সঙ্গে সঙ্গে হাততালিতে ফেটে পড়ল জনতা।

মিটিং শেষ হতে ক্যাম্পের লোকেরা রঞ্জুকে অভিনন্দন জানাল।

মুখের ওপর জবাব দেছ।

তুমিই আমাদের একমাত্র ভরসা রঞ্জু। রঞ্জু না থাকলে আমাদের কথাগুলি কে অমন গুছায়ে বলত?

বিকেলবেলা একজন এসে খবর দিল, মন্ত্রী সুধীরঞ্জন দাসকে ডাকছেন।

রঞ্জু দুরুদুরু বুকে গিয়ে দাঁড়াল রেস্ট হাউসে। ঘরের মধ্যে প্রচুর লোক। মন্ত্রী সবাইকে চলে যেতে বললেন। ঘরের ভেতর রঞ্জু আর মন্ত্রী। কিছুক্ষণের নীরবতা। মন্ত্রী নীরবতা ভঙ্গ করলেন। বললেন, তোমার বক্তৃতা শুনলাম। বেশ তেজ আছে তোমার বক্তৃতায়। তোমার মতো ছেলেদেরই দরকার। উদ্বাস্তুদের মধ্যে ভালো লিডার নেই। ওদের খ্যাপাবার লোক যথেষ্ট আছে। তুমি কী কোনও রাজনীতি করো?

রঞ্জু বলল—না।

তোমার বয়স কত?

সতেরো বছর।

দেখে মনে হয় আরও বেশি। আসলে তোমার ম্যাচিয়ুরিটি আছে। সেটা অনেকের বেশি বয়সেও আসে না। একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি উদ্বাস্তুদের আন্দামানে যাওয়ার বিরোধিতা করছ কেন?

দেখুন,আমরা নদীমাতৃক বাংলাদেশের মানুষ। এমন কোনও জায়গায় আমাদের মন টিকবে না যেখানে আমরা আমাদের পরিচিত পরিবেশকে খুঁজে পাব না।

সেইজন্যই তো আন্দামান আইডিয়াল। বাংলাদেশে যা যা আছে ওখানে তাই আছে। নদী পলিমাটি, সবুজ গাছ। প্রচুর মাছ। নারকেল, সুপারি।

দণ্ডকারণ্যে কেন আমাদের পাঠাচ্ছেন না?

দণ্ডকারণ্য স্কিম ভর্তি হয়ে গেছে। ভালো জমি উর্বরা জমি সব বিলি হয়ে গেছে। এখন যা আছে পাথুরে জমি। তোমাদের মন উঠবে না। যদি তোমরা সেখানে যেতে চাও, আমি পাঠাতে পারি। কিন্তু আমার কথা যদি শোনো আন্দামান হচ্ছে সব চেয়ে ভালো জায়গা।

রঞ্জু কিছু কথা বলল না।

মন্ত্রী আবার বললেন, বেশ আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয় তাহলে আমি তোমাদের কাছে আন্দামানের অফিসারদের পাঠাব। তাঁরা এঁর মধ্যেই সেখানে কিছু

কিছু উদ্বাস্তুকে পাঠিয়েছেন। তাদের মুখ থেকে শুনে যদি তোমরা সিদ্ধান্ত নাও তাহলে তাই নিয়ো।

এমন সময় সেক্রেটারি এসে বলল, ম্যাডাম, আপনার বাঁকুড়া যাবার সময় হয়ে যাচ্ছে।

মন্ত্রী বললেন, তাহলে উঠি আজ। যা বললাম, ভেবে দেখো।

রঞ্জু ঘাড় নাড়ল। কালীপুজোর বেশিদিন বাকি নেই। এর মধ্যেই আশেপাশে গ্রামে বাজি ফোটানো শুরু হয়ে গেছে। বিমল বাজি কেনার জন্য পয়সা চেয়েছিল বাবার কাছে। তার ভাইও বাজি কেনার বায়না ধরেছিল।

ভবেশ বলেছিল, কালীপুজোর এখনও পাঁচদিন দেরি। এর মধ্যে বাজি কিনে নষ্ট করার মত পয়সা তার নেই। ক্যাম্পে প্রতিটি লোক পেত সপ্তাহে আড়াই কিলো করে চাল। আর মাথা পিছু ১৩ টাকা ৬০ পয়সা করে ক্যাশ ডোল। এছাড়া আটা সরষের তেল পাওয়া যেত। মেয়েরা শাড়ি ও বাচ্চারা জামা পেত মাঝে মাঝে। পুজোর সময় সবাই নতুন জামা কাপড় পেয়েছিল।

ভবেশ লোকের বাড়ি মজুর খাটতে যেত। একদিন মজুর খাটলেই তিন টাকা। তিন টাকার অনেক দাম তখন। ক্যাম্পে মোটামুটি পেট ভরে খাওয়ার কোনও অসুবিধা ছিল না। শিবকৃষ্ণ বাঁকুড়ার একটি সোনার দোকানে কাজ পেয়ে গিয়েছিল, দিনে চার টাকা মজুরি। কাজ না থাকলে পয়সা নেই। সে বাসে করে রোজ বাঁকুড়া যাওয়া আসা করত। রমেশও ভবেশের সঙ্গে জন খাটতে যেত। ধানের মরশুমে মাঠে কাজ পেয়েছিল ওরা। সুরেন ঘরামি, নটবর মিস্ত্রি দুজনে বাজারে ছোটখাটো ব্যবসা শুরু করে দিল। ওরা চাষির কাছ থেকে আনাজ কিনে বিষ্ণুপুর বাজারে বসত। সামান্য পুঁজি। কিন্তু দিনের শেষে দুতিন টাকা লাভ থাকত।

যারা খাটতে পারছে তাদের আর্থিক কষ্টটা নেই। মেয়েদের মধ্যে অনেকেও বাবুদের বাড়ি কাজ করতে শুরু করেছে। এর মধ্যে রঞ্জু একটি রাতের স্কুল করেছে। কিন্তু ছেলে হচ্ছে না। ছোটরা পয়সার লোভ পেয়ে গিয়েছে। রাতের ইস্কুলে পড়াশোনার দিকে মন নেই কারও। রঞ্জু অনেক বকাঝকা করেও বেশি ছেলে জোগাড় করতে পারে না রাতের ইস্কুলে।

পুজোর পর একদিনও ইস্কুল বসেনি। এখন বাজি ফোটানোর জন্য ছোটরা ব্যস্ত।

বাবার কাছে পয়সা না পেয়ে বিমলের মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। সে মুখ ফুটে কখনও কিছু চায় না। এমনিতেই একটু চাপা স্বভাবের। তাছাড়া কথা বলার চেয়ে তার ভাবতে ভালো লাগে বেশি।

কিন্তু বাবা তাকে উলটে ধমক দেওয়ায় সে ঠিক করল আজ থেকে সে নিজেই রোজগার করবে। এতদিন সে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে। তাদের ক্যাম্পের কিছু ছেলে চা-এর দোকানে মিষ্টির দোকানে কাজ করে। বাসস্ট্যান্ডের চা, মিষ্টির দোকানগুলিতে প্রায়ই এমন ছেলে নেয়। যদিও উদয়াস্ত খাটায়, তবু এই খাটনি যথেষ্ট ভালো তার

কাছে। সে বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে এগোচ্ছিল, এমন সময় একটি জিপ এসে তার সামনে থামল। জিপের ডাইভার বলল, এখানে সুধীরঞ্জন দাস বলে কেউ আছে?

বিমল বলল, রঞ্জুদাকে খোঁজছেন? হ্যাঁ আছেন। ডাকব?

জিপে বসে আছেন তিনজন। একজন তাদের মধ্যে বয়স্ক। মাথায় চুল কম। একটু চাপা গায়ের রং। আর একজন একদম কমবয়সী। দেখলে মনে হয় কলেজে পড়ে। সুন্দর চেহারা। সিনেমার নায়কদের মতো। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। একটি সাদা প্যান্ট ও শার্টে তাঁকে ভীষণ মানিয়ে ছিল। টকটকে ফরসা রং। লম্বা দোহারা চেহারা। এক মাথা চুল।

আর একজন মোটামতো বয়স্ক ভদ্রলোক। তিনি বললেন, আমরা অফিসে বসছি, রঞ্জনকে ডেকে আনতে পারো।

ক্যাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের অফিস পাশের একটি বাড়িতে। বিমল এক দৌড়ে গিয়ে রঞ্জনকে খবর দিল।

রঞ্জন তখন একটি পত্রিকা পড়ছিল। ক্যাম্পে একমাত্র সেই পত্র-পত্রিকা পড়ে। আনন্দবাজার, যুগান্তর, বসুমতী—এই তিনটি পত্রিকা তার কাছে প্রিয়। রঞ্জন কারো কাছ থেকে এগুলি চেয়ে আনে, আবার পড়ে ফেরত দিয়ে দেয়।

পরপর তাঁবু। রঞ্জনদের ক্যাম্পটা একেবারে শেষের দিকে। তারপর বাগান। বর্ষাকালে রঞ্জনদের ঘরে অনেকবার সাপ ঢুকে পড়েছিল। ভাগ্যিস কামড়ায়নি।

বিমল বলল : রঞ্জুদা শিগগির চলো। তোমার কাছে জিপে করে অফিসার আইছে।

রঞ্জন বলল : কোন অফিসার আইল আবার?

বিমল বলল, এহন কত অফিসার আবে। মন্ত্রীর সঙ্গে তোমার খাতির হইয়্যা গ্যাছে সবাই জানছে তো।

জামা গলাতে গলাতে বলল, চল, কোথায় অফিসার?

অফিসে বইয়া আছে।

রঞ্জনকে বেরিয়ে যেতে দেখে তার মা বলল, এই হকাল বেলা আবার কোথায় যাস? চিঁড়া গুড় খাইয়া যা। বাজারে যাওন লাগব মনে আছে তো? ডোলের চাউল এ হপ্তায় মেলে নাই। বাজার থিকা আনান লাগব। হুনছিস—অ্যাই রঞ্জু—পোড়া-কপাল আমার।

রঞ্জন বুড়ির কথার জবাব না দিয়ে বিমলের সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের সঙ্গে কথা বলছিলেন বয়স্ক ভদ্রলোক। তার পাশে সুন্দরমতো 'অল্পবয়সী ভদ্রলোক একটি সিগারেট ধরিয়ে টানছিলেন।

অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের নাম রতন বসাক। ক্যাম্পের উদ্বাস্তুরা তাঁকে দেখতে পারে না। তাদের ধারণা রতন লোকটি তাদের রেশন থেকে চুরি করে। দু একবার ঘেরাও করা হয়েছে তাকে।

রতন বলল, স্যার এই হচ্ছে রঞ্জন। এই এখন এদের লিডার বলতে পারেন।

ভদ্রলোক বললেন, এত অল্প বয়স। আমি ভেবেছিলাম না জানি কত বড়।

তারপর রঞ্জনকে বললেন বোসো। তোমাকে তুমিই বলছি। বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট তুমি। কত বয়স তোমার?

সতেরো বছর।

আমার মেয়ে ওর চেয়েও ছোট। শিখার বয়স উনিশ। আগে পরিচয় করিয়ে দিই। আমার নাম হারাধন রাহা, এর নাম বিকাশ দত্ত। আমরা দুজনেই আন্দামান অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে কাজ করি। আর ইনি গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়ার রিফুজি রিহ্যাবিলিটেশনের অফিসার। নাম আর কে আনন্দ, দিল্লি থেকে আসছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুরোধে আমরা এখানে ক্যাম্পগুলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমরা দুজনে আন্দামানে থাকি। দত্ত অবশ্য নতুন এসেছে। ও আসামের ছেলে। কলকাতাতেই পড়াশোনা করেছে। ওর বাবা একজন নামী সাংবাদিক। কলকাতাতে ওর পক্ষে কাজ জোগাড় করা কঠিন ছিল না। ও কাজও করত বাবার কাগজে। কিন্তু সব ছেড়ে চাকরি করতে আন্দামানে এসেছে; ওর তো ভালোই লাগছে। কেমন লাগছে তোমার বিকাশ?

বিকাশ বলল, আমার তো খুব ভালো লাগছে। এত সুন্দর জায়গা। ঠিক ছবির মতো।

হারাধন রাহা বললেন : তোমার কথা আমাকে মিনিস্টার বললেন। মিনিস্টার বলেছেন, আন্দামান নিয়ে এক শ্রেণির লোক উদ্বাস্তুদের মধ্যে নানা গুজব ছড়াচ্ছে। তারা বলছে আমরা নাকি জোর করে উদ্বাস্তুদের আন্দামানে নিয়ে যেতে চাইছি। আমরা কারও ওপর জোর করতে চাই না। আমরা শুধু তোমাদের ভুল ধারণা ভেঙে দিতে এসেছি। বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর ও কুপার্স ক্যাম্পের রিফিউজিদের আমরা আন্দামানের জন্য বিশেষ করে সিলেক্ট করেছি। কারণ এই দুটি ক্যাম্পে সবাই প্রায় কৃষিজীবী। আন্দামানে তোমরা জমি পাবে। আর জমি মানে পাহাড়ি নয়। পূর্ববঙ্গের চেয়েও উর্বরা জমি। ৩০ বিঘে করে জমি দেওয়া হবে তোমাদের। বাড়ি তৈরির টাকা দেওয়া হবে। হাল বলদ লাঙল দেওয়া হবে। তোমরা যা হারিয়েছ তা সবই ফিরে পাবে আবার।

এত জমি আছে আন্দামানে?

হারাধনবাবু একটু হেসে বললেন, আন্দামান সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কী আগে বলো?

আন্দামান একটা দ্বীপ।

হারাধনবাবু বললেন, দ্বীপ মানে কি সন্দীপের চর? শুধু দ্বীপ নয়—দ্বীপপুঞ্জ। আন্দামান আর নিকোবর এই দুটি দ্বীপের সঙ্গে ৩০০ দ্বীপ আছে। ছোট ছোট দ্বীপ ধরলে ৫০০ ছাড়িয়ে যাবে। ৭২৫ কিলোমিটার লম্বা। এখনই সেখানে ষাট সত্তর হাজার লোক বাস করে। আমি আন্দামানের সর্বত্র ঘুরেছি। সেখানে মধ্য আন্দামানের

কয়েকটি দ্বীপ ডেভেলপ করা হচ্ছে জনবসতির জন্য। যেমন ধরো রঙ্গত, মায়াবন্দর ডিগলিপুর। আমরা চাই বাঙালিরা এই সব দ্বীপে আসুক। আগামী দিনে এখানে নতুন বাঙালি সংস্কৃতি গড়ে উঠবে।

রঞ্জু রাজনৈতিক নেতাদের কাছে শুনেছিল আন্দামান মানে কালাপানি। যেখানে ব্রিটিশরা নির্বাসন দিত। তারা বলত তোমরা কেউ আন্দামানে যাবে না। রঞ্জু বলল, কিন্তু সেখানে এখন কী ব্যবস্থা রেখেছেন উদ্বাস্তুদের জন্য। শুধু দ্বীপের ভেতর ছেড়ে দিলেই তো পুনর্বাসন হল না।

আমাদের স্কিম রয়েছে নতুন নতুন গ্রাম গড়ে তোলার। আগে মানুষজন যাবে তারপরই তো প্রয়োজনীয় সব কিছু গড়ে উঠবে। প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হবে হয়তো। নতুন বাড়ি করে কোথাও উঠে গেলে সেখানেও তো কষ্ট হয়। আমেরিকায় গিয়ে যারা প্রথম বন কেটে বসত করে তাদেরও কম কষ্ট ছিল! কিন্তু আজকের আমেরিকাকে দেখে কি মনে হয় সেদিনের কথা?

রঞ্জনের মন যেন অনেকখানি নাড়া দিল। সে বলল, আমি আমার লোকজনের সঙ্গে কথা না বলে আপনাকে কোনও কথা দিতে পারছি না। সবচেয়ে ভালো হয় আমাকে যা বললেন তা ক্যাম্পের সবাইকে আপনারাই বলুন। হারাধনবাবু বললেন, ঠিক আছে। আমরা আজ রাতটা গেস্ট হাউসে আছি। আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেটরকে বলছি সন্ধ্যাব সময় একটা মিটিঙের ব্যবস্থা করতে। সেখানে যার যা প্রশ্ন আমাদের করতে পারো। কিন্তু একটা সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। কারণ আমাদের এখন পর পর বিভিন্ন ক্যাম্পে যাবার প্রোগ্রাম আছে। একটা ক্যাম্পে বারবার আসা সম্ভব হবে না।

রঞ্জন গিয়ে প্রথমে বলল ভবেশকে। ভবেশ বলল, আমি তো তোমারে ইয়া দিছি রঞ্জন। তুমি যা করবা তাতেই আমার সায় আছে। ক্যাম্পের জীবন আর ভালো লাগে না। আজ একটা বছর এভাবে ভেসে বেড়াচ্ছি। বিধুভূষণ, নটবরেরও সেই মত। কিন্তু শিবকৃষ্ণ ঘরামি বেঁকে বসল।

শিবকৃষ্ণ বলল, বাঁকুড়ায় আমাদের দোকানে এক বাবু আইছিলেন। কেষ্টবাবু না কি নাম। নেকাপড়া জানা ভদ্রলোক। আমারে বলে খবরদার, আন্দামান যাবা না। সরকারের মতিগতি ভালো নয়। জাহাজে করে নিয়ে যায়ে মাঝ দরিয়ায় ডুবোয়ে দেবে।

রঞ্জন বলল, এসব কথার কোনও মানে হয় না।

ভবেশ বলল, ডুবোয়ে দেবে তা দিক। আমরা তো ডুবেই আছি। না হয় ভালো করে ডোবব।

রঞ্জন বলল, কিন্তু সরকারের কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে রিফুজিদের মেরে ফেলার? ক্যাম্পের মধ্যে সলিল পোদ্দার বলে আর একজন যুবক ছিল। রঞ্জনকে সে মোটেই পছন্দ করে না। সলিল মাঝে মাঝেই কলকাতা যায়। কিছুদিন আগে

পুনর্বাসনের দাবিতে কলকাতায় উদ্বাস্তুদের যে বড় মিছিল হয়ে গেল সলিল সেখানে দশ-বারোজনকে নিয়ে গিয়েছিল।

সলিল বলল, উদ্দেশ্য স্পষ্ট। সরকার উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধান করতে পারতেছে না। কয়েক হাজার উদ্বাস্তুরে মারে ফেললে সমস্যার আপনা-আপনি সমাধান হয়ে যায়। তার ওপর আপনারা ক-জন আন্দামানের ম্যাপ দেখছেন জানি না। আমি দেখছি। ইন্ডিয়ার ম্যাপের তলায় দুই তিনটা খালি ফোঁটার মতো দ্যাখা যায়। এত ছোট যে ম্যাপেও থাকে না। তাহলে একবার চিন্তা করেন, যদি বড় রকমের ছাইকোলোন বা ঝড় ঝাপটা হয় তাহলে ওই দ্বীপ উড়োয়ে নিয়ে সমুদ্দুরের গভ্যে না ফেলে তো কী বলেছি?

সবাই তার কথা শুনে হাতাতালি দিয়ে উঠল। কিন্তু রঞ্জনের মাথায় ততক্ষণে জেদ চেপে গেছে। সে বলল, সলিলদা, তুমি যুক্তিতে এসো। আন্দামান সৃষ্টি তো আজ হয় নাই। হাজার হাজার বছর ধরে ওই দ্বীপ আছে। এর মধ্যে কত ঝড় হয়ে গেছে। তাতেও যদি দ্বীপ না ডুবে থাকে, তাহলে আগামী দিনে ডুববে বলে মনে হয় না।

এমন সময় জিপ এসে থামল। হারাধনবাবু ও বিকাশবাবু। মি. আনন্দ আসেননি। তিনি জরুরি খবর পেয়ে কলকাতা চলে গেছেন। সেখানে কতগুলি স্কিম নিয়ে আলোচনা হবে রাজ্য সরকারের অফিসারদের সঙ্গে।

প্রায় তিনঘণ্টা ধরে আন্দামান সম্পর্কে বোঝালেন হারাধনবাবু। প্রত্যেকের প্রশ্নের উত্তর দিলেন। রাত প্রায় দশটা বাজে। তাদের জীবনমরণ সমস্যা নিয়ে আলোচনা। মেয়েরাও এসে পেছনে ঘোমটা টেনে বসে গেছে। হারাধনবাবু বললেন, এবার আপনারা বলুন। যদি আপনারা রাজি থাকেন তাহলে কাল থেকেই নামের লিস্ট করতে শুরু করতে হবে। রঞ্জন এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করবে। তবে মনে রাখবেন আপনারা স্বেচ্ছায় যাচ্ছেন। কাউকে জোরজবরদস্তি করা হচ্ছে না।

ভবেশ বলল, আপনাদের কিন্তু আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। তা না হলে বিদেশ বিভুঁইয়ে আমাদের বল ভরসা কোথায়?

হারাধন রাহা হেসে বললেন, আমি তো আপনাদের সঙ্গে একই জাহাজে ফিরব বলে এসেছি। তবে জাহাজ ছাড়তে যদি দেরি থাকে আমি প্লেনে করে পোর্টব্লেয়ার যাব। আবার ফিরব, তবে আপনাদের সঙ্গেই যাব।

হারাধন আর বিলাস অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েই ফিরে গেলেন।

ওঁরা যাবার আগে রঞ্জনকে ডেকে বলে গেলেন, তোমার ওপর ভার দিয়ে গেলাম ভাই। রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুব খারাপ। আন্দামানে যাতে উদ্বাস্তুরা না যায় তার জন্য বিভিন্ন ক্যাম্পে সুপরিকল্পিতভাবে ক্যাম্পেন চলছে। কিন্তু যারা আজ নিজেদের স্বার্থে এর বিরোধিতা করছে তারা বাঙালির ক্ষতি করছে।

রঞ্জন বলল, দেখুন অন্য ক্যাম্প সম্পর্কে আমি আপনাকে কিছু বলতে পারি

না। তবে আমাদের ক্যাম্পের বেশিরভাগ লোক যাতে যায় তার ব্যবস্থা আমি করব।

হারাধনবাবুরা চলে গেলে নির্মল গায়েন তার জামাই নরেনকে বলল, জামাই কেমন চালাক দে গেল, দেখলে?

সলিল বলল, ওদের কথা বিশ্বাস কোরো না খুড়ো। আন্দামানে গেলি মারা পড়বা।

নরেন বলল, তোমার কি মাথা খারাপ? আমরা কি মরতি আইছি নাকি? বলে গেল, এক কান দিয়ে শোনলাম আর এক কান দে বার করি দিলাম। আন্দামানে যায় কিডা। মরতি হয় এখানে মরব।

সলিল বলল, ডোল বৃদ্ধির আন্দোলনে আমরা রেল আটক করব ঠিক করছি। ট্রেনের চাকা চলতি দেব না। আমাদের দাবি, বাংলার মধ্যি অর্থনৈতিক পুনর্বাসন চাই। যতদিন না পুনর্বাসন হয় ক্যাম্প উঠোনো চলবে না নে। ডোল বাড়াতি হবে। আমাদের লড়াই বাঁচার লড়াই।

নরেন বলল, রঞ্জুটা হঠাৎ পালটি খেয়ে গেল। এখন দেখি উলটো বলে।

সলিল বলল, মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করিল না! সেই থেকে পালটি খেয়ে গেছে। টাকাপয়সায় কি না হয়।

সব সুদ্ধু সাত আটশো পরিবার আন্দামানে যেতে নাম লেখাল। গোটা পঞ্চাশেক পরিবার রাজি হল না। সলিল তাদের বুঝিয়েছে দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দেবে। অ্যাডমিনিস্ট্রেটর তালিকাটি কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন।

ক্যাম্পে ঘটা করে কালীপুজো হল এবার। ভবেশ তার দুই ছেলের জন্য বাজি কিনে এনেছে। বিমলকে কাছে ডাকল ভবেশ। বিমল এল। ভবেশ তার দিকে বাজিগুলো এগিয়ে দিতেই সে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ভবেশ ছেলেকে কছে টেনে নিয়ে বলল, তোরে সেদিন খুব বকাবকি করছি। বড় হইছ, বোঝোনা ক্যান। এহন তো আর দ্যাশের বাড়িতে বইয়া নাই। টাহা পয়সা যা আছিল সবই তো খরচা হয়ে গ্যাছে গিয়া। ডোলের টাকায় দিন গুজরান করি। কামকাজও ধরতে পারি নাই।

বিমল বলল, আমি তো কাম করতে গিছালাম। তোমরাই তো আমায় কাম করতে দাও না।

ওরে দেশ ছাইড়া আইছি বইল্যা তুইও কি বলদ হইয়া যাইবি নাকি? তোরে তোর ভাইডারে ল্যাখ্যা পড়া শেখাইব। কত সাধ ছিল আমার। তুই তো আর পড়াশোনা করস না।

রাতের বেলা ইস্কুল তো রোজ বসেই না। যেদিন হয় সেদিন তো যাই।

আন্দামানে যাইয়া তোরে কিন্তু পড়াশোনা করতে হবে। চাষ বাস যা করার আমি আর তোর কাকা করব।

ভবেশ ছেলেকে বোঝায় অনেক করে। বিমল খুশি মনে বাজি নিয়ে চলে যায়।

দুমদাম পটকা ফাটছে। প্যান্ডেলে মাইকে গান বাজছে। ভবেশের মনে পড়ে

যাচ্ছে গত বছর ক্যাম্পে কালীপুজো হয়নি। তার আগের বছর দেশে কালীতলায় প্রতিবারের মতো পুজো হয়েছে। পাকিস্তান হবার পর অবশ্য পুজোর সংখ্যা কমে গেছে। ধুমধামও কমে গেছে। জোরে ঢাক বাজানো নিষিদ্ধ। এমনকী দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রা নিয়ে পরপর দুবছর গণ্ডগোল হওয়ায় শেষের দিকে শোভাযাত্রাও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবু কালীপুজোটা নিষ্ঠার সঙ্গে হত। পাঁঠা বলি হত। প্রতি বাড়িতে মাটির প্রদীপ সাজিয়ে দীপাবলি করা হত।

হঠাৎ দেশের কথা মনে পড়তেই মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল ভবেশের। ইন্ডিয়ায় এসে পর্যন্ত একখানা মাত্র চিঠি পেয়েছে তপেশেব কাছ থেকে। তাও চিঠিটা এসেছে লোক মারফত। প্রায় দুমাস পরে। মেজোভাই লিখেছে, এবারে গাছের আম একটিও তারা খেতে পারেনি। মুসলমানেরা এসে জোর করে পেড়ে নিয়ে গেছে। গ্রামে এবার দুর্গাপুজো হবে না। তবে বরিশাল টাউনে যথারীতি পুজো হচ্ছে। মৌলবিসাহেব এসে বলেছেন তাঁকে যদি কিছু জমি বিক্রি করা হয় তাহলে তিনি ন্যায্য দাম দিয়েই কিনে নেবেন। ভবেশের অংশ থেকে পাঁচ বিঘের মতো জমি মৌলবি সাহেবকে বিক্রি করবে কিনা তা জানতে চেয়েছে মেজোভাই।

রমেশ ছিল না। তার বউ বলল, বোধ হয় প্যান্ডেলে। আপনে বসেন। আমি ডেকে পাঠাই।

রমেশের বউ তার ছেলেকে বলল, যা বাপকে ডেকে নিয়ে আয়। বল জ্যাঠায় ডাকে।

রমেশের বউ দেশে থাকতে ভাশুরের সঙ্গে কথা বলত না। এখন বলে। হিন্দুস্থানে এসে তার সেই সলজ্জ গ্রাম্য ভাবটা কেটে গেছে। সে বিষ্ণুপুরে এক বাবুর বাড়িতে কাজও নিয়েছে। সকালে এক ঘণ্টা। বিকেলে এক ঘণ্টা। মাসে ত্রিশ টাকা মাইনে। মাঝে মাঝে এটা সেটা খেতেও দেয়। দেশে থাকতে কারও চা-এর অভ্যাস ছিল না। এখন বাচ্চারাও চা খায় দুবেলা। এই এক বাড়তি খরচ।

রমেশ এল হন্তদন্ত হয়ে।

কী দাদা? কিছু খপর আছে?

ভবেশ বলল, রমেশ তোরে চুপি চুপি ডাকছি। একটা কথা কইবার লগে। আন্দামান যাওয়ার তারিখ ঠিক হইছে।

কবে? কে কইল?

রঞ্জুর সাথে দেখা হয়েছিল কিছুক্ষণ আগে। সে কইল। ডিসেম্বরের দুই তারিখে জাহাজ ছাড়ব। আমাদের আগামী রবিবার লইয়া যাবে কাশীপুর।

সে কোথায়?

কলকেতায়।

আবার কলকেতা?

কলকেতা না হইয়া যাবে কেমনে? কলকাতাতেই তো ডক। রমেশ, তুই আমার

ছোট ভাই। তোর সাথে তো আর ইদিক-ওদিক কোনও ব্যাপার নাই। তোরে একটা কথা কই। আমি ঠিক করছি আন্দামান যামু। আমি যামুই। বাঙ্গালের গোঁ যারে কয়। কিন্তু তোর ওপর জোর করব না। আমি মোট বইয়া, কাঠ কুড়াইয়া পানশো টাকা জমাইছি। এই টাহা তোরে দিচ্ছি। তুই যদি মনে করিঁস পশ্চিমবাংলায় থাকতে পারস। এই টাকায় একডা দোকান দেওন যায়। বাঁকুড়া-পুরুলিয়ায় যাইতে পারো। আন্দামান কালাপানি। একবার পার হলে আর ফেরা যায় না।

রমেশ বলল, এই কথার জন্য তুমি আমারে ডাকলে দাদা। তোমার কি মাথা টাথা খারাপ হইল নাকি? ফেরত যাব বইলা কি দেশ ছাড়ছি। তুমি যেহানে যাইবা, আমি সেহানে যাব। তা সে দ্বীপান্তর যদি হয় তাই, আমার দ্বীপান্তরই ভালো। তুমি যাওয়ার ব্যবস্থা করো দাদা।

ভবেশ রমেশের হাতটি একটু ধরে আবার ছাড়িয়ে নিল। তার খুব ন্যাওটা ছোটবেলা থেকে। তার ছোট ভাইটা অবশ্য চিরকালই ছাড়া ছাড়া। কিন্তু ছোটবেলা থেকে রমেশ তার খেলার সাথি, তার বন্ধু। আন্দামানের যাবার নাম শুনে সে মনে মনে খুবই নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করেনি। তবে সে চায়নি যদি তার কোনও বিপদ হয় তাহলে তার একা সিদ্ধান্তের জন্য রমেশও সেই বিপদের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু রমেশের কথায় সে আজ খুব ভরসা পেল। গর্বে বুকটা ভরে উঠল তার। পকেট থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বার করে সে রমেশকে দিয়ে বলল, আজ কালীপূজা তোর জন্য নিয়া আইলাম।

রমেশ ও ভবেশ দুজনেই বিড়ির খুব ভক্ত। কিন্তু দামি সিগারেট দেখে রমেশ মনে মনে খুব খুশি হল। সে বলল, তা বলে আমি একা খামু না। তুমিও ধরাও একটা।

তারপর দুজনে মউজ করে সিগারেট ধরালো দুটো।

অবশেষে প্রায় আট মাস দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর তাদের যাত্রা শুরু হল।

ভবেশের বউ গৌরীর মন বসে গিয়েছিল এই বাসুদেবপুরে। প্রায় দেড় বছরের মতো তারা কাটালো এখানে। রান্নার জায়গায় তৈরি করা উনুনটা ভেঙে ফেলবার সময় তার মনটা বেশ খারাপই লাগছিল। চরমুন্সি ছাড়ার সময় একটা ভয় ছিল। দেশত্যাগের দুঃখ তাই বড় করে বাজেনি। বাসুদেবপুর ছাড়ার সময় মনে হল কী দরকার ছিল, এখানে থেকে গেলেই হত। চার-পাঁচটি পরিবার ক্যাম্প ছেড়ে কোতুলপুরের দিকে গিয়ে জমি জায়গা কিনে বাস করছে। তারা ভালোই আছে সেখানে। তাদের অবশ্য জমি কেনার মতো অত টাকা নেই।

কিন্তু দুই ভাই গতরে খেটে কি কয়েক বছরের মধ্যেই বাঁকুড়াতেই একটা কিছু গড়ে তুলতে পারত না?

খুব বিষণ্ণ মনে গৌরী ছেলেদের নিয়ে আবার ট্রাকে চাপল।

বিমলের বেশ মজা লাগছিল এভাবে ভেসে বেড়াতে। মনে হচ্ছিল তারা কোন দেশ আবিষ্কারে চলেছে। এই পিচ-ঢালা পথটাই যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে সমুদ্র। আর সমুদ্র পেরুলেই ওপারটায় আন্দামান।

রঞ্জু এসে তদারক করছিল সকাল থেকে। এতগুলো পরিবার যাবে। এক সঙ্গে যাওয়া সম্ভব নয়। দশটি ট্রাক যাবে। কাশীপুরে সবাইকে ছেড়ে ট্রাকগুলি ফিরবে। কারা কখন যাবে তার তালিকা তৈরি হয়েছে।

রঞ্জুর মা চারুবালা ভবেশদের সঙ্গে যাচ্ছে। রঞ্জু আসবে সবার শেষে। চারুবালার চেহারা এখানে এসে অনেক ভালো হয়েছে। এমনিতে খুনখুনে চেহারা। দেহে কোথাও মেদ নেই। শুধু এতদিন ধরে মুখে যে বার্ধক্যের ছাপ ছিল সেটি কতটা বার্ধক্য কতটা অসহায়তা তা বোঝা যেত না। এখন তার অসহায় ভাবটা কেটে যেতেই সতেজ ভাবটা বেরিয়ে পড়েছে।

ভবেশ বলল, ও দিদি, তুমি টেরাকের ধকল সইতে পারবা তো। কেউ কেউ টেরেনে যাইতাছে শোনলাম। টেরেনে বা বাসে গেলে বোধহয় তোমার ভালো হইত।

চারু বলল, আইছিলাম তো টেরাকে করে। আমার কোনও অসুবিধে হবে না।

বিমল বলল, ও দিদিমা, জাহাজে যাবা জাহাজ যদি ডুইবা যায়? সাঁতার জানো?

চারু হেসে বলে, ছোটবেলায় তো জানতাম। ম্যাঘনায় ছাঁতার কাটছি কত? সমুদ্দুর ওই ম্যাঘনার মতোই হবে। এপার-ওপার দেহা যায় না। শুনছি ঢেউ খুব উঁচা উঁচা।

বিমল হেসে বললে, ও দিদিমা, সমুদ্দুরের সঙ্গে কি ম্যাঘনার তুলনা হয়। কিসে আর কিসে—

কাশীপুরে এসে ওরা দেখে বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে প্রায় সাত আটশো পরিবার এসে গেছে সেখানে। যেন মেলা বসে গেছে। এতদিন একরকম জীবনে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। কাশীপুরে এসে আবার শুরু হল ব্যারাকের জীবন। এখানে বিরাট বিরাট গোডাউন। সেখানে সারি সারি বিছানা পড়ল। দিনরাত কর্মব্যস্ততা। প্রতিদিন লরি-বোঝাই হয়ে বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে রিফিউজি আসছে। প্রত্যেকের নামে নামে স্লিপ ইস্যু হচ্ছে। তাতে কে কোন্ জাহাজে,কোন্ তারিখে জাহাজ ছাড়বে সব লেখা।

এস এস মহারাজা জাহাজে তাদের জায়গা নির্দিষ্ট হল। এর মধ্যে প্রত্যেককে দেওয়া হয়েছে নতুন জামাকাপড়, মেয়েদের জন্য এক জোড়া করে শাড়ি, দুটো করে পেতলের গেলাস-বাটি। পাঁচ কেজি করে গুড়-চিঁড়ে। ২০টা করে পাতিলেবু। আর পরিবারের সবার জন্য বিছানা। রঞ্জু এসে পড়েছে এর মধ্যে। রঞ্জু এসে তদারক করছে। কারও কিছু কমপ্লেন থাকে তো এই বেলা বলো। তারপর দেওয়া হল কলেরা আর বসন্তের টিকা।

ইনজেকশন নেবার পর অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ল। ভবেশেরও জ্বর এসে গেল। হাতে টনটনে ব্যথা। মেয়েরা অনেকে যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগল।

এর মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়ল আরও দুজন। একজন সীতানাথ মণ্ডলের স্ত্রী।

সীতানাথের বাড়ি খুলনা জেলায়। সে ছিল মেদিনীপুর ক্যাম্পে। ভবেশদের আসার কয়েকদিন আগে তারা এসেছিল কাশীপুর ক্যাম্পে। কিন্তু ইনজেকশন নেবার একদিনের মধ্যে সীতানাথের স্ত্রী শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল। প্রথমে জ্বর। তার ওপর বমি পায়খানা। মেডিক্যাল থেকে ডাক্তার এসে ওষুধ দিয়ে গেল।

ভবেশের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে সীতানাথের। সীতানাথ বলল, কী করি বলেন তো দাদা। এই জাহাজে না গিয়া কি পরের কোনও জাহাজে যাওয়া যায়?

ভবেশ বলল, তা তো বলতে পারব না। তবে রাহাবাবুরে বলে দ্যাহেন না।

হারাধন রাহা এলেন জাহাজ ছাড়ার দুদিন আগে। সবাই তাঁকে দেখে মনে বল পেল যেন।

এ বলে 'রাহাবাবু, আপনি কোয়ানে ছিলেন?' আর একজন বলে, 'রাহাবাবু, আপনারে দেখে তবু গায়ে বল এল।'

হাসিখুশি মানুষ হারাধন রাহা। এর মধ্যে অনেকের নাম মুখস্থ হয়ে গেছে তাঁর। ভবেশের কাছে এসে বলল, কী খবর ভবেশ? ভালো আছ তো সব? সুঁই নিয়েছ সবাই?

হ্যাঁ বাবু সুঁই নে হাত নাড়তে পারতেছি না।

একদিন দুদিন ব্যথা থাকবে, তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে।

বাবু আপনেরে একটা কথা জিগাই। আমাগোর সঙ্গে যায় সীতানাথ মণ্ডল করে এক লোক। তার ইস্তিরির খুব জ্বর আর পায়খানা। তারে যদি আপনি পরের কোনও জাহাজে পাঠান।

রাহাবাবু বললেন, শিডিউল বদলানো আর সম্ভব নয় ভবেশ। প্রত্যেককে ডোল দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যতজন প্যাসেঞ্জার ধরবে সেই অনুসারে বুকিং করা। এখন সেটা পালটানো যাবে না। অসুস্থ হলেও কোনও ভয় নেই। জাহাজে আমাদের ডাক্তার যাচ্ছে। এমন কী জাহাজের ভেতরেও একটা হাসপাতাল আছে।

জাহাজের ভেতরেও হাসপাতাল? কন কি?

হ্যাঁ। একী আর তোমার বরিশাল-খুলনার ইস্টিমার। এ হল জাহাজ। তিন-চার তলা একটা বাড়ি। উঠে দেখবে ভীষণ মজা পাবে।

সীতানাথকে এসে এই কথা জানাল ভবেশ। সীতানাথ বেশ মুশকিলে পড়েছে। তার মেয়েটির বয়স মাত্র দেড় বছর। স্ত্রী মাথা তুলতে পারছে না। বাচ্চাটাকে কোলে করে সে ঘুরছে এখানে ওখানে।

ভবেশ বোঝাল, রাহাবাবু কইলেন, ভয়ের কিছু নাই। মনে করেন জাহাজডা একটা হাসপাতাল। সমুদ্দুরের হাওয়ায় দ্যাখবেন আপনার বউ ঠিক ভালো হয়ে উঠবে।

বিমল বেশ এই যাত্রাটা উপভোগ করছিল। বিশেষ করে তাদের ট্রাক ডকে ঢুকতেই সে অবাক হয়ে গেল। গঙ্গানদী সে এই প্রথম দেখল। ওই তো দেখা

যাচ্ছে হাওড়ার পুল। গঙ্গার ঘাটে সারি সারি ভেড়ানো রয়েছে জাহাজ। জাহাজ তো নয় এক-একটি বাড়ি। তাদের জাহাজ সামনেই দাঁড়ানো। লেখা এস এস মহারাজা।

স্লিপ দেখিয়ে জাহাজ উঠতে হল। হারাধনবাবু এখানেও দাঁড়িয়ে তদারক করছেন। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। আপনাদের সবাইকে না নিয়ে জাহাজ ছাড়বে না। সমস্ত যাত্রীদের তুলতে প্রায় তিন-চার ঘন্টা লেগে গেল।

জাহাজের ভেতরটা এর মধ্যেই ঘুরে দেখে এসেছে বিমল। শুধু সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে সাহস হল না। ওপরে কেবিন আছে। তার ওপরে জাহাজ চালাবার কেবিন। সাদা জামা-প্যান্ট আর ক্যাপ করা অনেক লোক ঘোরাঘুরি করছে। সবাই বলাবলি করল ইনি হচ্ছেন কাপ্তেন, ইনি চিফ ইঞ্জিনিয়র। ইনি ডাক্তার। জাহাজের যিনি ডাক্তার তাঁর ব্যস্ততা সবচেয়ে বেশি। কয়েকজন অসুস্থ রোগীকে স্ট্রেচারে করে তুলতে হচ্ছে। তার মধ্যে সীতানাথের বউও আছে। আর একজন নটবর মিস্ত্রির বাবা ঘনশ্যাম আজ ক'দিন চুপচাপ শুয়ে আছে। কিছু খাচ্ছে না। কিছু খাবে কিনা জিজ্ঞাসা করলে বলছে, 'ক্ষুধা নাই।'

জাহাজের ভেতর মাইক লাগানো আছে। তাতে মাঝে মাঝেই ঘোষণা হচ্ছে। আপনাদের খাবার জন্য স্লিপ দেওয়া হবে। তা বাদে চেক করা হবে। যদি এমন কেউ উঠে পড়েন যিনি আমাদের তালিকাভুক্ত যাত্রী নন, তাহলে দয়া করে নেমে যাবেন।'

একটা বিরাটা ভোঁ দিয়ে জাহাজ ছাড়ল। প্রথমে কয়েকজন লোক এসে তার সিঁড়িটা খুলে নিল। তারপর মোটা মোটা কাছিগুলো খুলে দিল। খুব আস্তে আস্তে জাহাজ এগুতে লাগল। জাহাজঘাটায় অনেক লোক এসে জড় হয়েছিল। তারা কে তা কে জানে। তারা হাত নাড়তে লাগল। বিমলও তাদের উদ্দেশে হাত নাড়ল।

হঠাৎ সেই অপস্রিয়মাণ জাহাজের ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে বিমলের মনে হতে লাগল সে যেন কলকাতায় কোনও প্রিয় জিনিস হারিয়ে ফেলে যাচ্ছে। কি সে জিনিস অনেকক্ষণ ধরে ভেবে ভেবেও সে ঠিক মনে করতে পারল না।

অনেকক্ষণ ধরে ভাবার পর মনে পড়ল তার। একটি শ্যামলা রঙের মেয়ে। নাম তার ময়না। যার সঙ্গে সে খুলনা থেকে শিয়ালদা পর্যন্ত অতটা পথ এসেছিল। যার সঙ্গে তার প্রথম ট্রেনে দেখা।

সেই মেয়েটি এই ইঁট-কাঠের জনারণ্যে, এই বিশাল পাষাণপুরীর আড়ালে কোথায় হারিয়ে গেল। কোথায় বেহালা, কোথায় শখেরবাজার সে জানে না। কিন্তু সে যখনই কলকাতায় আবার এসেছিল তখনই সে চলন্ত ট্রাকের ওপর থেকে, জাহাজ-ঘাটায় ভিড়ের মধ্য থেকে একটি মুখকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করছিল বারবার।

কিন্তু তার নিষ্পাপ সরল গ্রামের মাটি-মাখানো মন তখনও বুঝতে শেখেনি যা পিছনে হারিয়ে যায় তাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার নামই জীবন।

দেখতে দেখতে কলকাতা শহরের বাড়িঘর পিছনে সরিয়ে দিয়ে গ্রামের রেখা ফুটে উঠল। মাঝে মাঝে বাড়ি দেখা যায়। কিন্তু তার পাশে গঙ্গার তীর ঘেঁসে আম, জাম, কাঁঠাল, নারকেল বাগান। সন্ধ্যার অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে দুপাশের সবুজের ওপর আলো-আঁধারির একটি মসৃণ পর্দাকে মেলে দিল যেন। আকাশে মেঘ নেই। পশ্চিমের আকাশ সূর্যাস্তের পর অনেকক্ষণ লাল হয়েছিল। শেষ আলো মুছে যাবার আগে পাখিরা দ্রুত ডানা মেলে বাসায় ফিরছিল। ঠিক যেমন করে স্কুলে দেরি হয়ে গেলে তারা ছুট লাগাত, ঠিক তেমনি।

কখন রঞ্জু যে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে খেয়াল নেই তার।

তার পিঠে হাত দিতেই চমকে ফিরে তাকিয়ে দেখে রঞ্জু।

তুই এখানে? আমি তোকে খুঁজছি।

বলো রঞ্জুদা।

আটটার সময় রাতের খাবার দেওয়া হবে। রাহাবাবু বলে দিয়েছেন, পরিবেশনের সময় আমাদের ক-জনকে সাহায্য করতে হবে। এত লোককে সামলানো......

তুমি যা করতে বলবা করব।

আচ্ছা রঞ্জুদা আমরা কবে পৌঁছামু?

চারদিন লাগবে। জানিস বিমল, রাহাবাবু বলেন আমরাই ডিগলিপুরের ফার্স্ট ব্যাচ। সেদিক থেকে ডিগলিপুরের ইতিহাস যদি কোনওদিন লেখা হয় আমাদের কথা সেখানে লেখা থাকবে।

আমার কথাও লেখা থাকবে?

সবার কথা। আমাদের প্রত্যেকের নামই তো রয়েছে না। আজ যেটাকে ভাবছিস একটা মামুলি কাগজ কাল সেটাই ইতিহাস। একদিন আমাদের কথা কেউ লিখবে।

বিমল বলে, ইতিহাস বই ইস্কুলে পড়সি। সে তো রাজাদের কথা ল্যাখা থাকে। আকবর বাদশা—সম্রাট অশোক।

রঞ্জু হেসে বলে : সাধারণ মানুষেরও ইতিহাস হয় পাগল। সে সব বই আলাদা।

একটু থেমে রঞ্জু বলল, তোর কি ভয় করছে?

বিমল বলল, তা একটু করে। সমুদ্দুর তো কখনও দেখি নাই। যদি তুফান ওঠে..... .

রঞ্জু বলে, দূর পাগল। এই যে মহারাজা জাহাজ দেখছিস এর মাল বইবার ক্ষমতা কত জানিস? তিন হাজার মেট্রিক টন। একি লঞ্চ না ইস্টিমার যে ডুবে যাবে? আর ডুবে গেলেও লাইফ বোট আছে না? ওই যে ওপরে দেখছিস ছোট ছোট নৌকো। জাহাজ ডুবে গেলে ওই নৌকো নামিয়ে দেওয়া হয়। ওই নৌকো ডোবে না। ওরই একটাতে বসে থাকবি। কোনও বড় জাহাজ এসে তোকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে।

দৃশ্যটা কল্পনা করে মনে মনে বেশ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে বিমল।

সে আবার জিজ্ঞাসা করল আমরা ডিগলিপুর না কোথায় যাচ্ছি কইলে, তাহলে আন্দামান না?

রঞ্জু বলল, দূর পাগল। আন্দামান তো সব দ্বীপগুলোর নাম। দুটো বড় দ্বীপ আর আশেপাশে অনেক ছোট ছোট দ্বীপ নিয়ে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় দ্বীপ আন্দামান। আর একটা বড় দ্বীপ নিকোবর। ডিগলিপুর উত্তর আন্দামানেরই একটি দ্বীপ। রাহাবাবু আমাকে ম্যাপ দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ডিগলিপুরে এখন জঙ্গল। আমরাই গিয়ে সেখানে বসত করব। তবে এতসব কথা রাহাবাবু কাউকে বলতে বারণ করে দিয়েছেন। তাহলে ভয় পেয়ে যাবে লোকে।

এহন আর ভয় পালে কী হইব। আর তো ফেরার উপায় নাই এহন।

তবু রাহাবাবু বলেছেন, উদ্বাস্তুদের মর‍্যাল সব সময় হাই রাখতে হবে। মর‍্যাল মানে বোঝো। মনের জোর। মনের জোরটাই হল মানুষের আসল জোর বিমল। রাহাবাবু বলেন, প্রথম দিকে যারা নতুন কিছু করে তাদের ভীষণ মনের জোর লাগে। কলম্বাস, ভাস্কো দা গামা এদের নাম শুনেছ? যাঁরা নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁদের কী ভীষণ মনের জোর ছিল বলো তো। তাঁদের অনুসরণ করে তারপরে কত লোক আসে। রাহাবাবু বলেন, আজ আন্দামানে লোক যেতে চাইছে না, একদিন সারা ভারতবর্ষ থেকে আন্দামানে আসার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে।

এমন সময় হাফপ্যান্ট পরা গেঞ্জি গায়ে একটি লোক এসে বলল, রঞ্জুবাবু আপনার নাম?

রঞ্জু বলল, হ্যাঁ।

আপনাকে চক্রবর্তীবাবু তাঁর কেবিনে ডাকছেন। আমার সঙ্গে আসুন।

রঞ্জু চলে গেল। যাবার সময় বিমলকে বলে গেল, ঠান্ডা লাগাস না। একটা চাদর টাদর গায়ে দিয়ে আয়।

চক্রবর্তী মানে বিকাশ চক্রবর্তী।

সে তার তিনতলার কেবিনে আন্দামানের ম্যাপ নিয়ে বসেছিল। বিকাশ আন্দামান প্রশাসনের চাকরিতে জয়েন করেছে মাত্র এক বছর। হারাধন রাহা মানে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারের অফিসেই সে চাকরি করে।

এই এক বছরে তাকে পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু শিবিরগুলিতে বার দুয়েক আসতে হয়েছে। এতে তার সুবিধাও হয়েছে। প্রতিবারই মাসখানেক করে বাড়িতে থাকতে পেরেছে। বাড়ি থেকেই নানা ক্যাম্পে ঘুরেছে সে। তবে তবে এই প্রথম উদ্বাস্তু নিয়ে যাচ্ছে সে।

তিনতলা জাহাজ। নীচের তলা আর দোতলায় পাটাতন ও বেঞ্চ জুড়ে যাত্রীদের অস্থায়ী সংসার। তিনতলাটা অফিসার আর জাহাজ কর্মীদের জন্য। সেখানে সারি সারি কেবিন। তার একটা বিকাশের।

আমারে ডেকেছিলেন স্যার।

বিকাশ তাকে কেবিনের নীচের বাঙ্কে বসতে বলল।

কেমন লাগছে?

আমার তো খুবই ভালো লাগছে স্যার।

আর তোমার লোকজনদের?

ওরা একটু ভয়ে ভয়ে আছে, কেউ তো জাহাজে চড়েনি এর আগে। সমুদ্দুর দেখেনি। আমরা কবে পৌছোব?

সমুদ্রে পড়লাম আরও তিনদিন লাগবে। জিরো চ্যানেল বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে খুব ঢেউ। অনেকেরই সি-সিকনেস হয়।

তার মানে?

মানে সামুদ্রিকপীড়া যাকে বলে। বমি পায়-মাথা ঘোরে। প্রথমবার আমি তো খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। এখন অবশ্য সহ্য হয়ে গেছে।

তাহলে কী হবে স্যার?

ওদের কিছু বলার দরকার নেই। আমাদের কাছে অ্যাভোমিন ট্যাবলেট আছে। তুমি একটা বাকশো নিয়ে যাও। যদি কেউ বমিটমি করে সবাইকে একটা করে খাইয়ে দিয়ো। কী পারবে তো?

রঞ্জু বলে হ্যাঁ স্যার পারব।

ভেরি গুড। আচ্ছা রঞ্জু তুমি পরিষ্কার কলকাতার ভাষা শিখলে কী করে? অথচ ওদের সঙ্গে বাঙাল ভাষা বলো।

রঞ্জু হেসে বলল : খুব ছোটবেলা থেকে আমি কলকাতায় ছিলাম স্যার। কলকাতার ইস্কুলে ক্লাশ এইট পর্যন্ত পড়েছি। তারপর আবার পাকিস্তান চলে যাই।

এই বলে রঞ্জু তার জীবনের কথা বিলাসকে শোনাল।

বিকাশ বলল : খুব রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা তোমার। আমি এখানে জয়েন করার আগে একটি সাপ্তাহিক কাগজে কাজ করতাম। সে সময় তোমার সঙ্গে দেখা হলে ওই কাগজে তোমার গল্প ছাপতাম। আমি তোমাকে জ্ঞান দিচ্ছি বলে মনে কোরো না। তুমি বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট। তুমি এইট পর্যন্ত পড়েছ। কিন্তু ওখানে থেমে থেকো না।

আমার পড়াশোনার খুব ইচ্ছা ছিল স্যার। কিন্তু সবই তো শুনলেন। এখন তো ভেসে চলেছি, কোথায় গিয়ে ঠেকব তা কে জানে।

ভেসে চলাব একটা মস্ত বড় সুবিধা। স্রোতই তাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাকে শুধু ভেসে থাকতে জানতে হয়। চেষ্টা করতে হয় প্রাণপণে যাতে সে তলিয়ে নিয়ে না যায়। তোমার মধ্যে সম্ভাবনা আছে রঞ্জু। তাকে বাঁচিয়ে রাখা তোমারই দায়িত্ব।

রঞ্জু অবাক হয়ে এই সৌম্যদর্শন যুবকের কথা শোনে। সামনের ম্যাপটি আঙুল

দিয়ে দেখিয়ে দেয় বিকাশ—এই দ্যাখো আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ—বিন্দুগুলি এক একটা দ্বীপ। তবে সব দ্বীপ আবার ম্যাপেও নেই। আন্দামানেই দ্বীপ আছে ২৫৭টি, কার নিকোবরে ২৪৮টি। এর মধ্যে মাত্র ৪০টি দ্বীপে মানুষ বাস করে।

আর বাকিগুলা? এখনও জঙ্গলে ভরা। কোথাও আছে আগ্নেয়গিরি। কখন যে আগ্নেয়গিরি জেগে উঠবে তা কেউ জানে না। তাই ওই সব দ্বীপে কেউ বাস করে না। কোনো দ্বীপে হয়তো মিষ্টি জলের উৎস নেই। আবার সব থেকেও অনেক দ্বীপে লোকাভাবে বসতি গড়ে ওঠেনি। এতদিন তো আন্দামানের মানুষ বলতে ছিল নির্বাসিত কয়েদিদের বংশধররা আর কিছু দ্বীপে আদিবাসীরা। ছ-ধরনের আদিবাসী কত কাল ধরে এখানে আছে কেউ জানে না। নিকোবরি, শ্যাম্পেন, ওঙ্গি, সেন্টিনালিজ, গ্রেট আন্দামানিজ আর জাড়োয়া। জাড়োয়ারা নাকি মানুষ মারে? দ্যাখো, সেই কবে হাজার হাজার বছর ধরে ওদের পিতৃভূমি সেন্টিন্যাল দ্বীপে ওরা বাস করে আসছে। এটা ওদের দ্বীপ। ওরা ওদের মতো করে আছে। ওরা উলঙ্গ থাকে। ওদের মতো খায় দায়। ওদের মতো সমাজজীবন যাপন করে। আমরা এসে ওদের বিরক্ত করি। ওদের হ্যাবিটাট নষ্ট করে ওদের রাজ্যের ভেতর দিয়ে রাস্তা তৈরি করছি। ওরা পছন্দ করছে না। বিষাক্ত তীর দিয়ে ওরা তাই প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে।

কেন আমরা এমন করছি? রঞ্জু বলে। এই যে আমাদের এইভাবে নিয়ে যাচ্ছেন সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এক নতুন দেশে তারও কী দরকার ছিল স্যার?

বিলাস গম্ভীর হয়ে বলে : সভ্যতা তো এইভাবেই এগিয়েছে রঞ্জু। একদিন এদেশে আর্যরা এসেছিল এমনভাবেই। সব দেশেই কোনো না কোনো আধিবাসী ছিল। কিন্তু আর একদিন মানুষ কোনো না কোনো জঙ্গল কেটে আদিবাসীদের হটিয়ে, পশুপাখিদের বধ করে তবেই না সভ্যতা বিস্তার করেছে। মানুষের ধর্মই যুগে যুগে অভিবাসী হওয়া। এক জায়গায় তাড়া খেয়ে আর এক জায়গায় ঘর বাঁধবার জন্য ছুটে গেছে মানুষ। শক, হূন, পাঠান, মোগল সবাই এইভাবে এসেছে? তবে এক দেহে লীন হওয়াটাই বড় কথা। তা-কি হতে পেরেছে কেউ? না হওয়া যায়। তার চেয়ে সবাই সবার মতো করে থাকুক। আপনা থেকে যে অন্যের থেকে যতটুকু পারে নিক। জোর করে নয়।

আন্দামানেও আমরা চাইছি জনজাতিরা যতটা পারে তাদের মতো করে থাকুক। আমেরিকায় শ্বেতাঙ্গরা যে সংঘর্ষের নীতি নিয়েছিল আমরা তার মধ্যে যেতে চাই না।

আর তোমরা তো ডিগলিপুরে কাউকে হটিয়ে থাকতে যাচ্ছ না। সেখানে তোমরাই তো আদিম মানুষ। মৃত্তিকার সন্তান। তোমরা সেখানে না গেলে অন্য রাজ্যের মানুষেরা আসবে। ইতিমধ্যেই গ্রেট নিকোবরের ইন্দিরা পয়েন্টকে পাঞ্জাবিদের দিয়ে সেটল করার কথা ভাবা হচ্ছে। দক্ষিণ ভারত থেকে দলে দলে লোক আসছে।

আমরা খুব দুঃখ হয় বাঙালি একটা বড় সুযোগ হারাল। আন্দামানে বৃহত্তর বঙ্গ গড়ে তোলার সুযোগ। একবার ভেবে দ্যাখো তো আর্যরা কতদূর থেকে পাঞ্জাবে ঢুকেছিল। সেই মধ্য এশিয়া। আর কত যুদ্ধ করতে হয়েছিল তাদের জমির অধিকার পাবার জন্য। তোমরাও তো বরিশালে একটা চরের দখল নেবার জন্য লাশ ফেলে দাওনি? আর কত সহজে তোমরা একটা গোটা দ্বীপের মালিক হতে চলেছ।

ঢেউয়ের দোলায় দুলতে দুলতে জাহাজ এগিয়ে চলে। চলছে তো চলছেই। অনেক সময় চলছে কিনা বোঝাই যায় না। বিকাশ বলেছিল, কোথায় মধ্য এশিয়া থেকে পশ্চিমভারত—আর্যদের সেই মহাযাত্রা চলেছিল মাসের পর মাস ধরে। সিন্ধু নদীর উর্বর তীর ভূমিকে লক্ষ্য করে। সে তুলনায় হুগলির মোহনা থেকে পোর্টব্লেয়ারের দূরত্ব তো মাত্র ১২৫৫ কিলোমিটার। পোর্টব্লেয়ার থেকে ডিগলিপুর।

সাগর দ্বীপের কাছে সারারাত জাহাজটি দাঁড়িয়ে থাকার পর ভোরবেলা আবার চলতে শুরু করল। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিমল ঘুম থেকে উঠে তাড়াতাড়ি ডেকে এসে দেখে চারিদিকে জল আর জল। আর তীর দেখা যাচ্ছে না।

এরই নাম সমুদ্র। সে বইতে পড়েছে পৃথিবীর তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল। তিন ভাগই তাহলে এমন সমুদ্র।

কী ভাবে এমন সমুদ্রের মধ্যে পথ দেখে যায় জাহাজ সেটাই এক আশ্চর্য।

জাহাজে সকালের জলখাবারের ঘণ্টা পড়ল। গতকাল রাতে ভাত, ডাল, মাছের ঝোল ছিল। আজ সকালে পাওয়া গেল চা-পাঁউরুটি।

ভবেশের মা বলল, আমি চা-এর জন্য লাইনে দাঁড়ামু না। ও বিমল, আমার চা-টা তুই নিয়া আয়। প্রত্যেকের জন্য খাবার কুপন ছিল। খাবার কুপন দিয়ে মায়ের চা-টা সাবধানে নিয়ে আসছিল বিমল। কিন্তু জাহাজ বেশ দুলছে। একবার একটুখানি চা ছলকে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি একটা দেওয়াল ধরে ফেলল বিমল। উলটো দিক থেকে হন্তদন্ত হয়ে জোরে জোরে এগিয়ে আসছিল নটবর মিস্ত্রি। তার হাতে একটি অ্যালুমিনিয়ামের মগ।

বিমল বলল, ও জ্যাঠা টিফিন নিতে যাচ্ছ?

নটবর বলল, হ্যাঁ। বাবা তো জাহাজে উঠিয়া ইস্তক কিছু খায় নাই। অহন চা খাবার ইচ্ছা হইছে। এটা কার চা?

মায়ের। তুমি আমার চা-টা নিয়া তোমার কুপনটা আমারে দাও। আমি মা-র চা টা লইয়া আসি।

তাই করল নটবর মিস্ত্রি। তাড়াতাড়ি মা-কে চা ও রুটি পৌঁছে দিয়ে নটবরকে সঙ্গে করে ঘনশ্যামের কাছে গেল বিমল। নটবরদের সিট পড়েছে জাহাজের উত্তর দিকটায়। মেঝের ওপর শতরঞ্চি পাতা। ঘনশ্যাম মিস্ত্রি শুয়ে আছে। চোখ বোজা।

নটবর বলল, আমি চা দেছলাম। এক ঢোক মাত্র খাইয়া বলল আর খাব না।

আচ্ছা আমি দেখি, কোনও কথা কয় কিনা?

না, ডাকে সাড়া দেয় না।

বিমল ডাকল, ও দাদু।

বুকের ভেতর থেকে ঘড় ঘড় আওয়া বেরুল একটা।

বিমল আবার ডাকল—ও দাদু?

এবার খুব ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর এল—কেডা?

আমি বিমল।

কোন বিমল?

ভবেশ মণ্ডলের পোলা।

অ।

ও দাদু, কিছু খাইবা?

না, খুদা নাই।

চা খাইবা না?

খাইছি।

এক ঢোক খাইয়া হইয়্যা গেল? আর খাইবা না?

না।

ও দাদু, আমরা এখন কোথায় কও তো?

এবার একটু থেমে ঘনশ্যাম বলল, সমুন্দুরের উপর। আন্দামান আইল?

এইতো সবে এক রাত্রি গেল। এখনও তিন রাত বাকি।

বিমল, অ বিমল।

কি দাদু। কিছু কবা?

আন্দামান দেখার আগে আমি যদি মরি, তা হইলে আমার দেহটারে সমুদ্রে ফেলায়ে হাঙর-কুমির দিয়া খাওয়াস না। আন্দামানের মাটিতে আমারে দাহ করিস।

নটবর বাবাকে ধমক দিল। তুমি ঘুমোও দেখি এখন।

দ্বিতীয় দিনটি ভালোভাবেই কাটল। কিন্তু তৃতীয় দিন ভোরের আলো ভালো করে ফোটবার আগেই ঘুম ভেঙে গেল বিমলের। মনে হল কে যেন তাকে ধরে ঝাঁকাচ্ছে। তাড়াতাড়ি চোখ খুলতেই সে দেখল জাহাজটি ভীষণভাবে দুলছে। জিনিসপত্র যা যেখানে ছিল সমস্ত কাত হয়ে পড়েছে। উঠতে গিয়ে দেখল তার মাথা বন বন করে ঘুরছে। তার পাশে ভবেশ শুয়েছিল। ভবেশের পাশে তার ভাই। তারপর মা।

ভবেশ ওয়াক ওয়াক করে বমি করে ফেলল মেঝের ওপরেই। তার ভাই চিৎকার করে কাঁদছে। বিমল তাড়াতাড়ি উঠতেই ভবেশ তাকে ইঙ্গিতে মগটা দেখিয়ে বলল একটু জল নিয়ে আসতে। কোনও রকমে ধরে ধরে জল আনতে গিয়ে বিমল শুনল চারিদিক থেকে আর্ত কান্নার রোল উঠেছে। মেয়েরা চিৎকার করে কাঁদছে। অনেকেই বমি করছে। কেউ উপুড় হয়ে পড়ে আছে।

সারা জাহাজ জুড়ে সে এক বিশৃঙ্খলা।

হারাধনবাবু তাড়াতাড়ি উঠে এসেছেন। যাত্রীদের বোঝাবার চেষ্টা করছেন, রোলিং হচ্ছে। হঠাৎ আবহাওয়া একটু খারাপ হওয়ায় ঢেউ বেড়েছে বলে জাহাজ দুলছে। এতে ভয়ের কোনও কারণ নেই। বমি বমি ভাব, মাথা ঘোরাটা স্বাভাবিক। এটা এক ধরনের সামুদ্রিক পীড়া। আপনারা কেউ খালি পেটে থাকবেন না। এখনই চা আর রুটি দিয়ে দেওয়া হবে। আপনারা খেয়ে নিন। যাদের খুব বমি হচ্ছে তারা অ্যাভোমিন ট্যাবলেট খেতে পারেন। এখুনি রঞ্জু আসছে ট্যাবলেট নিয়ে।

কিন্তু হারাধনবাবুর কথা শেষ হল না। এক বয়স্কা মহিলা এসে পাগলের মতো হারাধনবাবুর গলাটা দু হাতে টিপে ধরতে গেল।

হালা, আমাগোর সাগরে ফেলার মতলব? এতক্ষণ ধইর‍্যা আমাদের খুব চালাক দেছ। তোর শয়তানি আমরা ধইর‍্যা ফেলছি অখন। আমাদের সাগরে ডুবাইবার আগে তোমারে আগে সাগরে ফ্যালব হালার পুত।

হারাধনবাবু অপ্রস্তুত হয়ে সরে গেলেন।

হা-হা করে ছুটে আসে সবাই। মহিলাকে জোর করে সরিয়ে নিয়ে যায়।

ও খুড়ি পাগল হইলে নাকি? কারে কি কও?

কিন্তু মহিলা যেন সাময়িকভাবে উন্মাদ হয়ে গেছেন। তাকে সামলাতে পারে না দশজন লোক মিলে।

ট্যাবলেটের ঠোঙা নিয়ে রঞ্জু আসছিল। সব দেখেশুনে চিৎকার করে ওঠে সে।

ফের যদি চোটপাট দেখি, সত্যি সত্যি সমুদ্রের জলে ফেলে দেব। আমায় চেনো না তোমরা। আপনি চলে যান স্যার। আমি সামলাচ্ছি এদিকটা।

হারাধন বলে আমি কিছু মনে করিনি রঞ্জু। রোলিং এরা কখনও দেখেনি। আন্দামান সি-তে এর চেয়েও ভীষণ রোলিং হয়। এমনকী জাহাজের নাবিকরাও অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমারই প্রথম থেকে সতর্ক করে দেওয়া উচিত ছিল।

এমন সময় নটবর মিস্ত্রি ছুটতে ছুটতে এসে কেঁদে পড়ে রাহাবাবুর কাছে।

বাবু, বাবা আর কথা কয় না। হারাধন জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে তাকাতে রঞ্জু বলে, ওঁর বাবা, খুব বয়স হয়ে গিয়েছে। শরীরটা কিছুদিন থেকে ভালো যাচ্ছিল না। ডাক্তারবাবুকে খবর দিয়ে আসি।

হারাধনবাবু বলেন, চলো কোথায় তোমায় বাবা?

বিমল রাহাবাবুর পিছনে পিছনে গেল। এর মধ্যেই ভিড় হয়ে গেছে জায়গাটায়। ডাক্তারবাবু এসে গেছেন। রাহাবাবু ভিড় ঠেলে ঢুকলেন।

মেঝেতে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে ঘনশ্যাম মিস্ত্রি। জাহাজের রোলিং-এর সময় ওর দেহটা বার কয়েক পাক খেয়ে ঘুরে গেছে। পরনের কাপড়টা শিথিল হয়ে কোমর থেকে খসে আসছে। দুই চোখ বিস্ফারিত। ওপর দিকে চেয়ে আছে ঘনশ্যাম।

ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, মারা গেছে।

ভিড়ের মধ্যে কে একজন কেঁদে উঠল।

কে যেন বলল, নটবরের বউ কাঁদছে।

হারাধন বলল, আপনারা এখানে ভিড় করবেন না। একজন বৃদ্ধ মারা গেছেন। এটা স্বাভাবিক ঘটনা। জাহাজে কেউ ছোটাছুটি করবেন না। তাহলে জাহাজ একদিকে কাত হয়ে যেতে পরে। ভিড় হটান।

ডাক্তারবাবু রঞ্জুকে বললেন, আমার নাম করে অ্যাটেনডেন্ট আর নার্সকে খবর দাও। ওরা একটা স্ট্রেচার নিয়ে আসুক। বডি ততক্ষণ হাসপাতালের মধ্যে থাকবে। কাল ভোরেই আমরা ল্যান্ড করছি। তারপর আত্মীয়স্বজনদের যা ইচ্ছে তাই হবে।

ভিড় ফাঁকা হয়ে গেল। ঘনশ্যাম মিস্ত্রির মৃতদেহও সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। বিমল এই প্রথম মৃত্যু দেখল চোখের সামনে। এইতো কিছুক্ষণ আগে তার সঙ্গে কথা বলেছে ঘনশ্যাম মিস্ত্রি। মুহূর্তের মধ্যে কোথা থেকে কী হয়ে গেল। বিমলের মনে পড়ল ঘনশ্যাম মিস্ত্রির শেষ অনুরোধ। আমি যদি জাহাজের মধ্যে মারা যাই আমার দেহটারে সমুন্দুরে ফেলাস না। আন্দামানের মাটিতে আমারে দাহ করিস।

বুড়োর খুব ইচ্ছে ছিল আন্দামান দেখবার।

রস আইল্যান্ডে নেমে সেখানে দাহ করা হল ঘনশ্যামকে। মুহূর্তের মধ্যে লেলিহান চিতা গ্রাস করে নিল ওর শীর্ণ দেহকে। পুড়তে বেশি সময় লাগল না।

এই ছোট্ট দ্বীপে পা দিয়ে রাশি রাশি মড়ার মাথার খুলি দেখে চমকে উঠেছিল ওরা। যে সন্দেহ যাত্রা শুরুর আগে তাদের অনেকের মাথার মধ্যে বীজাণুর মতো ঢুকে গিয়েছিল সেই সন্দেহ যেন তাড়া করে ফিরছিল ওদের। তাহলে কি এই দ্বীপে ওদের আনা হয়েছে এমন এক ভয়াবহ পরিণতির জন্য? কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ওদের বুঝিয়ে দেওয়া হল গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানিরা দখল করে নিয়েছিল আন্দামান। সেই সময় রস হয়ে উঠেছিল ওদের অস্থায়ী কর্মকেন্দ্র। এই মড়ার খুলি সেই সময়কার জাপানি ধ্বংসলীলারই সাক্ষ্য প্রমাণ বহন করে চলেছে। ওদের বলা হল এখানে ওদের ক্যাম্পে থাকতে হবে কিছুদিন। এক মাস পরে এই রস আইল্যান্ড থেকে একটি ছোট জাহাজে করে তাদের একটি দলকে গন্তব্যস্থল ডিগলিপুরে নিয়ে যাওয়া হবে। সেই জাহাজ এসে গেল দু সপ্তাহের মধ্যেই।

ছোট জাহাজটি অগভীর জলে এসে ভিড়তে পারে। এই ধরনের জাহাজের নাম এল সিডি। এই জাহাজ তীরভূমি থেকে কিছুটা দূরে সমুদ্রের মধ্যেই নোঙর করে। সেখান থেকে ছোট ছোট লঞ্চে করে নামতে হয়। ঢেউ-এর দোলায় দোল খেতে খেতে সবাই এসে পৌঁছোল ডিগলিপুর উপকূলে। দূর থেকে দেখা যায় সবুজ পাহাড়ের প্রাচীর। পাহাড় এর আগে কখনও তারা দেখেনি। দেখেনি সমুদ্রও। সমুদ্র আর পাহাড়ের এই বিচিত্র সমাবেশ তাদের কাছে জীবনের এক অফুরন্ত বিস্ময়। ওই যে পাহাড় থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে ওখানে কি জনবসতি আছে? তাদের রান্নার

ধোঁয়া উঠে মেঘের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে? তাহলে কি লোকবসতি আছে ওই পাহাড়ের কোলে কোলে?

একজন বলল, আন্দামানের জঙ্গলে আদিবাসী রাক্ষসেরা থাকে। মানুষ দেখলেই তারা তীর ছোঁড়ে। বিষ মাখানো বিষাক্ত তীর। ওগুলো সেই অসভ্য জংলিদের বস্তি। তাদের রান্না চেপেছে হয়তো।

উন্মুক্ত সমুদ্র ডিগলিপুরের ভাঙাচোরা তটরেখার মধ্যে ঢুকে সুন্দর এক প্রাকৃতিক পোতাশ্রয়ের সৃষ্টি করেছে। এখানে সাগরের ঢেউ কূলে এসে আছড়ে পড়ে না। মনে হয় নিস্তরঙ্গ বিরাট সরোবর একটা। এরই নাম এরিয়াল বে।

এরিয়াল বে-র উপকূলে পূর্ববঙ্গের প্রথম উদ্বাস্তু দল নামল যেদিন সেদিন তাদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য শুধু উপস্থিত ছিল একদল কুলি। আর কিছু মালয়লমভাষী। তাদের আসার কয়েক মাস আগে কেরল থেকে এসে পৌঁছেছিল ডিগলিপুরের ওই প্রথম ঔপনিবেশিকরা। তারা কেউ উদ্বাস্তু নয়, ভাগ্যান্বেষী একদল মানুষ। যারা প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত জীবনে কিছু হতাশা আর ক্ষোভে ভুগছিল। সেই সময় খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল, আন্দামানে যারা সেটল করতে চাও তারা নাম লেখাতে পারো। প্রত্যেককে সেখানে চাষের জমি দেওয়া হবে। বাস্তুজমি দেওয়া হবে। বাড়ি করার টাকা দেওয়া হবে।

কেরলের বহু মানুষ তাতে সাড়া দিয়েছিলেন। এরিয়াল বে-র কাছে অনেকগুলি ব্যারাকে তারা বাস করছিলেন তখন।

ডিগলিপুরের মাটিতে পা দিয়ে ভবেশের মনে হল এতদিন সে যেন একটা আলেয়ার পিছনে পিছনে ছুটে এসেছে। যেদিকে তাকাও সেদিকে ঘনজঙ্গল। জীবনের কোনও চিহ্ন কোথাও নেই। করোগেটেড শেড দেওয়া ছাদ আর পাতার বেড়া দেওয়া সারি সারি ব্যারাক তাদের ঘর।

এর চেয়ে কত ভালো ছিল তাদের বাসুদেবপুরের ক্যাম্পের জীবন। সেখানে একটু এগুলেই বাস রাস্তা। দোকানপাট। জনবসতি। ক্যাম্পের রিফিউজি বলে স্থানীয় লোকেরা একটু নিচু চোখে দেখত তাদের। এমনকী যে সব উদ্বাস্তুর ক্যাম্পে না থেকে নিজেদের টাকায় ঘর ভাড়া করে থাকত, তারাও নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করত। কিন্তু সে ইচ্ছা করলেই ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে চলে যেতে পারত। বাঁচতে পারত নিজের মতো করে। কিন্তু তার বদলে সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে এ কোন গহন অরণ্যে চিরনির্বাসনে এল তারা।

একে তো পথশ্রমে ক্লান্ত। তার ওপর অরণ্যের নির্জনতায় তাদের কারও মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরুল না।

সন্ধ্যা গড়িয়ে আসছিল। বেশ ঠান্ডা লাগছে এখানে। ভবেশ তার বিছানার মধ্য থেকে র‍্যাপারটা বার করে গায়ে জড়াল। তার মালপত্র এসে গেছে। দুভাই-এর জন্য দুটো ঘর মিলেছে। রমেশের মুখও গম্ভীর। গোটা দলের মধ্যে চড়া গলায়

কথা বলছে না কেউ। প্রতিবাদ বা শোকের ভাষাও যেন হারিয়ে ফেলেছে সকলে।

ভবেশ একটু বেরিয়ে ছিল। অন্ধকার হয়ে এসেছে। এখানে রান্নাবান্নার ঝামেলা নেই। সবাই রান্না করা খাবার পাবে। কিন্তু ভবেশের ছোটো ছেলেটির খুব খিদে পেয়েছে। সে দেখতে বেরিয়ে ছিল যদি কোথাও কোনও দোকান পাওয়া যায়।

অন্ধকারে একটি কালো অপরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হল। পরনে লুঙি। গায়ে একটি শার্ট। বছর পঞ্চাশেক বয়স হবে। হাতে একটি হাতঘড়ি।

ভবেশ জিজ্ঞাসা করল, এহানে কোনও দোকান আছে কিনা কইতে পারেন? লোকটি তার কথা বুঝতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

ভবেশ মুশকিলে পড়ল। বুঝতে পারল লোকটি বাংলা বোঝে না। কিন্তু সে হিন্দিও বলতে পারে না। শিয়ালদায় থাকার সময় দু একটি শব্দ শুনে শুনে দু-একটি হিন্দি কথা রপ্ত করেছিল।

সে বলল, ইধার কোই দোকান হ্যায়?

লোকটি বলল, হ্যায়, সি কানন কা একঠো দোকান হ্যায়। পাকিস্তান সে আয়া?

ভবেশ বলল, হ্যাঁ।

বহুত আচ্ছা, হামারা নাম হ্যায় নারায়ণন। কেরল সে আয়া হুঁ।

ভবেশ এর আগে কেরলের নাম কখনও শোনেনি। সে জানত দক্ষিণ ভারতের লোক মাত্রই মাদ্রাজি।

সে বলল, মাদ্রাসি হ্যায়?

নেহি। নেহি। মালয়লম হ্যায়। কেরলকা নাম শুনা নেহি? আলেপ্পি জিলা। তুমহারা নাম কেয়া হ্যায়?

ভবেশ মণ্ডল।

নারায়ণন লোকটিকে ভবেশের মন্দ লাগল না। ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে কথা বলে নারায়ণন সম্পর্কে যেটুকু জানতে পারল তা হল এই : নারায়ণন আলেপ্পি জেলার এক পাপোশ তৈরির কারখানায় ম্যানেজার ছিল। কোম্পানি উঠে গেল। তার চাকরি চলে গেল। সংসার চালাতে নারায়ণন তার জমি বেচে দিল। সেই টাকায় কিছুদিন চলল। কিন্তু ইতিমধ্যে ভাইদের সঙ্গে ওই জমি বিক্রিকে কেন্দ্র করে মনোমালিন্য শুরু হয়ে গেল। কারণ পৈতৃক জমি তখনও পার্টিশন হয়নি। শুধু মৌখিকভাবে ভাগ বাঁটোয়ারা হয়েছিল। সেই জমি বেচে দেওয়ায় ভাইয়েরা নারায়ণনকে গঞ্জনা দিতে শুরু করল।

সেই সময় নারায়ণন কাগজে বিজ্ঞাপন দেখল আন্দামানে জমি দেওয়া হবে। দরখাস্ত করায় আন্দামান প্রশাসন তাকে ডিগলিপুরে জমি দেওয়ার জন্য মনোনীত করেছে। তারই মতো ৫০ জন পরিবার কেরলের বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছে। তারা এসেছে এক সপ্তাহ হল।

ভবেশ অবাক হয়ে গেল তার কথা শুনে। তারা না হয় দেশ ভাগ হবার পর

সর্বস্ব খুইয়ে আন্দামান এসেছে। কিন্তু এ দেশের মানুষ স্বেচ্ছায় এসেছে এই নির্বাসনে।

ক্যায়সা লাগতা হ্যায়?

নারায়ণনের হিন্দিও ভবেশের মতো। সে কোনও দিন কেরলের বাইরে যায়নি। এই প্রথম তারা কেরলের বাইরে এল। তবে সমুদ্রের সঙ্গে পরিচয় শৈশব থেকে। এ জায়গাটা কেরলের মতোই লাগছে। ছোট ছোট খাঁড়ি আছে। সবুজ বন। সবাই তো বলছে জমি খুব উর্বরা। আর জঙ্গলের কথা যদি ধরো সারা পৃথিবীতেই তো একদিন জঙ্গল ছিল। জঙ্গল কেটেই তো মানুষ শহর বানিয়েছে।

কাননের দোকানটা দেখিয়ে নারায়ণন চলে গেল। বলল, এখান থেকে মাইলখানেক দূরে ব্যারাক আছে। সেখানে আছে তারা। তার কাছে টর্চ আছে। জঙ্গলের পথে আর কোনও ভয় নেই। তবে সাবধান, এখানে বড় বড় জোঁক আছে।

কাননের দোকানটিও অস্থায়ী একটি ঘর। পাতার বেড়া, টিনের ছাউনি। চাল, ডাল, তেল, নুন সবই রয়েছে। একটি কেরোসিনের কুপি জ্বলছে।

দোকানের সামনে এক ছড়া কলা ঝুলছে। বিড়ি সিগারেট পানও পাওয়া যায়। বয়েমে রয়েছে দিশি বিস্কুট।

এক একটা বিস্কুটের দাম চার আনা। একটা কলার দামও চার আনা। গলা কাটা দাম। তবু কিছু না কিনলে নয়। সবারই খিদে পেয়েছে। দোকানে অনেকের সঙ্গেই দেখা হল। তারা কিনতে এসেছে। নটবরের সঙ্গে দেখা হল।

দেখে সত্যি মায়া হয় তাকে। বুড়ো শ্বশুরের সঙ্গে নটবরের বউ সব সময় ঝগড়া করত। বুড়োকে খেতে দিত না। কিন্তু বাবাকে ভালোবাসত নটবর। সারাটা পথ আগলে নিয়ে এসেছে বুড়ো বাবাকে।

বাবার শেষ ইচ্ছা ছিল সেটাই পূর্ণ হয়েছে। অন্তত আন্দামানের মাটিতে তার চিতাভস্ম ছড়িয়ে রয়েছে। এই ভস্মটুকু যেন মানুষের এক একটা ইচ্ছার বীজ। নতুন সৃষ্টির মহীরুহ রয়েছে ওই বীজের ভেতর। নটবর সেকথা উপলব্ধি করতে পারে না। কারণ বাবার মৃত্যুকে সে মনে করছে এক অজানা অমঙ্গলের সংকেত। নতুন জীবন শুরু করতে হচ্ছে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। নটবর বলে, বাবা মরল, কাছা নিতে পারলাম না। কয়দিন নিরামিষ খাব ভাবতিছি। বিদেশ বিভুঁয়ে ছেরাদ্দ শান্তি কে করবে?

ভবেশ বলল, ওসব চিন্তা মন থে ছাড়ান দাও। সমুন্দুরের উদ্দেশে নিজে নিজে পিণ্ডি দিয়ো। চালকলা চটকে দিয়ো তাহলেই হইব। বাচ্চা দুটার ক্ষুধা লাগছে কিছু কিনব বলে আইছিলাম। কিন্তু যা আক্রা এহানে জিনিসপত্তর।

কলা আর বিস্কুট কিনে ফেরার পথে সীতানাথের সঙ্গে দেখা। তার স্ত্রীর অবস্থা নাকি খুবই খারাপ হয়ে পড়েছে।

সীতানাথ বলল, জাহাজে ডাক্তার ওষুধপত্তর দিয়ে বলল দাস্ত থেমে যাবেনে। তখনকার মতো বেশ থেমি গেল। রস আইল্যান্ডে যতদিন ছেলাম ভালোই ছেল। কিন্তু কাল থেকি আবার অবস্থা খারাপ হয়ে পড়িছে।

ভবেশ বলল, রঞ্জুকে অথবা রাহাবাবুকে খবর দেছ?

অন্ধকারে কেডা যে কোথায় তা কে জানে? আমি তো রঞ্জুরে জাহাজঘাটার দিকি খুঁজে আলাম। ওনার মায়েরে দেখছি কিন্তু উনি যে কোথায় তা দ্যাখতে পেলাম না। একজন বলল, মালিয়াদের ব্যারাকের দিকে গেছে। সে তো শুনি এহান থেকি এক কোরোশের মতো পথ। হাবড় ভেঙে এহন ওহানে যাবে কিডা?

ভবেশ বলল, আহা মালিয়াদের একজনের সঙ্গে আলাপ হল নারায়ণন নাম করে। আগে জানলে তারে দিয়া খবর পাঠায়ে দেতে পারতাম। চলেন, আপনার ব্যারাকে যাই। আপনার মাইয়াটারে আমাদের কাছে রাখেন।

ভবেশ গিয়া দেখল সীতানাথের বউ অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। তার দেড় বছরের মেয়েটি উদ্‌ভ্রান্তের মতো চেয়ে আছে। ভবেশ তাকে কোলে তুলে নিল।

বলল, আমার সঙ্গে আইবা?

মেয়েটি কোনও আপত্তি করল না। কথাও বলল না। মনে হচ্ছে সমস্ত কিছু দেখে সে যেন ভীষণ অবাক হয়ে গেছে।

ভবেশ সীতানাথের মেয়েকে ওদের ব্যারাকে নিয়ে গেল।

মেয়েটিকে বউয়ের হাতে সঁপে দিয়ে সে বলল, সীতানাথের মেয়ে। জাহাজে দ্যাখছ এরে। সীতানাথের বউয়ের অসুখ আবার বাড়ছে। এহানে ডাক্তার টাক্তার কোথায় আছে কে জানে?

ভবেশের বউ বলল, আজ রাত্তিরটা দ্যাখো। তারপর কাল সকালে রাহাবাবুরে ডাকাবা।

না-না আজই যা হয় কিছু করতে লাগে। কাল রাতে যদি দেরি হয়ে যায় আবার।

বেশ রাতের দিকে খাবার ডাক এল। খাবার জায়গা হয়েছে আর একটা বড় শেডের নীচে। ওখানে হ্যাজাক জ্বলছে।

রাহাবাবু রঞ্জুকে নিয়ে মালয়লম ব্যারাকে গিয়েছিলেন। ওরই মাঝামঝি একটা জায়গায় অস্থায়ী ডিসপেনসারি আছে একটি। কিন্তু কোনও ডাক্তার নেই। একজন কম্পাউন্ডারবাবু আছেন।

রঞ্জু দু-তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে তাকে আনতে বেরিয়ে গেল।

কম্পাউন্ডার এসে বললেন, ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রি। পোর্টব্লেয়ার পাঠাতে হবে। কালকে একটা বোট আসবে পোর্টব্লেয়ার থেকে। সীতানাথ তার বউকে নিয়ে পোর্টব্লেয়ার যাবে। মেয়েটি ভবেশের কাছেই থাকবে। এই সিদ্ধান্তই নেওয়া হল।

কিন্তু মাঝরাতে কান্নার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল ভবেশের। পুরুষ কণ্ঠে কে কাঁদছে চিৎকার করে করে। বুক ফাটা আর্তনাদের মতো শোনাচ্ছে সে কান্না। ডিগলিপুরের নির্জন সৈকত কেঁপে কেঁপে উঠছে সে কান্নায়।

পুরুষ মানুষ যে এমন চিৎকার করে কাঁদতে পারে ভবেশ তা কখনও ভাবেনি।

কান্নার আওয়াজ শুনে সমস্ত মানুষ জেগে উঠেছে। ভিড় করেছে সেখানে যেখান

থেকে কান্নার আওয়াজ আসছে।

কাঁদছে সীতানাথ। তার বউ মারা গেছে।

দুদিনের মধ্যে দুদুটো মৃত্যু।

সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে চিতা সাজানো হল। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল চিতা। খবর পেয়ে মালয়লি বস্তির লোকজনও চলে এসেছে। এক বিরাট জনতা চিতাকে ঘিরে।

সীতানাথ এখন আর কাঁদছে না। সে নিস্পন্দ নিথর হয়ে বসে আছে।

দুদিন এরিয়াল বে-তে বিশ্রাম নেবার পর সবার ওপর আদেশ হল ডিগলিপুর যেতে হবে। জমিজমা দেওয়ার ব্যবস্থা ডিগলিপুর থেকে হবে। এরিয়াল বে-র ব্যারাকগুলি ছেড়ে দিতে হবে। কারণ আগামী কালই আবার একটি জাহাজ এসে পৌঁছোচ্ছে। তাতে আর একদল উদ্বাস্তুকে আনা হবে।

সকাল থেকে সেদিন ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল। অধিকাংশের সঙ্গেই ছাতা নেই।

হারাধনবাবু বললেন, ডিগলিপুরে এলে বৃষ্টিকে ভয় করলে চলবে না। ডিগলিপুর আন্দামানের চেরাপুঞ্জি। তার ওপর এখন তো বর্ষাকাল। তবে এই ঝিরঝির বৃষ্টি এখনই থেমে যাবে। সকাল সকাল যাত্রা না করলে ১০ কিলোমিটার পথ ডিগলিপুরে সন্ধ্যার আগে পৌঁছোনো যাবে না। এমনি হেঁটে যেতে কিছু না, কিন্তু সঙ্গে মালপত্র আছে প্রত্যেকেরই। অনেকের আবার কচি বাচ্চা আছে। তাদের কোলে বা কাঁধে নিয়ে যেতে হবে। অবশ্য মালপত্র বলতে যা বোঝায় তেমন কিছু কারও কাছে নেই। কিছু বাসন আর জামাকাপড়।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে উঁচুনিচু পথ। সারা রাস্তা কাদায় ভর্তি। কোথাও কিছুটা চড়াই। তার ওপর দিয়ে বনবিভাগের হাতি গিয়েছে। বড় বড় গর্ত। কোথাও উতরাই। একসঙ্গে বিরাট লাইন করে তারা হাঁটছিল। মনে হচ্ছিল বুঝি এক দীর্ঘ শোভাযাত্রা চলেছে। মানব সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই নতুন অভিবাসনের উদ্দেশ্যে মানুষের যাত্রা শুরু হয়েছে। নতুন করে বাঁচার স্বপ্নে বিভোর হয়ে কত মানুষের ধারা বহে চলেছে যুগ যুগান্তর ধরে। একমাত্র মহাকাল ছাড়া কারাই বা এই অভিযাত্রার হিসাব রাখে।

বিমলের বেশ রোমাঞ্চ লাগছিল। মনে হচ্ছিল—মনে হচ্ছিল এক বিপদসঙ্কুল অভিযানে সে চলেছে। বিষ্ণুপুর ক্যাম্পে থাকতে প্রায়ই তাদের সিনেমা দেখাত। কি একটা ইংরাজি সিনেমায় এমন এক অভিযানের দৃশ্য দেখে সে। ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চারজন অভিযাত্রীর একটি দল চলেছে এক গুপ্তধনের খোঁজে। দলে একটি মেয়েও ছিল। প্রতিটি পদক্ষেপে মৃত্যু ওত পেতে ছিল তাদের জন্য। কখনও গাছের ডাল মড়মড় করে ভাঙতে ভাঙতে আসছিল হাতির পাল। কখনও নিশুতি রাতে তাদের তাঁবুতে হানা দিচ্ছিল সিংহের দল। নদীতে ভর্তি জলহস্তি আর কুমির। একবার

এক বিরাট অজগর সাপ তাদের একজনকে জড়িয়ে ধরেছিল। বাকিরা এসে সাপটির মুণ্ডটা কেটে ফেলে তবেই রক্ষা করেছিল তাকে।

দেশটির নাম আফ্রিকা। কোন বইতে যেন পড়েছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন এক মহাদেশ বলা হয় যাকে। যে দেশ এমনি গভীর গহন জঙ্গলে ঢাকা।

কিন্তু আন্দামানে এসে সে দেখছে এমনি গভীর অরণ্য। মনে হয় এই মুহূর্তে বুঝি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসবে ক্ষুধার্ত নেকড়ের দল। অথবা বৃংহন ধ্বনি দিতে দিতে এসে হানা দেবে যূথবদ্ধ হাতিরা।

আফ্রিকা কোথায় তা কে জানে। হয় তো আন্দামানের খুব কাছেই সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন আফ্রিকা।

আধুনিক ভারতবর্ষের মানুষের অভিবাসনের সন্ধানে এই দীর্ঘযাত্রায় সেদিন আর কোনও সাক্ষী ছিল না—একমাত্র আন্দামানের আকাশ, সমুদ্র আর পাহাড় ছাড়া।

সেদিন কোনও তথ্যচিত্রের আলোকচিত্রী ছিলেন না তাদের মধ্যে। ছিলেন না কোনও সমাজতাত্ত্বিক কিংবা ঐতিহাসিক, নিদেনপক্ষে দ্রুত ইতিহাসকে লিপিবদ্ধ করে রাখেন এমন কোনও সাংবাদিক। অবশ্য এরিয়াল বে থেকে ডিগলিপুর পর্যন্ত পায়ে চলা একটা রাস্তা কোনও মতে তৈরি করেছিল পি ডব্লু ডি-র লোকেরা।

হারাধনবাবু আগে আগে চলছেন। তাঁর পাশে পাশে রঞ্জু। সাধনবাবুর হাতে ম্যাপ। তিনি রঞ্জুকে বললেন, এই যে ডিগলিপুর দেখছ, গোটা দ্বীপটা ৮৮৪ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের। এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত ২২ কিলোমিটার হবে। এখানে প্রায় ২৭টা গ্রাম আমরা গড়ে তুলব। যেমন যেমন লোক আসবে তেমন তেমন নতুন বসত গড়ে উঠবে। ফরেস্টের লোকেরা এসে বড় গাছগুলি কেটে দিয়ে গেছে। আরও কাটবে, কিন্তু সেটলারদের নিজেদেরই জঙ্গল সাফ করে নিতে হবে।

ওই যে পুব দিকে যে বিরাট পাহাড়েব রেঞ্জ ওই রেঞ্জে পাবে আন্দামানের পাহাড়গুলির মধ্যে সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গ। স্যাডল পিক। দু'হাজার দশ ফুট উঁচু। এইসব পাহাড়ও একদিন সমুদ্রের মধ্যে চুপটি করে মাথা গুঁজে ঘুমিয়ে ছিল। তারপর হাজাব হাজার বছর ধরে ভূমিকম্পের ফলে ভূত্বকের নানা রদবদল ঘটল।

সমুদ্র থেকে ডুবো পাহাড় মাথা উঁচু করে জেগে উঠল। আর তার চারপাশে কোটি কোটি প্রবালেরা নিজেদের দেহ দিয়ে সমুদ্রের বুকে গড়ে তুলল কয়েকশো দ্বীপ। তার মধ্যে উত্তর আন্দামানে এই ডিগলিপুর এমন একটি প্রবাল দ্বীপ। যেখানে তোমরা এসেছ।

বৃষ্টিতে মাঝে মাঝেই রাস্তায় কাদা হয়েছে। সেই কাদা ভেঙে যেতে হল সবাইকে। মেয়েরা কেউ জুতো পরেনি। বাচ্চারাও নয়। শুধু পুরুষদের মধ্যে কিছু লোকের পায়ে চটি ছিল। তারা চটি খুলে হাতে নিল।

কে একজন এসে খবর দিল, রঞ্জুদা! তোমার মায়ের শরীল খারাপ লাগতেছে। তোমারে ডাকে।

রঞ্জু তাড়াতাড়ি ভিড় ঠেলে পিছনে গিয়ে দেখল তার মা বসে পড়েছে পথের ধারে। শুধু তার মা নয় আরো কজন মহিলা যাদের কোলে ছোট বাচ্চা আছে তারাও পিছিয়ে পড়েছে।

প্রায় মাইল তিনেক হেঁটে এসেছে ওরা। রোদ বেশ চড়া এখন। গাছের ফাঁক দিয়ে দিয়ে সূর্যের আলো এসে ঠিকরে পড়ছে রাস্তায়।

রঞ্জুর মা চারুবালার বয়স হয়ে গেছে। ষাট ছাড়িয়ে গেছেন তিনি। পথশ্রমের এই ধকল। তার ওপর এই পদযাত্রার কষ্ট তিনি সহ্য করতে পারছেন না।

রঞ্জু বলল, ওমা কী হয়েছে তোমার?

রঞ্জুর মা রাগ করে বলে, কিছু হয় নাই।

তাহলে তুমি বসে পড়লা ক্যান?

তোরা যা না। আমি আর যামু না। এহানেই আমি থাকুম।

একটু থেমে রঞ্জুর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, তুই দায়ী এই সবের জন্য। তোর চোলে পড়িয়া আজ এত লোকের দুর্গতি। তোর জন্যই পুরো যাত্রাটা অযাত্রা ধরল। দুই দুইডা মাইন্‌ষের মরণ হল। এই জঙ্গলের মধ্যে তুই কি গুপ্তধন পাস আমি দ্যাখতে চাই।

রঞ্জু একদম রাগে না। এমনিতেই সে ঠান্ডা প্রকৃতির মানুষ। ভেতরে ভেতরে রাগলেও সে মুখে কিছু বলে না।

ভবেশ ছুটে আসে।

কী হইল ঠাকুমা। এত রাগো ক্যান?

রঞ্জুর মা কথার জবাব দেয় না।

কিন্তু রঞ্জু তার মাকে কী করে বোঝাবে তারা যখন এসে পড়েছে আর তাদের ফেরার উপায় নেই। এখানেই থাকতে হবে তাদের। গ্রামে তাদের স্কুলের ভূগোলের মাস্টারমশাই ভবরঞ্জনবাবুর কথা এখানে এসে বারবার মনে পড়ে।

ভবরঞ্জনবাবু বলতেন, ভাগ্যের সঙ্গে যখন লড়া যায় না, তখন তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নেওয়াই ভালো। এইভাবে সামনের অজানা দুর্ভাগ্যকে সাদরে বরণ করে না নিলে মানুষ কখনই এগিয়ে যেতে পারে না।

কিন্তু এসব কথা সে তার মাকে বা তাদের বয়সি মানুষকে কী করে বোঝাবে?

ভবেশ বলল, আমরা এখানে কিছুক্ষণ জিরোয়ে নেই। যারা আগে যেতে চায় যেতে পারে।

রঞ্জু গিয়ে রাহাবাবুকে সেই কথা জানাল।

রাহাবাবু বললেন, এখানে বেশিক্ষণ বসলে কিন্তু সন্ধ্যার আগে ডিগলিপুর পৌঁছোতে পারব না। ঠিক আছে এক ঘণ্টা রেস্ট নিয়ে নাও। আর একটু এগিয়ে মালয়লম সেটলারদের ব্যারাকে কুয়ো আছে। সেখানে জল পাবে। তোমাদের মধ্যে গিয়ে কেউ জল নিয়ে আসতো পারো। নয়তো একটা কাজ করতে পারো আর

একটু কষ্ট করে এগিয়ে চলো। আমরা ওখানেই একেবারে রেস্ট নেব।

আরো মাইলখানেক দূরে কেরল ব্যারাকে গিয়ে ওরা বিশ্রাম নিল।

ভবেশ এবার মালয়লম বসবাসকারীদের দেখল। ব্যারাক থেকে পুরুষ, মহিলা, ছেলে, মেয়ে সবাই বেরিয়ে এসেছে তাদের দেখার জন্য। পুরুষদের গায়ে গেঞ্জি। পরনে লুঙি। মেয়েদের পরনে রঙিন শাড়ি। প্রত্যেকেই তাদের মতো কালো। তবে সকলেরই স্বাস্থ্য খুব ভালো।

ভবেশের সঙ্গে দেখা হল নারায়ণনের।

ভবেশ নমস্কার করল। আচ্ছা হ্যায়?

আচ্ছা। আভি চলতা হ্যায় ডিগলিপুর?

হ্যাঁ। আচ্ছা ডিগলিপুর ক্যায়সা জায়গা হ্যায়?

এইসা হি হ্যায়। হম কভি নহি গিয়া। উধার রাঁচি লোগ আতা-যাতা হ্যায়। উলোক উধার কাম করতা হ্যায়। উসমে এক নদী হ্যায়। কালপং রিভার। উসকা পাশ এক নালা হ্যায়, রাঁচি লোক বলতা হ্যায় উসমে বহুত মগর হ্যায়।

মগর বস্তুটি কী ভবেশ ঠিক বুঝতে পারল না। নদীনালাতে যখন আছে তখন নিশ্চয়ই এক ধরনের মাছ কোনো।

নারায়ণন ওকে নিয়ে গেল তার ব্যারাকে। অবশ্য নারায়ণন তার মতো সর্বস্ব খুইয়ে দেশত্যাগী হয়নি। আসার সময় দেশ থেকে প্রচুর জিনিসপত্র এনেছে। চারটে বাক্স। দুটো বড় বড় বেডিং। এমনকী একটি ঢোলও।

ভবেশ বলল, আপলোগ বাজাতা হ্যায়?

নারায়ণন বলল, হ্যাঁ, এককালে খুব গানবাজনার শখ ছিল। মাঝখানে চাকরি না থাকাতে মনে শান্তি ছিল না। গানবাজনার চর্চা করতে পারেনি। তার স্ত্রী বাইরে কোথায় গিয়েছিল একটু পরে ফিরতেই নারায়ণন তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। সাত বছর বিয়ে হয়েছে। মহিলাটিকে দেখে অল্পবয়সি মনে হবে। তার বউয়ের চেয়ে অনেক ছোট। তবে ছেলেপুলে হয়নি।

ভবেশকে জিজ্ঞাসা করল নারায়ণন, তোমার ক'টা ছেলেপুলে?

ভবেশ জবাব দিল, দুই ছেলে।

নারায়ণন বলল, চাষি পরিবারে যত ছেলেমেয়ে ততই সুবিধে। চাষের কাজে লোক পাওয়া যায় না। এখানে তো প্রশ্নই ওঠে না বাইরের লোকের। নারায়ণের তাই চিন্তা—জমি পেলেও সে সামাল দেবে কী করে? তার তো কোনও ছেলেপুলে নেই।

ভবেশ বলল, কই বোল নেহি সকতা, তুমহারা লেড়কা পয়দা হো যায়ে হিঁয়া।

নারায়ণনের স্ত্রী লজ্জা পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় মালয়লম ভাষায় কী যেন বলে গেল তার স্বামীকে।

নারায়ণন বলল, হামারা বিবি পুছতা হ্যায় আপ চা পিজিয়ে গা?

চা? চা মিলেগা?

জরুর। আপকো লিয়ে বানায়েগি। হামারা সাথ স্টোভ হ্যায়। ও হাম মুলক সে লে আয়া। পিজিয়েগা চা?

একটু ভেবে ভবেশ বলল, ঠিক হ্যায়, আপ যব বোলতা হ্যায়......বানাইয়ে।

নারায়ণন বলল, হিঁয়া পর বহুত হিরণ হ্যায়। আপ দেকা?

হিরণ? উসকা মতলব কেয়া হ্যায়?

হিরণ হোতা হ্যায় না, জঙ্গলমে রহতা হ্যায়। বকরিকা মাফিক ... আচ্ছা দেখা যাতা হ্যায়। শিং হ্যায় উসকা এই সা।

নারায়ণন ইঙ্গিতে হরিণের শিং দেখাল। ও, হরিণ? ভবেশ বুঝতে পারল হরিণের কথা বলছে ও। এই জঙ্গলে হরিণ আছে সে কখনও হরিণ দেখেনি। শুধু হরিণের ছবি দেখেছে। বাচ্চারা হরিণ দেখলে খুব খুশি হবে। তবে হরিণ যখন আছে তখন বাঘ নিশ্চয়ই আছে। জঙ্গল দেখে তো মনে হয় বাঘ থাকাটা স্বাভাবিক। কিন্তু নারায়ণন বলল, না বাঘ নেই। তারা তো প্রায় মাসখানেক আছে এই জঙ্গলে কখনও বাঘের ডাক টাক শোনেনি।

রোজই তারা জঙ্গলে ঘোরে। কাঠকুঠো সংগ্রহ করে। তা বাদে জমি দেখানো শুরু হয়ে গেছে। প্রতিনি কিছু কিছু লোককে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে জমি দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

কত জমি দিচ্ছে? ভাঙা হিন্দিতে ভবেশ আবার জিজ্ঞাসা করল।

এখন তিন একর করে ধানিজমি দিচ্ছে। পরে পাহাড়ি জমিও দেবে আরও তিন একর করে। তবে নারায়ণন এখনও জমি নেয়নি। সে পাটোয়ারির সঙ্গে খাতির জমিয়ে নিয়েছে। সে তাকে বলেছে তাড়াহুড়ো কোরো না। তোমাকে ভালো জমি দেব বেছে বেছে। তোমাকেও শিখিয়ে দেই। পাটোয়ারির সঙ্গে একটু খাতির রেখো। ভালো জমি বন্দোবস্ত হয়ে যাবে।

একটু পরে নারায়ণনের বউ এল দু কাপ চা নিয়ে। একটি পেতলের রেকাবির ওপর দুটো চায়ের কাপ। আর দুটি প্লেটে কয়েকটি লেড়ো বিস্কুট।

নারায়ণন বলল, এটাকে আমরা লাড্ডু বলি। খাও। খুব মিষ্টি। অনেকদিন থাকে। আসার সময় কোচিন থেকে কিনে এনেছিলাম। এখনও ক'টা রয়েছে।

মুখে দিতেই মুচমুচ করে বিস্কুটটা ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেল মুখের মধ্যে। বেশ সুন্দর খেতে। সঙ্গে সঙ্গে চা-এ চুমুক লাগাতে তার সমস্ত পথশ্রম দূর হয়ে গেল।

নারায়ণন বলল, সেকী আর একটা লাড্ডু খেলে না?

ভবেশ একটু অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বলল, বহৎ আচ্ছা হ্যায়। এক হাম লে জায়গা হামারা লেড়কাকে লিয়ে। উনকো টেস্ট করায়েগা কোচিন কা লাড্ডু কেইসা হ্যায় মালুম হো জায়গা।

নারায়ণন বলল, তব তো আর দো লে যাও। তুমহারা ওয়াইফ আর দো বাচ্চাকো টেস্ট করাও।

ভবেশের মনে হল নারায়ণন বোধহয় সত্যিই অন্তর্যামী নারায়ণ। কারণ তা না হলে তার মনের কথাটা জানতে সে পারল কেমন করে? লাড্ডু খাওয়ার সময় তাদের মুখই ভবেশের বারবার মনে পড়ছিল।

ডিগলিপুর ওরা সন্ধ্যার মধ্যেই এসে পৌঁছোল। এখানে ঘন জঙ্গলের মধ্যে অনেকখানি এলাকা কেটে সাফ করা হয়েছে। জায়গাটি চারদিকে পাহাড় ঘেরা। পূর্বদিকে তাকালে মনে হয় যেন কেউ পাহাড়ের প্রাচীর দিয়েছে। পশ্চিম দিকের অনেকখানি এলাকা ফাঁকা। সেখানে ঘন জঙ্গল। দক্ষিণে সমুদ্র পাহাড় আর জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেছে।

ডিগলিপুরের একটা অংশ সমতল। সেখান দিয়ে বয়ে গেছে কালপং নদী।

শীতকালে খুব বেশি জল থাকে না। পাথুরে নদী। পাথর আর নুড়ির মধ্য দিয়ে ঝির ঝির করে জল গড়িয়ে চলে।

পায়ে হেঁটে নদী পেরিয়ে ওরা নদীর উত্তর পাড়ে এল। একটু এগুলেই আবার আর একটি উঁচু সারি সারি ব্যারাক করা তাদের জন্য। ওরা যখন সেখানে এসে পৌঁছোল তখন কারও কথা বলার শক্তি নেই।

হারাধনবাবু বললেন, ব্যস, আমরা পৌঁছে গেছি। আপনারা আপনাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেলেন। এইবার বিশ্রাম নিন। আজ আমরা আপনাদের জন্য খিচুড়ি রেঁধেছি। কাল থেকে নিজেদের রান্না নিজেরা করে নেবেন। আজ রাতেই আপনাদের যাবতীয় জিনিস আপনারা নিয়ে নেবেন। এখানে কিছুদিন আপনাদের কাটাতে হবে। তারপর আমরা চেষ্টা করছি তিন-চার দিনের মধ্যেই আপনাদের জমি দেখানো শুরু করা যায় কিনা। একটা কথা আপনাদের জানিয়ে রাখি, ব্যারাকের ভেতর আপনাদের প্রত্যেকের জন্য মাচা তৈরি করা আছে। আপনারা মাটিতে শোবেন না। এখানে বড় বড় জোঁক আছে। অন্ধকারে জঙ্গলের দিকে যাবেন না। সাপ-খোপের উপদ্রব আছে। আমরা অবশ্য ব্যারাকের চারদিকে কার্বলিক অ্যাসিড ছড়িয়ে দিয়েছি। তবু সাবধানের মার নেই।

রাতের বেলা খাওয়া দাওয়ার শেষে প্রত্যেককে লাল আটা, চাল, ডাল ও সরষের তেল লবণ দিয়ে দেওয়া হল।

ব্যারাকে ভবেশদের ঘর একেবারে শেষ প্রান্তে। অনেক রাত হয়ে গেছে। বিমল ও তার ভাই ঘুমিয়েছে একটি মাচায়। ভবেশ ও তার বউ আর একটি মাচায়। কিন্তু ঘর অন্ধকার করতেই কোথা থেকে এসে জুটল অনেকগুলি পোকা। অদ্ভুত ধরনের পোকা সব। দেখতে কোনটা ফড়িং-এর মতো। কোনটা গুবরে পোকার মতো।

হঠাৎ ভবেশের মনে হল গায়ে কি কামড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে অসংখ্য ছুঁচ বিঁধোচ্ছে শরীরে। চটাস করে শব্দ করে গায়ে চাপড় দিতেই সে বুঝতে পারল মশা। রক্ত খেয়ে ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে। গায়ের সঙ্গে রক্ত লেপ্টে গেল।

ভবেশের বউ ঘুমে অচেতন। বিমল ও তার ভাই শ্যামলও ঘুমোচ্ছে। তাদের কারও সাড়াও নেই। ভবেশ তাড়াতাড়ি উঠে একটি দেশলাইর কাঠি জ্বালল। অসংখ্য মশা বিমল ও শ্যামলকে ছেঁকে ধরেছে। এতবড় মশা সে কখনও দেখেনি। তাদের মশারি আছে। বিষ্ণুপুর ক্যাম্পেও মশারি ছিল। কিন্তু এখন কোন পুঁটলির মধ্যে আছে তা কে জানে। আজকের রাতটা কোনোরকমে কাটিয়ে দিতে হবে।

ভবেশ তাড়াতাড়ি লম্পটা জ্বালল! বিছানা থেকে চাদরটা টেনে বার করল। আর বার করতে গিয়েই মনে হল কি যেন ছিটকে পড়ল মাটিতে। তাড়াতাড়ি আলো নিয়ে দেখল দুটো বড় বড় চেলা বিছে দ্রুত ঘর থেকে পালিয়ে যাচ্ছে।

ভবেশ দ্রুত ছেলেদের ডাকল। এই বিমল এই শ্যামল।

কিছুতেই ঘুম ভাঙে না তাদের। ডাকাডাকিতে ভবেশের বউ উঠে পড়েছে।

সে বলল, কী হইছে? ওদের ডাকো ক্যান? বিছানা পাতার সময় দ্যাখো নাই। চ্যালা বিছা ঢোকছে বিছানার ভেতর।

ছেলেদের তুলে দুটো বিছানা ঝাড়তেই আরো ক-টি চ্যালা বিছে বেরুল। ভবেশ দু-তিনটেকে মারল। কিন্তু বাকিদের মারা গেল না। তারা অন্ধকারের ভেতর কোথায় মিলিয়ে গেল।

সারারাত ভালো করে ঘুম হল না ভবেশের। চোখ বুঁজলেই মনে হতে লাগল এই বুঝি বিছেরা আবার আক্রমণ করবে। চাদরে মাথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে থেকেও ভেতরে কিভাবে মশা ঢুকে যাচ্ছিল। এ পর্যন্ত যত মশা কামড়েছে তাতে সারা দেহ জ্বলে যাচ্ছে। গ্রামে থাকতে পিঁপড়ের টোপ ভাঙবার সময় পিঁপড়ের কামড়ে যেমন জ্বলুনি হত ঠিক তেমন জ্বলে যাচ্ছে দেহ।

পরদিন সকালে উঠে শুনল কাল রাতে সুধীর বিশ্বাসের এক বছরের বাচ্চাকে চ্যালা বিছেয় কামড়েছে। কাল সারারাত যন্ত্রণায় ছটফট করেছে মেয়েটি। সকালবেলা মেডিকেল থেকে কম্পাউন্ডারবাবু এসে দেখে গেছেন। ওষুধও দিয়েছেন।

ভোরেই ঘুম ভেঙে গেছে বিমলের। সে ঘুম থেকে উঠে মাঠের দিকে ঘুরছে। এমন সময় দেখল দূর থেকে পাজামা আর শার্ট পরা কে একজন আসছে রঞ্জুদার মত। কাছে এলে বোঝা গেল, হ্যাঁ রঞ্জুদাই তো।

আরে রঞ্জুদা তুমি ভোরবেলায় কোথায় যাও?

রঞ্জু বলল, কাল রাতে মশার চোটে ঘুম হয় নাই বুঝলি। সকালে উঠে জঙ্গলটা দেখতে গিয়েছিলাম।

একা, একা? তোমার ভয় করে না?

দূর পাগল। ভয়ের কী আছে? চল তুইও আমার সাথে চল। এই সামনের টিলাটায় চড়ি।

ওরে বাপ, এতো ভীষণ উঁচা।

এখানে যখন আইয়া পড়ছস এই পাহাড়ি জায়গায়—তখন পাহাড়ে চড়া শিখবার লাগে বইকী!

সামনেই উঁচু প্রাচীরের মতো টিলা। অনেকখানি লম্বা। তা পাঁচতলা ছ-তলা উঁচু তো হবেই। কোনও রাস্তা নেই ওপরে ওঠার। ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গাছ ধরে ধরে ওরা ওপরে উঠল।

কিছুদূর ওঠার পর বিমলের মনে হল তার আর পা চলছে না। এই শীতের ভোরেও তার বেশ জল তেষ্টা পেয়েছে। এখান থেকে তাদের ব্যারাকগুলোও ছোট ছোট দেখাচ্ছে।

তাকে ছাড়িয়ে রঞ্জুদা আরও ওপরে উঠে গেছে। আরও ওপরে। রঞ্জুদার গলা শুনতে পাচ্ছে বিমল। একদম ওপরে উঠে রঞ্জু বলছে, বিমল ওপরে আয়, দেখে যা কী সুন্দর।

কিন্তু বিমলের পা আর চলছে না। হঠাৎ একটা গাছ ধরতে গিয়ে হাত ফসকে সরসর করে কিছুটা নীচের দিকে পড়ে গেল বিমল। তার জামা প্যান্টে ঘাস আর পাথরের টুকরোয় ঘসা লাগছে। গা-হাত-পা ছড়ে গেছে। তাড়াতাড়ি একটি গাছ ধরে ফেলল সে। কিন্তু এখান থেকে পাহাড়ের ওপরটা আর বেশিদূর নয়। এত কাছে এসে এখন নেমে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। সে আবার প্রাণপণ শক্তিতে ওপরে উঠবার চেষ্টা করল।

অবশেষে রঞ্জুদাই হাত বাড়িয়ে তাকে টেনে নিল ওপরে। বয়সের তুলনায় রঞ্জু চিরকালই গম্ভীর। বিজ্ঞের মতো কথা বলে সে। তার কথাবার্তার মধ্যেও কলকাতার ভাষা মিশে গেছে। বাঙাল ভাষা কদাচ বলে। ওপরে উঠে রঞ্জুদা যেন ছেলেমানুষ হয়ে গেছে। সে চিৎকার করে বলছে, বিমল ওই দ্যাখ স্যাডল পিক। স্যাডল পিকের ওপর সূর্য উঠছে। দ্যাখ মনে হচ্ছে সোনার থালা একটা। বিমল ওই পাহাড়কে প্রণাম কর। ওই পাহাড় আমাদের মায়ের মতো ঘিরে রেখে দেবে। সমুদ্রের ঢেউ আর ডিগলিপুরে ঢুকতে পারবে না। কোনও দিনও। ওই পাহাড় হল রাজা পাহাড়। সমুদ্রকে শাসন করছে।

বিমল, এই পাহাড়, এই আকাশ, এই সোনার থালার মতো সূর্য, ওই গাছ, বন, কালপং নদী এখন থেকে সব আমাদের। আজ থেকে ওই সূর্যের সামনে প্রতিজ্ঞা কর ডিগলিপুরকে তোরা সবাই ভালোবাসবি। কী চুপ করে আছিস কেন? কথা বলতে পারছিস নে?

সত্যি কথা বলতে পারছিল না বিমল। তার মুখের ভেতর কেমন যন্ত্রণা হচ্ছে। গা গুলিয়ে উঠছে। জাহাজে যেমন তার মাথা ঘুরছিল তার চেয়ে বেশি রকম অস্বস্তি হচ্ছে তার মুখের ভেতর।

বিমল থুথু ফেলতে গিয়ে দেখে থুথুর বদলে রক্ত পড়ছে মুখ দিয়ে।

রঞ্জু তাড়াতাড়ি তার দিকে এগিয়ে হঠাৎ চিৎকার করে বলল, তোর মুখের ভেতরটা এমন ফুলে উঠেছে কেন? হাত দিয়ে দেখত।

বিমল হাত চালিয়ে দেখল টিউমারের মত একটি মাংসপিণ্ড। নরম আঠালো।

সেটিকে ধরে টানতেই রক্তাক্ত টিউমারটি বেরিয়ে এল হাতের মধ্যে।

রঞ্জু চিৎকার করে উঠল, জোঁক। তোর মুখের ভেতর একটা জোঁক ঢুকে গিয়েছিল। আরে তোর পায়ের ভেতরেও তো অনেক জোঁক। রক্ত পড়ছে তোর পা দিয়ে। তুই কি পড়ে গিয়েছিলি?

রঞ্জু নীচু হয়ে বিমলের শরীর থেকে জোঁক বার করল। গোটা দশেক জোঁক।

বিমল যখন পড়ে যায় মাটিতে তখনই জোঁকগুলো ঢুকেছে।

জোঁক ছাড়ানোর পর রঞ্জুর দিকে তাকিয়ে হো হো করে হেসে উঠল বিমল। সে হাসিতে রঞ্জুও যোগ দিল।

বিমল, আর তোর ভয় নেই। রঞ্জু তাকে আশ্বাস দিল।

শীতের আয়ু ফুরোতে না ফুরোতেই দেখা দিল আবার বৃষ্টি। রাহাবাবু বলছিলেন, সারা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত চেরাপুঞ্জিতে হয় বলে তারা বোধহয় ডিগলিপুরের সন্ধান পায়নি।

বেশি বৃষ্টি হলেই সবচেয়ে মুশকিল হয়, এরিয়েল বে-র সঙ্গে ডিগলিপুর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কালপং নদীটা ফুলে ফেঁপে ওঠে। প্রথম দিকটায় পাহাড়ি নদীর সঙ্গে ওদের তেমন পরিচয় ছিল না। হয়তো এরিয়াল বে-তে সি কাননের জমিতে বাজার করতে গেছে। ফেরার সময় দেখে কালপং নদীতে ভীষণ স্রোত। তার মাঝে পার হতে গিয়ে ইতিমধ্যে দুজন খুব চোট পেয়েছে। এক ঝাপটায় মাটিতে ফেলে দিয়েছে ঢেউ। তারপর টেনে নিয়ে গিয়ে পাথরের নুড়ির মধ্যে ধাক্কা লাগিয়েছে।

কী ভাগ্যি প্রাণে মরেনি। তারপর থেকে বৃষ্টি পড়লে ওপারে অপেক্ষা করে সবাই। বৃষ্টি থামার পর ঢেউ স্তিমিত হয়ে এলে তখন হেঁটে নদী পার হয়।

ইতিমধ্যে তাদের জমি বন্টন শুরু হয়েছে। এখন জায়গার কোনও নাম হয়নি। সেটলমেন্টের ম্যাপের নম্বর অনুসারে এক একটি এলাকা ভাগ করা হয়েছে। ভবেশের জমি অ্যালট হল আট নম্বরে।

জমি বন্টনের দিন বিমলও সঙ্গে গিয়েছিল। তাদের ব্যারাক থেকে বেশিদূর নয়। ভবেশ শুধু পাটোয়ারিবাবুকে বলে রেখেছিল ছার, আমাদের দুভাই-এর জমি যেন পাশাপাশি থাকে।

দুভাই পাশাপাশিই জমি পেল। মাপামাপির ব্যাপার নেই। পাটোয়ারিবাবু ম্যাপ হাতে করে গিয়ে বললেন, ভবেশ মণ্ডল, তোমার জমি হল এইদিকে এই গাছ, আর একদিকে উ-ই গাছ। যাও গিয়ে চিহ্ন করে এসো।

ভবেশ গিয়ে খোঁটা পুঁতে এল।

রমেশকেও চারটে গাছ দেখিয়ে দেওয়া হল। তাও জমির মধ্যে বড় বড় প্যাডক গাছগুলি কেটে ফেলা হয়েছে। গাছের গোড়াগুলি পড়ে আছে। বড় গাছ এখন বেশি নেই। কিন্তু বিরাট ঝোপ জমি জুড়ে।

সীতানাথের সঙ্গে দেখা হল ভবেশের। খুব গজ গজ করছে সীতানাথ। তার জমিতে পাহাড়ই বেশি। ভবেশ বেশ প্লেন জমি পেয়েছে। ভাগ্যটাই খারাপ সীতানাথের। নয়তো বউটা এখানকার মাটিতে পা দিয়েই অমন মারা যাবে কেন?

সীতানাথের ধারণা তার বউকে ইচ্ছে করে ভুল ওষুধ দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। এখানে সবার আগে হাসপাতাল করা উচিত ছিল। সৈন্যরা যেখানে যায় আগে সেখানে হাসপাতাল হয়। অথচ কোনও কিছু ব্যবস্থা না করেই আগে থেকে এত রিফিউজিকে এখানে নিয়ে আসা হল।

সীতানাথের বক্তব্য, উদ্বাস্তুদের কেউ মানুষ বলে মনে করে না। আমি প্রতিবাদ করি বলেই আমার ওপর সরকারের রাগ।

আমার বউকে বিনা চিকিৎসায় মেরে ফেলল ওরা। আমাকে জমি দিল তাও পুরোটাই পাহাড়ি জমি।

ভবেশ বলল, তুমি রঞ্জুকে একবার কও না পরমেশ। রঞ্জু পাটোয়ারিবাবুকে বলে অনেকের জমিই পালটায়ে দেছে। সীতানাথ বলল, আমি কাউকে ধরাধরি করতে পারব না। এই যদি বিচার হয় তো হোক। ভবেশ এদিক থেকে তার ভাগ্যকে বার বার ধন্যবাদ দিল। রঞ্জু পাটোয়ারিবাবুকে বলে দেওয়ায় তারা দু ভাই বেশ ভালো জমিই পেয়েছে। ধানীজমিটা খুবই ভালো। কোথাও পাথর নেই। জঙ্গলও নেই তেমন।

পাহাড়ি জমিও পেয়েছে কাছাকাছি। ফরেস্টের লোক এসে গাছগুলি পুড়িয়ে দিয়ে গেছে। ডালগুলি নিষ্পত্র। তবে গুঁড়িগুলি দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু অন্যদের তুলনায় পাহাড়ি জমিতে বড় গাছ বেশি নেই এটাই রক্ষে।

জমি পাওয়ার পর সবাই অপেক্ষা করছে মরসুমের জন্য। আর মাস দুয়েকের মধ্যে আষাঢ় মাস পড়ে যাবে। এখন বৃষ্টি যথেষ্ট কম। রোদ্দুরের তেজও যথেষ্ট। দুপুরের দিকে ঘর থেকে বেরুনো যায় না। তাছাড়া বীজধান ও লাঙলের জন্য তারা অপেক্ষা করছে। কিন্তু রাহাবাবু বলেছেন, বীজ ধান শিগ্‌গিরই এসে পড়বে। কোদাল কুড়ুল কাটারি সব এসে গেছে। গোরু লাঙল কবে আসবে তা বলা যাচ্ছে না। তাই কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ে ধান ছিটিয়ে চাষ করতে হবে। রাহাবাবুর কথা হল, এখানকার জমি এমন উর্বরা যে তাতেই প্রচুর ধান হবে।

সেদিন সকালে উঠে ভবেশ রমেশকে নিয়ে জমি দেখতে বেরোচ্ছিল। বিমলকে দেখে বলল, তুইও আমার সঙ্গে চল।

গৌরী বলল, আবার ছেলেরে সকালে কোথায় নিয়া যাও।

জমিন দেখতে। দেখে শুনে নিক। আমি আর ক-টা দিন। এরপর উয়াকেই তো দ্যাখতে হবে সব কিছু।

গৌরী বলল, হ, তোমার তিন কাল গিয়া এক কালে ঠেকেছে কিনা।

কে কইতে পারে? মরণের কথা কি কিছু বলা যায়? সীতানাথের বউডা দ্যাখলে

না—কত বয়স হইছিল?

গৌরী বলে, দ্যাহো, যার যত পরমায়ু আছে সে ততদিন বাঁচবে। পরমায়ু কি আর কেউ নেতে পারে? সত্যি সীতানাথের বউডার জন্য কষ্ট হয়। জাহাজে আমারে খালি কইত—অ দিদি, আন্দামানে আমি যদি মরি আমার মাইয়াটার কী হইব?

ভবেশ বলল, সীতানাথের সঙ্গে কাল আমার দেখা হইছিল। মাথাডা খারাপ হয়ছা গ্যাছে মনে হল। একে বউডা মলো। তার ওপর জমি পাইছে অনেকদূরে। ওর ধারণা বউ-এর চিকিচ্ছা হয় নাই ঠিক মতো।

গৌরী বলল, সেডা হাতে পারে। জাহাজের ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে অত ওষুধপত্তর কোথায়? কলকাতায় হইলে বউডা মরত না এটা ঠিক।

ভবেশ বিমলকে বলল, কি যাবা নাকি আমার সাথে?

বিমল তো এক পায়ে খাড়া। কিন্তু মুশকিল শ্যামলটাকে নিয়ে। দাদা যেখানে যেতে চায় সেখানে যাবেই যাবে শ্যামল।

কিন্তু ব্যারাক থেকে জমির দূরত্ব প্রায় মাইল দুয়েক। ফিরতে ফিরতে রোদ্দুর চড়ে যাবে। এখন দুই ভাইয়ের কোনো বউই জমি দেখেনি।

সকাল থেকে উঠে রান্নাবান্না সারতেই কোথা থেকে সময় চলে যায় গৌরীর। ব্যারাকের একপাশেই একটা স্কুল হয়েছে। বাচ্চারা সেখানে দিনের বেলা পড়তে যায়। তাই সকাল সকাল ছেলের স্কুলের ভাত করে দিতে হয়।

মেয়েরা যেখানেই যাক না কেন, তাদের কপালে বিধাতা যেন বিশ্রাম লিখে দেননি।

সকাল সকাল বাড়ি থেকে বেরিয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে ওরা জমিতে চলে এল।

ভবেশ রমেশ ও বিমল তাদের জমির ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগল। বিমল সাবধান হয়ে গেছে। সে বলল, বাবা সাবধান, জোঁক আছে কিন্তু।

ভবেশ বলল, তা আর জানি না। কতবার জোঁকে ধরছে। টানিয়া বাইর করছি। আর কয়টা দিন সবুর করো, জোঁকের মুখে লবণ ছিটাচ্ছি। জোঁকের গুষ্টির তুষ্টি কইরা তবে আমার নাম।

রমেশ খানিকটা মাটি হাত খামচে তুলল। একদম পলি মাটি। বালি কাঁকর নাই। মাটির সঙ্গে কিছু ঘাসের চাপড়াও উঠে এসেছে। আঙুলে ভালো করে মাটি মাখতে মাখতে রমেশ বলল, দাদা দ্যাখো আমাগোর চরমুন্সির মাটি বলে মনে হয়। গন্ধ শুইক্যা দেখো ঠিক সেই সোঁদা গন্ধ। ভবেশ রমেশের হাত থেকে একটু মাটি নিয়ে তার নাকের নীচে ধরল। যেন গোলাপের গন্ধ নিচ্ছে সে। ছোটবেলা থেকে মাটির গন্ধ গায়ে শুঁকে শুঁকে সে বড় হয়ে উঠেছে। এই মাটির জন্যই তাদের জন্ম জন্মান্তরের লড়াই। প্রথম বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে তারা মাঠে নেমে পড়ত। লাইন দেওয়া নরম সন্দেশের মতো মাটির বুকে ছড়িয়ে দিত ধান। তারপর চারা একটু বড় হলেই বীজতলার ধান তুলে জল-কাদা মাখানো মাটির বুকে একটি একটি করে ধান রুইবার পালা।

তারপর ধান কাটার নিয়ম। শুকনো ফাটা মাটি যেন পাষাণের মতো কঠিন। সেই মাটিতে পা রাখা মানে যেন শিলার বুকেই পা রেখে চলা। সেই তখনই মনে হত ধরিত্রী যেন অবনত মস্তকে তাদের ধারণ করে আছেন। শুধু ধারণই নয়, পালন করে আসছেন তিনি। সোনাঝরা ধান ঝাড়াই হয়ে নিকোনো উঠোনে এসে পড়ছে। এরপর এই ধান গোলায় উঠবে।

মুহূর্তের মধ্যে চোখের সামনে এক সুখস্বপ্নের স্মৃতি ভেসে উঠল ভবেশের সামনে। আবার ভরন্ত গোলা। নিকোনো উঠোনে সোনার বরণ ধান এসে ছিটকে পড়ছে।

ভবেশ বলল, কাল থেকে জমির কাজে লাগতে হবে রমেশ, অনেক আগাছা সাফ করার লাগবে। কোদাল এসে যাবে কিছুদিনের মধ্যে। কাটারি তো আছে আমাদের। ব্যস, তাই নিয়ে লেগে পড়।

রমেশ বলল, দ্যাহো দ্যাহো দাদা এগুলান কী?

জঙ্গলের মধ্যে তেলাকচুর মতো লতানো গাছ হয়ে আছে। থোকা থোকা ফল। ঠিক তেলাকচুর মতো।

রমেশ বলল, তেলাকচুর মতো দেখায়। বুনো ফল কত কী আছে। নাম আর কে জানে? রাহাবাবু হয়তো জানেন। জিগাতে হবে কাল।

দুজনে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তাদের জমির দিকে। ঝোপঝাড়। কিছু বড় বড় গাছ। পোড়া গাছের ছাই সর্বত্র ছড়িয়ে আছে মাটির ওপর। কিচির মিচির করে পাখিরা ডেকে যাচ্ছে।

ভবেশের মনে পড়ে ফুলশয্যার রাতে তার নব পরিণীতা বধূর দিকেও এমন বিস্ময় আর ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল সে।

বিমল আপন মনে এগিয়ে গিয়েছে অনেক দূর। জমিতে কাদা। সারা পা কাদায় ভর্তি হয়ে গিয়েছে তার। সে গাছে গাছে তাকিয়ে দেখছে। সূর্যের আলো গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে এসে পড়ছে মাটিতে।

বিমলের মনে হল এর পাশের জমিটা ময়নাদের হলে খুব ভালো হত।

ময়নারা শখেরবাজারে এখন কোথায় কী করছে কে জানে? তাদের সঙ্গে যদি চলে আসত আন্দামানে তাহলে এখানে তারা এমন মুক্ত আকাশ, নদী মাঠ আর বন পেত। কলকাতায় তো তারা কিছুই পাবে না। ইঁট কাঠ আর মানুষের ভিড়ে খাঁচায় বন্দি পাখির মতো ময়না এর মধ্যেই হয়তো মাথা খুঁড়ছে।

বি-ম-ল।

ডাক শুনে বিমল পিছন ফিরে দেখল, তার বাবা চিৎকার করে ডাকছে। হঠাৎ তার পাশে ঝোপের ভেতর খসখস করে দ্রুত কি যেন একটা জন্তু বেরিয়ে গেল। বিমল দেখল, একটি বাচ্চা শুয়োর ছুটে চলে যাচ্ছে।

বিমল ছুটতে ছুটতে এসে বলল, বাবা একটা বুনো শুয়োর ছুটে গেল।

ভবেশ বলল, তোরে না কইছি, একা একা বেশি দূর যাইবা না। জঙ্গলের মধ্যে কোথায় কী আছে তুই কিছুই জানস না।

চলো, এবার আমরা ফিরব।

অনুকূল দাস, সুরেন ঘরামি, নটবর মিস্ত্রি শিবকৃষ্ণ ঘরামি সবাই জমি পেয়েছে। তবে প্রত্যেকের জমি ভবেশদের চেয়ে দূরে দূরে। এলাকা ভাগ করা হয়েছে নম্বর দিয়ে। এক নং, দু নং।

জমি বন্টন নিয়ে অনেকের মধ্যেই চাপা অসন্তোষ আছে। সীতানাথ তো যেখানে যাচ্ছে সেখানেই রঞ্জুর নামে অভিযোগ করছে। সে বলছে, পাটোয়ারির সঙ্গে যোগসাজশে রঞ্জুই খেয়ালখুশি মতো জমি বিলি করাচ্ছে। তবে জমি নিয়ে অসন্তোষ থাকলেও রঞ্জুর বিরুদ্ধে অসন্তোষ নেই! বরং সীতানাথের অভিযোগেই অনেকে অপ্রস্তুতে পড়ছে।

ভবেশের পাশের জমিটা কাউকে বিলি করা হয়নি। ওখানে সরকারি ফার্ম না কি হবে। তার পাশের জমি পেয়েছে রমেশ। রমেশের পরে নটবর মিস্ত্রির জমি। নটবরের জমির পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে ডিগলিপুরের নালাটি। ওই নালার একেবারে ধার ঘেঁষে পড়ল বিশু রায়-এর জমি। বিশু রায় ছিল বর্ধমানের পাল্লা ক্যাম্পে। ফরিদপুর জেলার লোক। চার ছেলে আর বউ নিয়ে এসেছে বিশু। ভবেশের সঙ্গে আলাপ জাহাজে।

শিবকৃষ্ণ ঘরামি জমি পেয়েছে তাদের থেকে অন্তত পাঁচ মাইল দূরে।

শিবকৃষ্ণের জমি দেখেনি ভবেশ, তবে শিবকৃষ্ণ বলল, জমি খারাপ না। কিন্তু চাষবাস আমার দ্বারা কতটুকু হবে জানি না। আমার মন পড়ে আছে সোনার কাজে। এখন ভাবি যন্ত্রপাতি কেন যে সব থুয়ে আলাম দেশে। দেখি পোর্টব্লেয়ারে গিয়া যদি কিছু যন্তর আনাতে পারি।

ভবেশ বলল, এখানে সোনার দোকান কি চলবে শিবু? সোনাদানা কিনবে কেডা? আমাদের এট্টা লোকের হাতে একশোডা টাহা নগদে আছে?

শিবকৃষ্ণ ঘরামি কিন্তু আশাবাদী। সে বলে আজ না হোক, একদিন চাহিদা হবেই। বাঙালি যেহানেই যাক সন্দেশ আর সোনা তার লাগবেই। বিয়ে শাদিতেই তো সোনা দেবে লোকে, নাকি কী কও?

ভবেশ বলে তা অবশ্যি দেবে।

তবে বোঝো। আজ না হোক কাল লোকের পেয়োজন হবেই। তোমারি একটা কথা বলি জামাই, জমি যদি চাষ করতি না পারি তাহলে তোমারে দে দেব। তুমি আমারে যেটুকু পারো ধান ধরি দিয়ো।

ভবেশ বলে আমি এত জমি কীভাবে সামাল দেব ভাবছি? এহানে মুনিষ নাই, কিষেণ নাই। পোলা দুটোও ছোট ছোট। মাঠের কাজ কেডা করবে সেডাই সমস্যা।

নটবর মিস্ত্রির খুব আপসোস তার বাবা মারা যাওয়ার জন্য। অন্তত আর ক-মাস যদি বুড়ো বেঁচে থাকত, বুড়োর নামেও আর এক খণ্ড জমি বার করে নিতে পারত নটবর।

ভবেশ বলল, নালাটা তোমার জমির মধ্যে পড়ছে। মহানন্দে মাছ মারতে পারবে নটবর।

নটবর হাসে। সে বলে নালা তো সাজার নালা। মাছ মারার ইচ্ছা হলি যে-খুশি মাছ মারতি পারে। ওই নালায় আমি মাছ পালব নাকি?

রঞ্জু জমি পেয়েছে ডিগলিপুরে তাদের ব্যারাকের কাছেই। রাহাবাবু বললেন, আপনারা মোটামুটি সবাই জমি পেয়েছেন। এবার জমিতে জঙ্গল কেটে চাষাবাদ শুরু করে দিন। আমি চাই এই বর্ষার মরসুমটা আপনারা আর নষ্ট করবেন না।

ভবেশ বলল, কিন্তু চাষ করা কি মুখের কথা ছার। লাঙল কোথায়? বলদই বা কোথায়? হারাধানবাবু বললেন, আপনাদের আগেই বলেছি হাল বলদ আসতে আসতে এই সিজনটা চলে যাবে। আমি লিখেছি গর্মেন্টকে। টেন্ডার হবে। মোষ কেনা হবে। সেই সব হাজার হাজার মোষ জাহাজে আসবে মেন ল্যান্ড থেকে। বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। আমি আবার কলকাতায় যাচ্ছি রিফিউজি আনতে। সেখান থেকে দিল্লি যাব। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী একটি রিপোর্ট চেয়েছেন। রিপোর্টটি আমি হাতে করে নিয়ে যাব। আমি যাবার আগে আপনাদের কোদাল দিয়ে যাচ্ছি। আমার কাছে কিছু সবজি আর ফলের বীজ আছে। বীজ ধানও এসে পড়েছে। এখানে জমি এত উর্বরা যে, কোনও রকমে মাটিতে বীজ ছিটিয়ে দিতে পারলেই ফসল হয়।

প্রত্যেক পরিবার কোদাল আর কুড়োল পেল। বীজও পেল সেই সঙ্গে। এখন আর কারও নিশ্বাস ফেলার সময় নেই।

বউরা সবাই মাঠের কাজে লেগে গেছে। রমেশের জমিতে রমেশ ও তার বউ এবং দুই মেয়ে কাজে লেগেছে। ভবেশের জমিতে গৌরী বিমল আর ভবেশ কাজে লেগেছে।

রাহাবাবু বলেছেন, নিজের জমি পরিষ্কার করলেও প্রত্যেক মাসে চল্লিশ টাকা করে মজুরি পাবে। এতে করে সমস্ত ব্যারাক সুদ্ধ ছেলেমেয়ে বয়স্করা সবাই জমি পরিষ্কারে লেগে পড়েছে।

কিন্তু কাজটা যত সোজা ভাবা গিয়েছিল তত সোজা মনে হল না। বিরাট বিরাট গাছ প্যাডক-পেমা করাত দিয়ে আগেভাগে সরকারি লোকজন কেটে ফেললেও

ছোট গাছ প্রচুর। এক একটা ঝোপের ভেতর ঢুকে কুড়াল চালানোই কঠিন। তার ওপর জোঁক। জোঁক থেকে আত্মরক্ষার জন্য তারা সারা গায়ে চুন মেখে নিয়েছে। এইভাবে এক মাসে এক কাঠার মতো জায়গা হয়তো পরিষ্কার করতে পেরেছে কেউ কেউ। যাদের জমি অনেকটা পরিষ্কার তারা সঙ্গে সঙ্গে মাটি খুঁড়ে ফেলেছে কোদাল দিয়ে। তারপর পুঁতে দিয়েছে শসা, ঢ্যাড়শ, বেগুন, কুমড়োর বীজ। বৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যে যেটুকু পেরেছে ধান ছিটিয়ে দিয়েছে।

আষাঢ় মাসের দিন। ভবেশের গোটা পরিবার কাজ করছে মাঠে। সকাল থেকে বৃষ্টি পড়ছে অঝোরে। বৃষ্টিকে আজকাল আর কেউ ভয় করে না। প্রচণ্ড বৃষ্টির সময় কোনও গাছের নিচে দাঁড়ায় হয়তো। পাতা দিয়ে টোকাও বানিয়ে নিয়েছে অনেকে। ভবেশের বউ জোরে বৃষ্টি আসায় তার ছোট ছেলেকে নিয়ে গাছতলায় দাঁড়িয়েছিল।

বিমল ও ভবেশ কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে চলেছে। বৃষ্টিতে মাটি নরম হয়ে ওঠে তুলোর মতো। বৃষ্টিতে অন্ধকার হয়ে উঠেছে সামনের দিকটা।

হঠাৎ ছোট ছেলের একটা চিৎকার শুনল ভবেশ। বাবা—ও বাবা।

ভবেশ তাড়াতাড়ি বিমলকে বলে শ্যামলের গলা না?

হ, তাই তো মনে হয়।

চল তো দেখি।

ওরা ছুটে গিয়ে দেখল গৌরী অজ্ঞানের মতো হয়ে গেছে।

শ্যামল বলল, মায়ে কেমন করে। আমায় কইল আমারে ধর। আমার কেমন লাগতেছে।

ভবেশ কী করবে ভেবে পেল না। গায়ে হাত দিয়ে দেখল এখনও জীবনের স্পন্দন রয়েছে। না, মারা যায়নি। কিন্তু ডাকলে সাড়া দিচ্ছে না। বেশ কিছুদিন ধরে এখানে জ্বর শুরু হয়েছে। দুটি বাচ্চা মারা গেছে এই জ্বরে। গায়ে হাত দিয়ে দেখল গা কিন্তু গরম নয়।

বৃষ্টিটা থেমে এসেছে। ভবেশ বিমলকে বলল, তুই কোদাল আর কাটারিগুলো লইয়া আয়। আমি তোর মাকে নিয়ে যাচ্ছি।

ভবেশ তার বউকে কাঁধে তুলল। খুব ভারী নয় বউ-এর দেহ। এর চেয়ে অনেক ভার সে বয়েছে। তারপর বৃষ্টি জল কাদা ভেঙ্গে সে ডিসপেনসারিতে নিয়ে এল তার বউকে।

কম্পাউন্ডারবাবু দেখলেন। একটু পরেই জ্ঞান ফিরে এসেছে গৌরীর।

পরে কম্পাউন্ডারবাবু বললেন, তোমার বলিহারি আক্কেল ভবেশ। পোয়াতি বউটাকে তুমি এই বৃষ্টির মধ্যে কাজ করাতে নিয়ে গেছ!

ভবেশের মুখে সলজ্জ হাসি হেসে গেল। সে অস্ফুট স্বরে বলে পোয়াতি? কন্ কী ডাক্তারবাবু।

দেখালে বটে। তোমার বউ পোয়াতি তুমি জানো না? দেখে তো মনে হয় তা অন্তত সাত-আট মাস হবে। এখন পুরো বিশ্রামে রাখো।

ভবেশের মনে মনে রাগ হল বউ-এর ওপর। মনে পড়ল বিমল যখন হয় তখন তার মা বেঁচে। বিয়ের পর বছর ঘুরতেই বিমলের জন্ম। সে সময় তার মায়ের কাছ থেকেই খবরটা পেয়েছিল ভবেশ।

বউকে বলেছিল, তুমি আমারে এই শুভ সংবাদটা দেলে না। মার কাছে থেকেই শোনতে হল।

বউ হেসে বলেছিল, যে সোয়ামী তার বউয়ের শরীলের গতিক লক্ষ্য রাখে না, তার মায়ের কাছ থেকে শোনাই ভালো।

সেবার তো মা ছিল। কিন্তু এখানে কে আর বলবে। আর তার যা বউ, কোনও দিন মুখ ফুটে নিজের কথা বলবে না।

সত্যি তারই খেয়াল করা উচিত ছিল। কিন্তু কুমারী মাটির গর্ভে প্রথম ফসল ফলাবার নেশায় সে এমন বুঁদ হয়ে ছিল এতদিন যে তার নিজের ফসল ঘরে তুলবারই সময় পায়নি। সে মনে মনে নমস্কার করল হরিচাঁদের উদ্দেশে—যিনি তাকে চরম বিপদের দিনে মনে সাহস জোগাচ্ছেন, এগিয়ে চলার প্রেরণা দিচ্ছেন।

হে বাবা ঠাকুর : তোমার অসীম দয়া। যে আসছে সে যেন বেঁচে থাকে। ডিগলিপুরের মাটিতে জন্ম নিচ্ছে ডিগলিপুরের প্রথম সন্তান। কোনও রক্ত ঝরা অতীতকে মাড়িয়ে সে ডিগলিপুরের ঘাটে জাহাজ ভেড়াচ্ছে না। ভাগ্য তাকে এমন কোনও বঞ্চনা করেনি। তাকে শিয়ালদা স্টেশন, রিফিউজি ক্যাম্পের ত্রাণের খাদ্য খেয়ে বেঁচে থাকতে হয়নি। সে আসছে ডিগলিপুরের মাটিতে প্রথম ফসল ফলার সঙ্গে সঙ্গেই। সতেজ সবুজ ফলের সম্ভাবনা সঙ্গে নিয়ে। ভবেশ মনে মনে হরিচাঁদ ঠাকুরকে স্মরণ করে বলল : তুমিই ভরসা।

মাস দুয়েকের মধ্যে ধানচারাগুলি মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। কুমড়ো গাছে ইতিমধ্যেই ফল ধরেছে। বেগুন, ঢেঁড়শ গাছেও ফলন দেখা দিয়েছে। কুমড়ো এখনও পুরুষ্টু হয়নি, কিন্তু এর মধ্যেই এক একটি ফুটবলের মতো হয়ে উঠেছে ফলগুলো।

কিন্তু ফসল ফলবার সঙ্গে সঙ্গেই হরিণ আর শুয়োরের উৎপাত দেখা দিল। অনেকেই এসে হায় হায় করে—হরিণে তাদের খেতের ফসল নষ্ট করে ফেলেছে। রাহাবাবু নেই। কলকাতায় চলে গেছেন। রঞ্জুকে এসে সবাই ধরেছে।

ডিগলিপুরের লোকেরা একমাত্র রঞ্জুকেই নেতা বলে মেনেছে তখন। তাদের ধারণা রঞ্জুকে বললেই সব কিছু মুশকিল আসান হয়ে যাবে।

রঞ্জু আমিনবাবুর সঙ্গে ফাইল নিয়ে ঘোরাঘুরি করে। অধিকাংশের অভিযোগ জমি নিয়ে। কারও ভাগে খারাপ জমি পড়েছে। রঞ্জুকে বললেই সে আমিনবাবুকে বলে পালটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে জমি।

যেমন গদাইচরণ মণ্ডল এসে বলে অ-রঞ্জু আমারে যে পাহাড়ি জমি দিছে সেডা

ধানজমি থিকা এক মাইল দূরে। সেডারে পালটাইয়া দিতে কও না পাটোয়ারিরে। আমি একা মানুষ, অমন দূরের জমি আমি কি চাষ করতে পারি?

রঞ্জু আশ্বাস দেয়, একটু ধৈর্য ধরো গদাইদা। আগে দেখা যাক কে কী রকম জমি পেয়েছে। সবার জমি দেওয়া শেষ হয়ে যাক আগে। তারপর ভাগ-বাঁটোয়ারা শুরু হবে।

আর সকলের মতো রঞ্জুও তার জমি সাফ করার কাজে হাত লাগায়। কিন্তু কাজটা যে কত কঠিন তা কাজে হাত লাগাবার আগে বুঝতে পারেনি রঞ্জু। সে এই বয়সে পরিশ্রমসাধ্য কাজ কম করেনি। কিন্তু সে সময় তাকে পরিশ্রমের কাজ করতে হয়েছিল নেহাতই বেঁচে থাকার জন্য।

রঞ্জুর মনে পড়ে বড়বাজারে থাকার সময় ঠেলাগাড়ি চালাবার অভিজ্ঞতা। জোরে না ঠেলতে পারলে ঠ্যালার মালিক চড়চাপড় মারত। কারণ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঠ্যালার মাল পৌঁছে দিতে হবে। আবার ট্রাফিক সিগন্যাল মানতে কোথাও ভুল হয়ে গেলে সার্জেন্ট এসে মারত হাতের ব্যাটন দিয়ে।

কিন্তু তার পরের কয়েক বছর সে পরিশ্রমসাধ্য কাজ বড় একটা করেনি। নেতৃত্ব দিয়ে বেড়িয়েছে। কিন্তু এতদিন পরে নিজের জমিতে এসে কাজ করতে গিয়ে রঞ্জু দেখল কাজটা সহজ নয়।

বনবিভাগ থেকে গাছগুলি পুড়িয়ে দিয়েছে। কিছু গাছ কেটেছে। এখন সেই পোড়া গাছগুলিকে গোড়া পেড়ে কাটতে হবে কুড়ুল দিয়ে।

তারপর কোদাল দিয়ে গর্ত করে গুঁড়ি সুদ্ধ তুলে গাছকে নির্মূল করতে হবে, তাছাড়া ছোট ছোট ঝোপগুলিও উপড়ে ফেলা দরকার। হাজার হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা এই আগাছা কি এত সহজে তোলা যায়? রঞ্জু ক-দিনের মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে উঠল।

প্রায় এক বিঘার মতো জায়গা পরিষ্কার করেছিল রঞ্জু। সেখানে কুপিয়ে ধান ছড়িয়ে দেওয়ার পর সে ঠিক করেছে সে নিজে আর চাষ করতে পারবে না। সে একটা দোকান দেবে। ডিগলিপুরের মানুষদের জন্য। মুদিখানা আর স্টেশনারির দোকান। তার চাষের জমি সে অন্য কোনও চাষিকে চাষ করতে দেবে। বিনিময়ে সে যদি কিছু ধান দেয় ভালো। না দিলেও ক্ষতি নেই। দুটো মাত্র তো পেট তাদের।

বিমলকে নিয়ে রঞ্জু ঘুরে বেড়ায় গ্রামে গ্রামে।

ভিজে মাটি থেকে উঠছে সোঁদা সোঁদা গন্ধ। প্রজাপতি ঘুরে বেড়াচ্ছে চারদিকে। ধান ছাড়াও কুমড়ো গাছে ইয়া বড় বড় গোটা দশেক কুমড়ো মাটির সঙ্গে মিশে রয়েছে।

রঞ্জু বলে, বিমল! রাহাবাবু ঠিকই বলেছিলেন। এখানকার মাটিতে সোনা আছে। আসলে কি জানিস, এতদিন ধরে এই জমিতে কোনও ফসল হয়নি। শুকনো পাতা জমে পচে পচে সার পেয়ে আপনা-আপনি জমি উর্বরা হয়ে আছে। আসলে

এখানকার অহল্যা মাটি রামচন্দ্রের জন্য অপেক্ষা করছিল। তার চরণস্পর্শে সে মৃত্যুশয্যা থেকে জেগে উঠেছে।

বিমল অনেক সময় বুঝতে পারে না রঞ্জুদাকে। রঞ্জুদা সব সময় যেন অন্যমনস্ক থাকে। কী চিন্তা করে। আসলে রঞ্জুদার মধ্যে সব সময় চিন্তা কীভাবে ডিগলিপুরে আবার নতুন করে বসতি গড়ে উঠবে। ডিগলিপুরের সমস্ত মানুষ খুশি হবে। রঞ্জুদা নিজে বড় ভালো। তাই সকলের ভালো চায়।

বিমলের ভালো লাগে ডিগলিপুরের উদার উন্মুক্ত আকাশকে। বৃষ্টির পর মাঝে মাঝেই আকাশ পরিষ্কার থাকে। সে সময় দিগন্ত জোড়া রামধনু ওঠে। আকাশের বুকে পেঁজা তুলোর মতো ছোট ছোট মেঘ ছড়িয়ে পড়ে। প্রজাপতি আর ফড়িং এরা কুমড়ো ফুলের মধু খাবার লোভে এসে জড়ো হয়।

হঠাৎ জমির দিকে তাকিয়ে বিমল বলল, রঞ্জুদা দ্যাখো দ্যাখো। রঞ্জু দেখল জমির ওপর এসে পড়েছে একপাল হরিণ। সংখ্যায় তারা গোটা পঞ্চাশেক হবে। ওদের দেখে উৎকর্ণ হয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে। আর ওই বিশাল হরিণের পাল তাদের জমি থেকে ফসল খেয়ে নিচ্ছে কুট কুট করে। বিমলের এই হরিণের পালকে তাড়ানো উচিত ছিল। কিন্তু তাড়াবে কি, মুগ্ধ বিস্ময়ে সে চেয়ে দেখছিল হরিণগুলোকে। এই নির্জন জনমানবশূন্য দ্বীপে ঈশ্বর কোথা থেকে তৈরি করে রেখেছিলেন জীবনের এই অফুরন্ত সম্ভার। কী সুন্দর দেখতে হরিণগুলিকে। গেরুয়া চামড়ার ওপর গায়ে সাদা রঙের ডোরা। বিরাট বিরাট বাঁকানো শিং। গভীর কালো টানা টানা চোখ।

হরিণগুলি তাদের দেখতে পেয়ে ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর কী মনে করে পিছন ফিরে দ্রুত পায়ে মিলিয়ে গেল গভীর অরণ্যের মধ্যে।

বিমল বলল, হরিণগুলো বড় জ্বালায় রঞ্জুদা। কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারো।

রঞ্জু বলে, আমি তো পালটা বলতে পারি বিমল। হরিণরা আমাদের জ্বালাচ্ছে না। আমরাই তাদের রাজ্যে এসে তাদের খাবারে ভাগ বসিয়েছি। সুতরাং কোনও দোষ নেই।

কিন্তু বিমল রঞ্জুর কথা মানতে পারে না। সে ছুটে চলে যায় তাদের জমির ওপর। অনেকগুলি জায়গায় হরিণের আক্রমণের ক্ষতচিহ্ন স্পষ্ট। সে মনে মনে ভাবে তার বাবা জানতে পারলে তাকে ভীষণ বকবে। অথচ এই চলমান সৌন্দর্যকে সে আজ যেমন প্রাণ ভরে উপভোগ করল, আগে তেমন কোনোদিন করেনি।

রঞ্জু বলল, এই ভাবেই আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। প্রকৃতির সঙ্গে শুধু লড়াই নয়, লড়াই প্রকৃতির সন্তানদের বিরুদ্ধেও। কারণ তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা, তাদের পরস্পরের খাবার অন্যে খেয়ে নিচ্ছে। মানুষ আর প্রকৃতির সন্তানদের সঙ্গে লড়াইয়ে মানুষই আবার জিতবে বিমল, একটু থেমে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আপনমনে যেন রঞ্জু বলে চলে—

কিন্তু আমি ভাবছি আমাদের এই জয় যেন অযথা অনর্থক রক্তপাতের মধ্যে

দিয়ে না হয়। তাহলে আমরাও বাঁচব না। এই দ্বীপে প্রাণীর সংখ্যা কমে গেলে গাছের সংখ্যা কমে গেলে, ফুল প্রজাপতি কমে গেলে এক রিক্ত শ্মশানভূমিতে পরিণত হবে। আমাদের সেজন্য সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। আমরা যেন অনর্থক একটা বিপত্তি থামাতে গিয়ে আর একটি বিপত্তি না বাধিয়ে বসি।

বিমল রঞ্জুদাকে একদম বুঝতে পারে না। রঞ্জুদার কথাও তার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকে। এত ভালো ভালো কথা তুমি কী করে শিখলে রঞ্জুদা, বিমল প্রশ্ন করে।

রঞ্জু বলে, রাহাবাবুর কাছ থেকে। এই মানুষটি শুধু চাকরি করার জন্য আন্দামানে আসেননি। নতুন সৃষ্টি গড়তে এসেছেন যেন। সৃষ্টিকর্তারে আমি দেখিনি, আমার কাছে রাহাবাবুই সৃষ্টিকর্তা। তাছাড়া আমি খবরের কাগজ পড়ি। তাতে খুব ভালো ভালো আর্টিকেল থাকে। ক্যাম্পে যখন ছিলাম তখন তো খবরের কাগজ পেতাম নিয়মিত। ডিগলিপুরে বসে কোথায় কাগজ পাবো। তবে জাহাজ আসছে খবর পেলেই এরিয়াল বে-তে চলে যাই। জাহাজের ক্যাপটেনদের কাছ থেকে কাগজ চেয়ে নিয়ে পড়ি।

বিমল বলে, তোমার লেখাপড়া করতে খুব ইচ্ছে করে রঞ্জুদা?

রঞ্জু বলে, খুব। আমার খুব ইচ্ছে করে আবার কলকাতা চলে যাই। কেউ যদি আমায় পড়াত আমি কলেজে পড়তাম। আমার উকিল হতে ইচ্ছে করে। জানিস, গান্ধিজি, মতিলাল নেহরু, জওহরলাল নেহরু সবাই উকিল না হয় ব্যারিস্টার ছিলেন। তোর পড়াশোনা করতে ইচ্ছে করে না?

বিমল জবাব দেয়, না। আমার একদম পড়তে ভালো লাগে না। ইস্কুলে যাবার চেয়ে মাঠের কাজ করা অনেক ভালো লাগে আমার কাছে। কী হইব পড়াশুনা কইরা?

রঞ্জু বলে, ও কথা বলিস না। ডিগলিপুরে আমি ইস্কুল বসাব। রাহাবাবুকে বলেছি। উনি সরকারকে লিখেছেন। সরকারের স্কিমও আছে সব গাঁয়ে ইস্কুল করার। মেন ল্যান্ড থেকে টিচার আসবে। দেখবি এই ডিগলিপুরের ছেলেরা ডাক্তার হচ্ছে, ইঞ্জিনিয়র হচ্ছে, হয়তো দিল্লিতে কেউ মন্ত্রীও হবে।

বিমলের মনে হয় রঞ্জুদা এক অলৌকিক গল্প শোনাল বুঝি। কোথায় সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে ডিগলিপুর। এখনও সেখানে জঙ্গলে ঢাকা। রাস্তাঘাট নেই। হাসপাতাল নেই, ইস্কুল নেই। শুধু জঙ্গলের মধ্যে কিছু মানুষ এসে বাস করছে। গ্রামের বদলে শুধু নম্বর দিয়ে বোঝানো সেটলমেন্ট। এক নম্বর, দু নম্বর, চার নম্বর। আর কোথায় দিল্লি!

বিমলদের জমিতে এসে জমি আর চিনতে পারে না রঞ্জু। অনেকখানি জায়গা জুড়ে বন কেটে চাষ হয়েছে। সতেজ সবুজ ধান ফুরফুরে হাওয়ায় মাথা দোলাচ্ছে।

এমন সময় হঠাৎ এক আর্ত চিৎকারে রঞ্জু আর বিমল চমকে উঠল। বাঁচাও-বাঁচাও—কে আছ? আমার সর্বনাশ হয়ে গেল—

মনে হচ্ছে বিশু রায়ের গলা। তাদের জমি থেকে তিন চারটে জমির পরেই

বিশু রায়দের জমি। একেবারে নালার ধার ঘেঁসে। কিন্তু প্রতিটি জমির মধ্যে গাছ থাকায় এক জমি থেকে আর একজনের জমি দেখা যায় না। তাছাড়া বিশুদের জমি একটু ভেতরের দিকে।

কিন্তু এই চিৎকার কেন? সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছিল। ভবেশ জমিতে ছিল না। রমেশ ছিল। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল।

রঞ্জুকে সামনে দেখে রমেশ বলল, রঞ্জু, কী ব্যাপার কও তো? বিশুর গলা বলে মনে হয়।

রঞ্জু বলল, বোধহয় বিশুদার কোনো বিপদ হয়েছে। চলো দেখে আসি।

চিৎকার শুনে আশেপাশের জমি থেকে আরও কিছু লোক ছুট দিল। গিয়ে দেখল আছাড়িপিছাড়ি করছে বিশু।

রঞ্জু জিজ্ঞাসা করে জানল, বিশুর ছোট ছেলে রবীন জলশৌচ করতে নালায় নেমেছিল, সঙ্গে সঙ্গে কুমির তাকে এসে ধরে। ছেলের চিৎকার শুনে বিশু তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে দেখে প্রকাণ্ড একটা কুমির বিশুর ছেলেকে মুখে করে নিয়ে জলের ভেতর চলে যাচ্ছে, নিমেষের মধ্যে জলের ভেতর কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল কুমিরটা।

ওরা তাড়াতাড়ি নালার পাড়ে গিয়ে দেখল খালের ভেতর কুমিরের কোনো চিহ্ন নেই। বড় জোর বিশ ফুট খালটি। ঘোলা জল। নিস্তরঙ্গ। নিথর। কিন্তু কোথায় বিশু রায়ের ছেলে?

বিমলের খুব খারাপ লাগল। তার বয়সি ছেলেটি। তবে জন্মের পর থেকে একটা পা একটু ছোট ছিল। জোরে ছোটাছুটি করতে পারত না। বাবার সঙ্গে সমানে চাষের কাজে সাহায্য করত।

বিশু বলল, ওই নালায় কুমির আছে বলে শুনেছে অনেকের কাছে। কিন্তু সে কোনো দিন দেখেনি। তবু পারতপক্ষে সে নালার দিকে যেত না। কিন্তু ছেলেকে বারণ করতে ভুলে গিয়েছিল সে।

মুহূর্তের মধ্যে ব্যারাকের সমস্ত মানুষ ভেঙে পড়ল বিশু রায়ের প্লটে। খবর পেয়ে তার স্ত্রীও এসেছে। শোকে উন্মাদ হয়ে গেছে সে।

ভবেশ, রমেশ, সুরেন ঘরামি, শিবকৃষ্ণ ঘরামি রঞ্জন সবাই মিলে মশাল জ্বালিয়ে নালা ধরে এগিয়ে চলল কিছু দূর। ওরা শুনেছিল নীচে অর্থাৎ সমুদ্রের দিকেই কুমিরেরা বেশি থাকে। নালাটি যত সমুদ্রের দিকে যাচ্ছে তত বেশি চওড়া হচ্ছে। মানুষের আওয়াজ পেয়ে ঝুপ ঝুপ করে দু তিনটি কুমীর পাড় থেকে জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে মিলিয়ে গেল। একটু দূরে গিয়ে দেখতে পেল জলের ওপর একটি জামা ভাসছে।

বিশু ককিয়ে কেঁদে উঠল। তার ছেলের জামাপ্যান্ট। রানাঘাট বাজার থেকে পুজোর সময় কিনে দিয়েছিল।

আর ওরা এগুতে পারল না। গভীর জঙ্গলের মধ্যে আর যাবার রাস্তা নেই।

গৌরীর শরীরের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হয়ে পড়ল। আজকাল সে বেশি হাঁটা-চলা করতে পারে না। বিমল এখন মায়ের কাছাকাছি থাকে বেশিরভাগ সময়। ইদানীং বিমলের কাকিমা রমেশের বউই একসঙ্গে রান্নাবান্না করছে।

দশমাসের পোয়াতি। পেটটা জালার মতো ফুলে উঠেছে। পা ফুলে গিয়েছে।

আপন মনে চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদে গৌরী।

বিমল বলে, ওমা কান্দো ক্যান? ও মা।

গৌরী বিমলকে জড়িয়ে ধরে বলে, বিমল, আমি যদি মইরা যাই তোর ভাইডারে দেখিস।

বিমল বলে, তুমি এসব ভাবনা ছাড়ান দাও। জল খাবা? ও মা।

জল? দে। আজকাল আর কিছু খাইতে ইচ্ছা করে না।

তা সত্যি। গৌরীর খাওয়াও কমে গেছে। যে কটা ভাত তাকে রমেশের বউ দেয়, তার অর্ধেকটাই পাতে পড়ে থাকে।

রমেশের বউ বলে, ও দিদি এইটুকখানি খেলে বাঁচবা ক্যামনে? যেডা আসতেছে তারেও তো দেখতে হবে। আর একডু ডাইল দেই।

না।

তাহলে সমুদ্দুরের ইলিশ মাছ দেই একডু। তোমার দেওর নিয়া আয়েছিল। তা আমাগোর পদ্মার ইলিশের কাছে কি লাগে। তোমায় দেই একডু।

নারে। আমার কিছু লাগবে না! ভীষণ অরুচি মুখে। বিমল আছিস নাকি?

বিমল বলে, কিছু বলতিছ মা?

কলম্বাক লেবুর পাতা পাওয়া যায় এহানে কোথাও? দ্যাশে বইয়া পান্তা ভাত দিয়া কত খাইছি। তা না হইলে যদি তেঁতুল পাস তো দেখিস।

রমেশের বউ বলে পোড়া কপাল, এহানে লেবুগাছ কোথায় পাবা?

রঞ্জু দেখতে আসে মাঝে মাঝে।

কেমন আছ বউদি।

গৌরী সলজ্জভাবে কাপড় জড়িয়ে শুয়ে থাকে। একটু ম্লান হাসে।

রঞ্জু ভবেশকে বলে, অবস্থা তো ভালো দেখছি না ভবেশদা। একটা ভালোমতো ডাক্তার যদি দেখানো যেত তাহলে খুব ভালো হত।

ভবেশ বলে, এহানে ডাক্তার কোহানে পাব। থাকার মধ্যে আছে শুধু কম্পাউন্ডার। তা তিনিই যা বড়ি টড়ি দেচ্ছেন খাওয়াচ্ছি।

উনি কী বলছেন?

কী আর বলবেন। ভগবান ভরসা এখন। ভাবলাম আর একটা বাচ্চা আসতাছে। তারে নিয়া কত ফুর্তি করব। তা এহন দেখতাছি পোয়াতিরে নিয়াই যমে-মাইনষে টানাটানি। ওরে কোনও রকমে যদি পোলোটবেয়ারে নিয়া যাওয়া যায়। শুনতাছি কাল একটা জাহাজ আসতাছে।

হ্যাঁ, বিকাশবাবু আসছেন। উনি এখানকার চার্জ নেচ্ছেন। সি এ বাবু হয়ে আসছেন। দেখি তাঁরে ধরে করে যদি ওই জাহাজে পোর্টব্লেয়ার নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু আপনাদের একজনকে তো যেতে হবে। খেতের কাজ ফেলে রেখে এই সময়—

ভবেশ বলল, বউডাই যদি মরে যায় তাহলে আর খেত-খামার করে কী হবে রঞ্জু।

না, না ও কথা বলবেন না। আপনার দু-দুটো ছেলে আছে। তাদের কথা ভাবতে হবে। তাছাড়া অত চিন্তা করবেন না। আমি দেখছি।

এরিয়াল বে-তে গিয়ে পরদিন সকালবেলা দাঁড়িয়ে থাকল রঞ্জু। জাহাজ এসে পৌঁছোল এগারটা নাগাদ। জাহাজে প্রচুর মাল আছে। উদ্বাস্তুদের সমস্ত সাপ্লাই আসছে পোর্টব্লেয়ার থেকে। ডিঙি থেকে নামতেই রঞ্জু তাকে অভ্যর্থনা জানাল : নমস্কার বিকাশদা।

আরে রঞ্জু তুমি এখানে?

আপনি আসবেন খবর পেয়ে অভ্যর্থনা জানাতে এলাম।

তুমি জানতে?

আমি কাল শুনলাম আপনি আসছেন। খুব ভালো হল বিকাশদা। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য।

বিকাশ পাজামা পাঞ্জাবি পরে এসেছে। জাহাজে এটি পরেই ছিল। প্রায় আট মাস পরে বিকাশকে দেখছে রঞ্জু। একটু যেন স্বাস্থ্যটা ভালো হয়েছে বিকাশের। তবে হাসিটা ঠিক সেইরকমই আছে। সুন্দর নায়ক-নায়ক চেহারা।

বিকাশ বলল, তারপর তোমাদের এখানকার খবর বলো।

ভালোই। আপনি যখন থাকবেন তখন সব জানবেন।

সবাই ভালো আছে? তোমার বন্ধু সেই সীতানাথবাবু কী করছে? ওর অভিযোগের শেষ নেই। প্রতি জাহাজেই কিন্তু তার একটা না একটা কমপ্লেন লেগেই আছে।

রঞ্জু হাসল।

রঞ্জু বলল, আপনার মালপত্র?

পরের ডিঙিতে কুলিরা নামিয়ে আনছে। আমার সঙ্গে তো এক জাহাজ মালপত্র আছে।

মালের বদলে যদি এক জাহাজ গোরু মোষ আনতে পারতেন তাহলে সবচেয়ে ভালো হত।

বুঝতে পারছি গোরুর অভাবে চাষের ক্ষতি হচ্ছে। সাধনদা আবার চিঠি লিখেছেন।

কেমন আছেন সাধনদা।

খুব ভালো।

এদিকে আসবেন না?

পরের মাসে রিফিউজি নিয়ে আবার আসছেন। কেন আমাকে তোমাদের পছন্দ নয়?

রঞ্জু লজ্জিত হয়ে বলল, বাঃ, আমি কি তাই বলেছি?

বিকাশ পকেট থেকে সিগারেট বার করে একটি নিজে ধরাল। একটি রঞ্জুকে অফার করতেই সে বলল, আমার চলে না।

বিকাশের মনে পড়ে গেল। সে অপ্রস্তুত হয়ে বলল, ও হ্যাঁ, তোমার তো আবার এসব চলে না।

আমি চা পর্যন্ত খাই না।

কী ভাবে এই দ্বীপে বেঁচে আছ? হাসতে হাসতে বিকাশ বলল।

বেঁচে আছি শুধু নয়, বহাল তবিয়তে বেঁচে আছি।

একটু এগিয়ে কাননের দোকান।

কানন বেরিয়ে এসে হিন্দিতে বলল, নমস্কার চক্রবর্তী সাহেব।

নমস্কার।

বসুন। বসুন। আপনি এখানে বদলি হয়ে আসছেন শুনেছিলাম। আপনি এলেন, আমরাও একটু বল পেলাম।

তোমার দোকান কেমন চলছে?

আপনাদের আশীর্বাদে ভালোই। তবে মালপত্র বোঝেন তো সব সময় থাকে না। আপনারা পোর্টব্লেয়ার থেকে মাল না পাঠালে তো আর মাল পাই না।

রঞ্জু বলল, সারা ডিগলিপুরে এই একটিমাত্র দোকান। লোকজনের খুব অসুবিধে হচ্ছে বিকাশদা। ডিগলিপুরের লোকদের দশ মাইল হেঁটে এসে মাল কিনে নিয়ে যেতে হয়। ডিগলিপুরে একটা বাজার দোকানপাট না হলে চলছে না।

বিকাশ বলে, তা বেশ তো তুমি একটা দোকান দাও না।

আমি? রঞ্জু হেসে বলল, আমি টাকা কোথায় পাব? তাছাড়া ব্যবসা আমার দ্বারা হবে না।

কানন বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ চক্রবর্তীবাবু ঠিক বলেছেন। তুমি দোকান করো রঞ্জুবাবু। আমার কাছ থেকে মাল নিয়ে যাবে। বেচে দাম দেবে। তারপর আবার মাল নেবে। এতে ডিগলিপুরের লোকদের আর এতদূর আসতে হবে না।

রঞ্জু বলল, সিরিয়াসলি এটা ভাবিনি। দেখছি কী করা যায়।

রঞ্জু ভাবল, আইডিয়াটি মন্দ নয়। চাষবাস তার দ্বারা হবে না কোনও দিনও। সে তো চাষির ছেলে নয়। বদ্যির ছেলে। জমি যদিও সে পেয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্য লোককে চাষ করতে দিয়েছে। সে সমাজসেবা করবে, না জমি চাষ করবে।

গৌরীর চিকিৎসার ব্যাপারটি তার মাথায় আছে। জাহাজ থেকে মাল নামাতে এখনও দেরি আছে। কানন ও রঞ্জুর জন্য চা আনিয়ে দিল।

চা খেতে খেতে বিকাশ বলল, ওহো রঞ্জু, একদম ভুলে গিয়েছি। রাহাবাবু তোমাকে একটা চিঠি দিয়েছেন।

কই চিঠিটা দিন।

তার ব্যাগ থেকে চিঠিটা বার করল। আন্দামান সরকারের প্যাডে লেখা। বাংলায় কয়েকছত্র চিঠি—

প্রিয় সুধীরঞ্জন,

বিকাশ ক্যাম্প অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে ডিগলিপুর যাচ্ছে। তাকে তোমরা সাহায্য কোরো। তোমার কথা চিফ কমিশনারকে বলেছি। তিনি তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চান। তোমার সময় ও সুযোগ মতো পোর্টব্লেয়ার এলে আমি আলাপ করিয়ে দেব। যে কোনো জাহাজ ধরে চলে আসতে পারো। পোর্টব্লেয়ারে আমার বাড়িতেই উঠবে। ইতি—

রঞ্জু বলল রাহাদা একবার পোর্টব্লেয়ার যেতে লিখেছেন। আচ্ছা বিকাশদা, এই জাহাজটা কবে ছাড়বে?

যা মালপত্তর আছে নামাতে সময় লাগবে। মনে হয় পরশু সকালে। কেন তুমি যাবে?

আমি না হয় পরেও যেতে পারি। কিন্তু আমি একজন রোগী নিয়ে যেতে চাই। ভবেশ মণ্ডলের বউ। দশ মাসের পোয়াতি। কিন্তু অবস্থা খুব খারাপ। হাসপাতালে না দেখালে হয়তো বাঁচবে না। আপনি একটু বলে দেবেন ক্যাপটেনকে।

তা বলতে পারি। কিন্তু পেশেন্ট নিয়ে যাওয়া না যাওয়া তার মর্জি। এ ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই। শুধু তোমারটা আমি জোর করে বলতে পারি। কেননা, হারাধনদাই তোমাকে সরকারি কাজে ডেকেছেন।

কিন্তু আমি একা গিয়ে কী করব। আপনি একটু বলে দেখুন না। কিন্তু জাহাজ তো ছাড়বে পরশু। আপনার জাহাজে ডাক্তার আছেন?

হ্যাঁ ডাক্তার ঘোষ।

তিনি একবার ডিগলিপুর এসে পেশেন্ট দেখে যেতে পারেন?

চলো আমি তোমায় জাহাজে নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু ওই যে বললাম, জাহাজের ওপর আমার কোনও হাত নেই।

আবার আপনি জাহাজে যাবেন?

তোমার জন্য যাব। চলো উঠি।

আবার একটা ডিঙি করে দুজনে মিলে জাহাজে উঠল। জাহাজে এক দিক দিয়ে মাল নামানোর তোড়জোড় চলছে।

বিকাশ ডেকে উঠে একজন নাবিককে বলল, ক্যাপটেন মুখার্জি কোথায়?

সে বলল, ক্যাবিনে আছেন।

কেবিনের দিকে যেতে একজন অল্প বয়সি যুবক এসে বলল, আপনি এখনও নামেননি?

নেমে গিয়েছিলাম। আবার উঠতে হল। ডা. ঘোষ. আপনাকেই খুঁজছিলাম।

এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। এর নাম সুধীরঞ্জন দাস। আমরা রঞ্জু বলে ডাকি। এদের একটা প্রবলেম হয়েছে।

ডা. ঘোষ বললেন, কী প্রবলেম?

রঞ্জু বলল, একজন প্রেগন্যান্ট পেশেন্টের অবস্থা খুব খারাপ। তাকে পোর্টব্লেয়ার যদি নিয়ে যেতে দেন।

ডা. ঘোষ বললেন, একদম সম্ভব নয়। জাহাজে চিফ কমিশনারের পারমিশন ছাড়া কোনও পেশেন্ট আমরা ক্যারি করতে পারি না। তার ওপর মহিলা পেশেন্ট। অ্যাডভান্স স্টেজ। আমাদের সঙ্গে কোনও ফিমেল নার্স নেই। একটা কিছু হয়ে গেলে আমার চাকরি চলে যাবে। প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড।

রঞ্জু একটু দমে গিয়ে বলল, তাহলে আপনি দয়া করে ডিগলিপুর চলুন, পেশেন্টকে একবার দেখে আসবেন। ওঁরা খুব উতলা হয়ে আছেন। আমি কথা দিয়েছিলাম আপনাকে নিয়ে যাব।

ডাক্তার ঘোষ বললেন, অসম্ভব। আমার জাহাজের বাইরে গিয়ে রোগী দেখার পারমিশন নেই। আপনারা বরং পেশেন্টকে এরিয়েল বে-তে নিয়ে আসুন।

রঞ্জু বলেছিল, সে কি করে হয় ডাক্তার ঘোষ। দশ মাসের পোয়াতি। তার ওপর অ্যানিমিক পেশেন্ট।

কিন্তু আমার পক্ষে দশ কিলোমিটার হাঁটা সম্ভব নয়। রাস্তাঘাটও খারাপ। আজ গেলে তো ফিরতে পারব না। কাল সকালে সেইলিং ডেট।

আমি তো হেঁটেই যাতায়াত করছি।

ডাক্তার ঘোষ বিরক্ত হয়ে বললেন, দ্যাটস ইয়োর বিজনেস। আমার কাজ জাহাজের ভেতর। জাহাজের বাইরে গিয়ে পেশেন্ট দেখার আমার পারমিশন নেই।

ডা. ঘোষকে কিছুতেই রাজি করা গেল না।

বিকাশ বেশ অপ্রস্তুতে পড়ে গেল। সে জাহাজ থেকে নেমে বলল, আমি খুব দুঃখিত রঞ্জু। তুমি যদি যেতে চাও তাহলে ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

রঞ্জু বলল, এই জাহাজে যাব না বিকাশদা। আপনার কোনও দোষ নেই। কিন্তু আপনি ভেবে দেখুন, গভর্নমেন্টের কি উচিত ছিল না প্রথমেই একটা হাসপাতাল তৈরি করা? দু-একজন ভালো ডাক্তারের ব্যবস্থা রাখা?

বিকাশ বলল, আমরা গভর্নমেন্টকে এবার লিখেছি। আসলে আন্দামানের হয়ে দিল্লিতে বলার লোক নেই। একদিন তোমরাই জনপ্রতিনিধি হবে। তখন এসব কথা যথাস্থানে তুলবে। আমরা সামান্য চাকুরে। আমাদের কথার কী মূল্য আছে বলো। তোমার মতো আমিও আদর্শের জন্য আন্দামানে কাজ নিয়ে চলে এসেছিলাম। কিন্তু গভর্নমেন্টের সদিচ্ছা যে নেই তা বলব না। কিন্তু কেন জানি না। সিস্টেমটার মধ্যেই যেন একটা গণ্ডগোল। যা ভাবছি, করতে চাইছি করতে পারছি না। আবার ভাবি কিছুটা তো পারছি। বাইরে থাকলে তাও পারতাম না।

কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে বিকাশের সঙ্গে হেঁটে আসছিল রঞ্জু।

বিকাশ বলল, আমাকে একটু সময় দাও রঞ্জু। আমি দেখি তোমাদের কিছু উপকারে লাগতে পারি কি না। আর সবাই ধৈর্য হারায় হারাক, তুমি যেন ধৈর্য হারিয়ো না। তোমার ওপর আমার ও সাধনদার ভরসা অনেক।

রঞ্জু শুধু বলল, কিন্তু আপনি দেখবেন যাদের উপকারের জন্য আপনারা এত পরিশ্রম করছেন সেটা যেন তাদের উপকারে লাগে।

রঞ্জু এসে ভবেশকে খবরটা দিতেই ভবেশ একটু মুষড়ে পড়ল। তারপর বলল, কিন্তু তুমি পোর্টব্লেয়ার যাইবানা ক্যান রঞ্জু? রাহাবাবু যখন ডাকছেন, তহন নিশ্চয়ই কোনও কাজ কামের কথা আছে। তুমি শোনো, সকালের জাহাজেই চইলা যাও। তুমি গিয়া চিফ কমিশনারেরে বলো ডাক্তারের কথা।

রঞ্জু বলল, কিন্তু তোমাদের এই অবস্থায় কী করে ফেলে যাই বলতো ভবেশদা।

তুমি না, যাইয়াই বা করবা কী? ডাক্তার তো আর পামু না।

রঞ্জু অবশেষে যেতে রাজি হল। কোথা থেকে খবর পেয়ে ছুটতে ছুটতে এল শিবকৃষ্ণ ঘরামি।

রঞ্জু আমারে নে চলো।

কোথায়?

পোর্টব্লেয়ারে। আমি দেখি যদি স্বর্ণকারের যন্ত্রপাতি কিছু জোগাড় করতি পারি।

রঞ্জু বলল, দ্যাখো শিবুদা, পোর্টব্লেয়ারে গিয়ে আমি কিন্তু তোমার থাকা খাওয়ার দায়িত্ব নিতে পারব না।

শিবকৃষ্ণ উত্তর দিল, ঠিক আছে। সে আমি একটা আচ্ছয় বার করে নেবানে। তোমারে দেখতে হবেনানে। শুধু আমায় তোমার সঙ্গে ফিরায়ে নিয়ে আসবা। বউ ছেলেরে ফেলায়ে থুয়ে গ্যালাম।

ভবেশ এসেছিল এরিয়াল বে'তে। ওদের তুলে দিতে।

যাবার সময় বলল, ডাক্তারের কথাডা মেনে রেখো রঞ্জু।

যতক্ষণ ওদের ডিঙি অনেক দূরে নোঙর করা জাহাজের দিকে মিলিয়ে না গেল ততক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকল ভবেশ। রঞ্জু কবে ফিরবে তা জানে না, হয়তো আরও এক মাস লেগে যাবে। ততদিনে ভবেশের সন্তান হয়তো ভূমিষ্ঠ হয়ে যাবে।

দু একজনের কেনাকাটার ফরমাশ ছিল। কাননের দোকান ছাড়া ডিগলিপুরে কোনও দোকান নেই। জাহাজ এসেছে যখন দোকানে মালপত্তরও এসেছে। বাচ্চা হবার সব ব্যবস্থা করে রাখতে হবে। দোকান থেকে মাটির হাঁড়ি সরা একটি নতুন কাপড়, এক প্যাকেট বিস্কুট কিনে নিল ভবেশ। তছাড়া তেল নুন ডাল কেনারও ফরমাশ আছে। বেশ ভারী হয়ে গেল বোঝাটা। এতটা পথ এখন হেঁটে যেতে হবে এই ভারী বোঝা নিয়ে!

যাবার পথে কেরলাপুরমে নারায়ণনের সঙ্গে দেখা করে এল। নারায়ণন বলল, অনেকদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা। খবরটবর কী? জমি পেয়েছ?

ভবেশ বলল, হ্যাঁ। জমি পাওয়া শুধু নয়, আউশ ধান কাটার সময়ও হয়ে এল।

নারায়ণন বলল, তোমাদের ওখানে একজনকে নাকি কুমিরে নিয়ে গেছে? সেদিন দোকানে কে বলল কথাটা।

হ্যাঁ ভাই আর বোলো না। খুব খারাপ লাগছে, আমারই ছেলের বয়সি। বডি আর পাওয়া গেল না।

কুমিরের উৎপাত এখানে ভীষণ। আমাদের গ্রামের কাছাকাছি অবশ্য নালা নেই। তবু সমুদ্দুরের ব্যাক ওয়াটারের কাছে গেলে আমরা একটু সাবধান হয়ে যাই। আমি মাছ মারার সময় অনেক কুমির দেখেছি।

ভবেশ তারপর জানাল তার বউয়ের পোয়াতি অবস্থার কথা। সব শুনে নাবায়ণন বলল, খুব ভালো খবর। অত চিন্তা কোরো না ভবেশ। তোমার দু ছেলে জন্মেছে কোথায়?

আমার গ্রামে।

হাসপাতাল, ডাক্তার এসব করাতে হয়েছিল?

না। বাড়িতে আঁতুড় ঘরে হয়েছিল। দাই এসে নাড়ি কাটে।

তবে তাতে তো কোনও অসুবিধা হয়নি। কম্পাউন্ডার অজিতবাবু আছেন, ডাক্তারের বাবা। খুব পাকা লোক। কোনও ভয় পেয়ো না। আমার বাচ্চাও এই ভাবে হবে।

তোমার বউয়ের বাচ্চা হবে নাকি?

হ্যাঁ। তুমি সুখবর দিলে যখন তোমাকেও সুখবর দেই। আমার বউ তিনমাসের পোয়াতি। এই প্রথম সন্তান হচ্ছে আমাদের। আমি তো আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। জানো। আমি ঠিকই করে ফেলেছি আমাদের সন্তান ছেলে মেয়ে যাই হোক না কেন, তাকে আমরা ডাক্তার করব। আর সে ডাক্তারি করবে এই ডিগলিপুরেই। এখানে ডাক্তার না থাকায় এত অসুবিধে সে তো আমি বুঝতে পারছি।

নারায়ণনের সঙ্গে কথা বলে বুকে বল আসে ভবেশের। নারায়ণনের বউ পোয়াতি অবস্থায় খুব সুস্থই আছে। সলজ্জ দৃষ্টিতে বেশ ভালো করে গায়ে কাপড় জড়িয়ে সে এসে নমস্কার করল।

আচ্ছা হ্যায় ভাবিজি?

নারায়ণনের বউ হেসে বলে আচ্ছা হ্যায়। আপকা খবর সব ঠিকঠাক হ্যায়?

নেহি হ্যায়।

কিঁউ কুছ গড়বড় হুয়া?

নারায়ণন মালায়লম ভাষায় বউকে জানায় আম্মার বাচ্চা হবে। শুনে নারায়ণনের বউ বলে সাচ? তাহলে তো খুব ভালো হল।

ঝির ঝির করে বৃষ্টি এসে গেল। ভবেশ আকাশের দিকে চেয়ে আশঙ্কিত হল। এই তো কিছুক্ষণ আগে রোদ্দুর ছিল। ভবেশ মনে মনে একটা খিস্তি দিল ভগবানকে হঠাৎ এই বৃষ্টির জন্য। বৃষ্টি থামতে পিছল রাস্তা দিয়ে সন্তর্পণে জোর কদমে হেঁটে এগিয়ে যেতে লাগল ভবেশ। জঙ্গলের মধ্যে পাখির কিচিরমিচির শুরু হয়েছে। এছাড়া নিস্তব্ধ বনপথ। ভবেশের মনে হল সে যেন তাদের চরমুন্সী গ্রামে আশ শ্যাওড়া আর ভাঁটফুলের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হাঁটছে। এই মাত্র হয়তো বউ-কথা-কও পাখি ডেকে উঠবে। কালকাসুন্দি গাছের হলুদ ফুল যেন থোকা থোকা ফুটে আছে কোথাও। বর্ষার জলে গাছগুলো ভিজে থাকার পর টপটপ করে মুক্তোর মতো জল ঝরে। এখানেও গাছগুলি থেকে সেই রকম টপটপ করে জল ঝরছে।

হঠাৎ সামনে দিয়ে ঘোঁতঘোঁত করতে করতে একদল বুনো শুয়োর ছুটে পালিয়ে গেল।

বেশ ভয় ভয় করছে ভবেশের। সে পাশের গাছ থেকে একটি লাঠি ভেঙে নিল। হাতের লাঠিটা মুঠো করে ধরে সে মনে মনে বলল, হেই ঠাকুর. হেই শিব, অপরাধ নিয়ো না। যদি তোমা গালাগাল দিয়া থাকি রাগের বশে মনে কিছু কোরো না। তুমি তো জানো আমার মাথার ঠিক নেই। হেই বাবা ঠাকুর। হেই বাবা হরিচাঁদ ঠাকুর।

এই ঘটনার দিন দশেক পরে ভবেশ ও রমেশ যখন ধান কাটছে সে সময় বিমল এসে ছুটতে ছুটতে খবর দিল। বাবা তাড়াতাড়ি বাড়ি এসো। মা কেমন করছে।

ধান কাটার সময় রমেশ ও ভবেশ দুজনের জমির ধানই দুজনে এক সঙ্গে হাত লাগিয়ে কাটবে ঠিক করেছিল। ভাদ্র শেষ হতে চলেছে। প্রচুর ধান হয়েছে। অথচ বিঘে দুয়েক জমিতে মাত্র চাষ করতে পেরেছে ওরা। এই ধানকাটা কবে শেষ করতে পারবে কে জানে। ভবেশের জমির ধান কাটা হয়ে গেলে রমেশের জমির ধান কাটা আছে।

দুজনে মিলে ছুট লাগাল। যাবার আগে আজ অবস্থা ভালো ছিল না গৌরীর। ভবেশ কম্পাউন্ডারবাবুকে খবর দিয়ে গিয়েছিল। সে রকম খবর পেলে তিনি নিজেই চলে আসবেন।

ভবেশ তাড়াতাড়ি ফিরে দেখল যা ভেবেছিল তাই গৌরীর প্রসব বেদনা উঠেছে। রঞ্জুর মা খবর পেয়ে এসে পড়েছেন। কাম্পাউন্ডারবাবু বলছেন এটা করো. ওটা করো। এক্ষুনি গরম জল ঠিক রাখো। তুলো ন্যাকড়া সব এনে রেখেছেন। একটি আলাদা ঘরে মাটির ওপর বস্তা বিছিয়ে গৌরীকে রাখা হয়েছে। সে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে।

ভবেশ বলল, আমি এসে গেছি কম্পাউন্ডারবাবু। আমায় কী করতে হবে বলুন।

অজিতবাবু বললেন, তোমায় কিছু করতে হবে না। তোমার কাছে বেশ ধারালো কাঁচি আছে? থাকলে গরম জল করে ভালো করে ফোটাও।

না তো কাঁচি তো নাই।

দ্যাখোগে কারও কাছে পাওয়া যায় কি না।

অজিতবাবু বললেন, দ্যাখো। খুব তাড়াতাড়ি।

আধঘণ্টার মধ্যেই একটি নবজাতকের আর্ত চিৎকারে ডিগলিপুরের নগ্ন নির্জন সন্ধ্যা মুখরিত হয়ে উঠল।

কাঁচি পাওয়া গেল না। কম্পাউন্ডার অজিতবাবু তাঁর দাড়ি কামাবার ব্লেড নিয়ে এসেছিলেন। তাই দিয়ে নবজাতকের নাড়ি কাটা হল।

আঁতুড় ঘর থেকে কম্পাউন্ডারবাবু বেরিয়ে এসে বললেন, তোমার মেয়ে হয়েছে ভবেশ। দুই ছেলের পর মেয়ে হল। এবার মিষ্টি মুখ করাও সবাইকে।

রমেশ জিজ্ঞাসা করল, মা বাচ্চা সবাই কেমন আছে?

সবাই ভালো আছে। তোমরা তো সবাই খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলে। ত্রিশ বছর ধরে কম্পাউন্ডারি করছি। আজকালকার অনেক ডাক্তারদের কান কেটে দিতে পারি। তবে একটা কথা জানো কি ভবেশ, ডাক্তারের ওপর বিশ্বাসই হল আসল। তুমি বিশ্বাস টলিয়েছ কি মরেছ।

ভবেশ বলল, ওকথা তোলে লজ্জা দেবেন না কম্পাউন্ডারবাবু। আপনার ওপর বিশ্বাস না করে যাব কোয়ানে কইতে পারেন?

ভবেশ একটু পরে ভেতরে গিয়ে তার শিশু সন্তানকে দেখল। মা বাবার মতোই কালো হয়েছে মেয়ে। এখন লাল টকটক করছে। চোখ বুজিয়ে ঘুমোচ্ছে পরম আনন্দে। দেখলে একটি ছোট্ট পুতুল বলে মনে হয়। তার বড় ছেলে বিমল যখন হয়েছিল তখন আকারে অনেক বড় ছিল। এমনকী শ্যামলও বেশ মোটাসোটা ছিল ছোটবেলায়। সে তুলনায় বেশ রোগা হয়েছে মেয়ে।

কিন্তু তা হবে নাই-বা কেন? পোয়াতি হবার পর একটু দুধ পর্যন্ত পায়নি। কিছু জমানো টাকা থেকে একবার কাননের দোকান থেকে এক শিশি হরলিক্স নিয়ে এসেছিল। কিন্তু তারপর থেকে আর হরলিকস্ আসেনি দোকানে। আর দুধ জাতীয় কিছু জোটেনি। বউ যে বেঁচে আছে এটাই যথেষ্ট।

ভবেশের খুব সহানুভূতি হল তার বউ এর ওপর। তারা সারা জীবনের সুখ দুঃখের সাথী। পনেরো বছর বয়সে তার বিয়ে হয়েছিল। গৌরীর বয়স তখন ছিল আট বছর। শ্বশুরবাড়ি আসার সময় সে কি কান্না। তার শ্বশুর কোলে করে এগিয়ে দিয়েছিল নৌকো পর্যন্ত।

অনেক বুঝিয়ে শ্বশুরবাড়ি যেতে রাজি করিয়েছিল পাগলি মেয়েকে।

শ্বশুরবাড়িতে এসে ঘরকন্নার চেয়ে ভবেশের বোনদের সঙ্গে খেলাধুলোতেই মেতে থাকত নতুন বউ। সন্ধ্যার একটু পরেই ঘুমিয়ে কাদা হত।

এইভাবেই কবে যে গৌরী নিজেকে নারী বলে চিনতে শিখেছিল ভবেশ আজ তা ভুলে গেছে। তবে গৌরীর যত বয়স বেড়েছে ততই সে কর্মপটু হয়ে উঠেছে। শেষের দিকে সেই তো গোটা সংসারটাকে ধরে রেখেছিল।

ঈশ্বর রক্ষা করেছেন। গৌরীর কিছু হয়নি।

বিকাশ আন্দামান প্রশাসনের এই চাকরিটা নিয়েছিল মোটামুটি অ্যাডভেঞ্চারের লোভে। তার ওপর এই চাকরিতে একটি চ্যালেঞ্জ ছিল। আন্দামানের বুকে হাজার হাজার বাঙালি উদ্বাস্তুকে পুনর্বাসন দেওয়ার দায়িত্ব একটা বিরাট কাজ।

তা বাদে বিকাশের সে সময় একটা ভালো বেতনের চাকরিরও দরকার ছিল। বাবা একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। সে ওই পত্রিকায় চাকরি করত দিনের বেলা। ম্যানেজারের চাকরি। গ্রাহকদের কাছে কাগজ পাঠানো, তাদের চিঠিপত্রের উত্তর দেওয়া। সার্কুলেশন দেখা। রাতে বঙ্গবাসী কলেজে পড়ত।

এইভাবে সে বি এ পাশ করল একদিন। পত্রিকার অবস্থা খারাপ। বাবার শরীর খারাপ। ভাই-বোনেরা সব স্কুল-কলেজে পড়ে। এমন সময় খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে সে চাকরির দবখাস্ত করেছিল। চাকরিটা পেয়েও গিয়েছিল। ইন্টারভিউ বোর্ডে ছিলেন হারাধন রাহা। বিকাশের চেহারা দেখে তাঁর খুব ভালো লেগে গিয়েছিল। ছিপছিপে চেহারা। ধপধপে রং। মুখটা খুব মিষ্টি। কিন্তু এই ছেলেটি কি আন্দামানের কষ্টসাধ্য কাজ করতে পারবে!

বিকাশ বলেছিল, পারব স্যার। আমাকে নিয়ে দেখুন।

ইন্টারভিউ বোর্ডে আর একজন সদস্য বলেছিলেন, মি. চক্রবর্তী, আপনি যদি টিচিং-এ আসতে চান, আপনাকে টিচিং পোস্টেও দিতে পারি। আপনি আমাদের জুনিয়র স্কুলের টিচিং পোস্টে আসুন। আমাদের প্রচুর ইয়ং টিচার দরকার। টিচিংএ খাটুনিও কম। ফ্রি কোয়ার্টার্স, লিভ ট্রাভেল সব ফেসিলিটিস পাবেন।

কিন্তু বিকাশ বলেছিল, না স্যার। আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ জবই নিতে চাই।

আন্দামানে এসে প্রথম দুটো বছর কোথা দিয়ে কেটে গেল। এর মধ্যে অধিকাংশ সময় সে রাহাবাবুর সঙ্গে ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরেছে। কিন্তু প্রথম দিকে তার যত উৎসাহ ছিল, এখন সেটা স্তিমিত হয়ে এসেছে।

দিল্লিতে বুরোক্র্যাসির লালফিতাতে বাঁধন এত শক্ত যে খোলা মুশকিল সে বাঁধন। আগে থেকে কোনও সুষ্ঠু পরিকল্পনা নেই। এই যে কয়েক হাজার পরিবারকে নিয়ে এসে ফেলা হচ্ছে ডিগলিপুর, মায়াবন্দর, রঙ্গত, হ্যাভলক, নীল আইল্যান্ডে তার পরিকাঠামোই তৈরি হয়নি। তার ওপর এখন দিল্লি থেকে অর্ডার এসেছে বাঙালি উদ্বাস্তুদের আনার ব্যাপারটায় আর তড়িঘড়ি করা উচিত হবে না। পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থীরা চায় না উদ্বাস্তুরা আন্দামানে যাক। আর তাদের মতের বিরুদ্ধে তাদের আন্দামানে পুনর্বাসন দেওয়া উচিত হবে না। কারণ এতে কংগ্রেসের রাজনৈতিক ক্ষতি হবে। একে তো উদ্বাস্তুদের মধ্যে কংগ্রেসের সমর্থন খুবই কম। প্রায়ই পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে উদ্বাস্তুদের বিক্ষোভ সমাবেশ লেগেই আছে।

হারাধনবাবু চিফ কমিশনারকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন, স্যর পারসুয়েশন ছাড়া উদ্বাস্তুদের আন্দামানে আনা সম্ভব নয়। এজন্য সময় লাগবে। আপনি আমায় পাঁচ বছর সময় দিন, আমি আন্দামান বাঙালি উদ্বাস্তুতে ভরে দেব।

চিফ কমিশনার বলেছিলেন, মি. রাহা, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার পলিসি আমাদের মেনে চলতেই হবে। তাঁরা আর রিফিউজি আনতে চান না।

তাহলে যাদের আনা হয়েছে তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হোক। দ্বীপের মধ্যে তাদের ছেড়ে দিলেই তো পুনর্বাসন হল না।

কেন, তাদের ব্যারাক করে দেওয়া হয়েছে। ফ্রি রেশন দেওয়া হচ্ছে। চাষের জন্য যন্ত্রপাতি ও বীজ দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু এখনও অনেক বাকি। ডিগলিপুরের কথাই ধরুন, দেড় বছর আগে সেখানে রিফিউজিদের এনেছি আমরা। সব সুদ্ধু তিন জাহাজ উদ্বাস্তু এসেছে সেখানে। কিন্তু এখনও তাদের মধ্যে ল্যান্ড ডিসট্রিবিউশন কমপ্লিট করা যায়নি। রিফিউজিরা কেউ নিজেদের ঘর তুলতে পারেনি এখনও। সবাই ব্যারাকে বাস করছে। তাদের জমি চাষ করার জন্য ক্যাটল ও লাঙল দিতে পারিনি।

চিফ কমিশনার বললেন, আপনারা বাঙালিরা ভীষণ অধৈর্য মি. রাহা। আপনারা চান গাছে না উঠতেই এক কাঁদি। পাঞ্জাবি রিফিউজিরা সরকারি সাহায্য না নিয়ে কেমন দাঁড়িয়ে গেছে। আপনারা কাজ করবেন না। খালি আশা করবেন সরকার সব করে দেবে।

হারাধনবাবু বললেন, স্যার, আমার খুব ইচ্ছে করে আপনাকে নিয়ে গিয়ে দেখাই ডিগলিপুরে রিফিউজিরা কি হার্ড ওয়ার্ক করছে। এবার তো ধান হয়েছে, তরিতরকারি ধরেছে তাদের গাছে, আপনি জানেন তারা কোদাল দিয়ে চাষ করেছে এবার। কিন্তু ডাক্তার ও ওষুধ এটা সবার আগে দরকার।

চিফ কমিশনার বললেন, মি. রাহা সবই হবে। আন্দামান একদিন সবচেয়ে রিসোর্সফুল আইল্যান্ড হয়ে উঠবে। শুধু আমাকে একটু সময় দিন।

রাহাবাবু বিকাশকে এই কথা বলেছেন। বলেছেন, কোনও রকমে ঠেকা দিয়ে চালিয়ে দাও বিকাশ। খুব তাড়াতাড়ি কিছু এক্সপেক্ট কোরো না।

বিকাশ বলে কিন্তু মানুষ মারা যাচ্ছে এটা তো চুপ করে দেখা যায় না।

দেখতে হবে। উপায় নেই।

মাঝে মাঝে ভীষণ হতাশ লাগে বিকাশের। কিন্তু আন্দামানে তার এই হতাশার মধ্যে একমাত্র আশার জ্যোতি দেবযানী। সে হারাধনবাবুর বোন। দেবযানী পোর্টব্লেয়ারে থেকে কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পড়ে। হারাধনবাবুর বাবা-মা স্ত্রী ছেলেমেয়ে ও এক বোন পোর্টব্লেয়ারে কোয়ার্টার্সে থাকে।

দেবযানীর সঙ্গে এখানে আসার পর থেকেই বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে দেবযানীর কাছে তার মনের কথা প্রকাশ করে বিকাশ। দেবযানী বলে, তুমি একটুতেই বড় অধৈর্য হয়ে পড়ো বিকাশদা। দাদাকে দ্যাখো না কেমন নির্বিকার।

বিকাশ বলে, সে বাইরে। আমি ওঁর ভেতরটা তো জানি। সেখানে কিন্তু অনেক হতাশা জমে আছে। যা করতে চান করতে পারছেন না। উনি বলেন, সরকারি

চাকরিতে যা লোক করতে চায় তা করতে পারে না।

কিন্তু যেটুকু তোমরা করেছ তার দাম কম কি? যেদিন আন্দামান একটা বিরাট জায়গা হয়ে উঠবে,সেদিন লোকে তোমাদের কথা মনে করবে।

তুমি কি ভাবছ আমার আর তোমার দাদার স্ট্যাচু গড়িয়ে রেখে দেবে এখানকার লোক?

অন্য দেশ হলে হয় তো দিত। কিন্তু এটা আমাদের ভারতবর্ষ। এখানে হয় তো অতটা আশা করা উচিত হবে না। তবে লোক মনে করবে এটা ঠিক। হয়তো ডিগলিপুর, মায়াবন্দর, রঙ্গত, হ্যাভলক, নীলের ইতিহাস যেদিন লেখা হবে সেদিন তাতে তোমাদের নাম থাকবে।

আমার অতশত অ্যাম্বিশান নেই। আমি ততদিন এখানে থাকবই না।

কোথায় যাবে?

আমি আর একটা চাকরিবাকরি পেলে মেন ল্যান্ডে চলে যাবো। দু বছর তো কাজ করলাম।

দেবযানী মুখ টিপে হেসে বলল, কেন, মেন ল্যান্ডে তোমার জন্য কেউ অপেক্ষা করে আছে নাকি?

বিকাশ দুষ্টুমির হাসি হেসে বলল, অপেক্ষা করে থাকতেও তো পারে।

দেবযানী আর দাঁড়ায়নি। কপট রাগ দেখিয়ে চলে যাবার সময় বলেছে, তাহলে যাও না যে তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে তার কাছেই যাও।

সেদিকে তাকিয়ে বিকাশের মনটা ভরে উঠেছিল। দেবযানীর সঙ্গে তার সম্পর্কটা ক্রমশ সহজ ও সরল হয়ে আসছিল। কেউ কারও কাছে ধরা দিচ্ছিল না অথচ এক একটা মুহূর্ত দুজনের কাছে বৃন্তহীন ফুলের মতো উদ্ভাসিত হয়ে উঠছিল যেন। অনেক সময় শব্দের চেয়ে ইঙ্গিতও যে কী অর্থপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে দেবযানীর সঙ্গে আলাপ না হলে সে বুঝত না।

ডিগলিপুরে এসে দু দিনের মধ্যেই কাজের মধ্যে ডুবে গেল বিকাশ।

এখনও প্রচুর কাজ বাকি। দু বছর ধরে উদ্বাস্তুরা ব্যারাকে বাস করছে। তারা তাদের জমিতে ফিরে গিয়ে যে যার নিজের মতো বাড়ি করতে চায়। এ জন্য ১৭৩০ টাকা করে গৃহনির্মাণ অনুদান মঞ্জুর হয়েছে। কিন্তু মঞ্জুরিটা কাগজে কলমে। এখনও টাকাটা আসেনি। আর টাকা দিলেই হবে না। বাড়ি করার সরঞ্জাম বিশেষ করে চাঁচের দেওয়াল ও মাথার ওপর করোগেটেড টিন জোগাড় করে দিতে হবে।

সেটলারদের জমিতে প্রচুর ধান হয়েছে। কিন্তু উদ্বৃত্ত চাল বিক্রির ব্যবস্থা নেই। বাজারে চালের দামও অস্বাভাবিকভাবে কম এ জন্য। একটি বাজার বসানোর প্রস্তাবও রয়েছে।

ব্যারাকের মতো দুটি ঘর নিয়ে বিকাশের কোয়ার্টার্স। একটি ঘরে সে থাকে। একটি চৌকি পাতা। তাতে পুরোনো তোশক। বালিশ। একটি চাদর। আসার সময়

চাঁদনি থেকে একটি মশারি কিনে এনেছিল। সেই মশারিটা এখনও রয়েছে। বাড়িতে রোজ মা মশারি গুঁজে দিত। সে আর তার ভাই বিমান এক বিছানায় শুত। বিমানের সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়া হত বিমান ভালো করে মশারি গুঁজত না বলে।

হারাধনদা বলেছিলেন, ডিগলিপুরে গিয়ে কিন্তু ভালো করে মশারি গুঁজে শুয়ো। আমার মনে আছে একদিন দশটা বিছে বার করেছি বিছানা থেকে।

দেবযানী বলেছিল, দাদা, তুমি বিকাশদাকে আবার ভয় লাগিয়ে দিচ্ছ, একে ও প্রচণ্ড ভিতু।

বিকাশ বলেছিল, বাজে কথা বোলো না। আমাকে তুমি ডিগলিপুর চেনাচ্ছ। আমি দুবার ডিগলিপুর গেছি। থেকেছিও সেখানে।

হারাধনবাবু বলেছিলেন, এখন অত বিছে পাবে না। আমি প্রথম দিকের কথা বলছি। তবে সাবধানের মার নেই।

সকাল বেলা উঠে বিকাশ একটু পায়চারি করছিল সামনের রাস্তায়। একটু দূরেই রাঁচি লেবরদের বস্তি। বস্তি থেকে ধোঁয়া উঠছে। সাত সকালে রান্না চড়িয়েছে কারা। আশ্বিন যাই যাই করছে। এবার পুজোর সময় তাদের দমদম মোতিঝিলে কী মজা হত। তার ভাই বিমানের নাটকের দল ছিল। তিন রাত নাটক করে মাতিয়ে রাখত পাড়া।

পুজোয় কলকাতার বাইরে যাবার কথা ভাবতেই পারত না সে।

অথচ আন্দামানের এক অখ্যাত দ্বীপে পুজোর দিনগুলি কী ভাবে কেটে গেল নিজেই বুঝতে পারল না।

বিকাশ দেখল কয়েকজন তার দিকে গল্প করতে করতে এগিয়ে আসছে। সামনে আসতেই চিনতে পারল। নটবর মিস্ত্রি ও ভবেশের ভাই রমেশ। সঙ্গে আরও কজন।

নটবর বলল; প্রণাম চক্কোত্তি মশাই?

প্রণাম। এত সকালে কোথায় চললে?

আপনার কাছেই যাইতাছি। সকাল ছাড়া আপনাকে তো আবার পাওয়া যায় না।

বলো কী করতে পারি।

আমরা এবার কালীপুজো করতে চাই।

কালীপুজো? কবে কালীপুজোর তারিখ তাও তো জানি না।

আর বারোদিন বাকি আছে।

তা কালীপুজো করতে চাও তো ভালো কথা। কিন্তু কোথায় প্রতিমা পাবে?

আমাদের জ্ঞান ঘরামি আছে। কুমোরের কাজ জানে। ও প্রতিমা তৈরি করে দেবে। মুশকিল হচ্ছে আমরা বামুন পাইতেছি না। আপনি বামুনের ছেলে। পুজোটা করে দিবেন?

বিকাশ হেসে বলল, সর্বনাশ করেছে।

আমি বামুনের ছেলে সত্যি। বাবা ভালো সংস্কৃত জানেন। আমি কুলাঙ্গার। আমার

পইতে পর্যন্ত নেই। পইতের সময় গায়ত্রী করেছিলাম। তারপর থেকে আর করিনি। আমি কালীপুজো করব কী ভাবে? কালী নিয়ে ছেলেখেলা নয়।

ওরা নাছোড়বান্দা। বিকাশ বলল, এক কাজ করো। গত রবিবারের জাহাজে একজন মাস্টারমশাই এসেছেন মায়াবন্দরে—হরেন ভট্টাচার্য। তাঁকে ধরে আনতে পারো যদি দ্যাখো। ভট্টাচায্যি যখন তখন পুজোর অভ্যেসটভ্যেস থাকবে।

নটবর বলল, ঠিক আছে, তবে আমরা একটা যাত্রা করব। আপনি একটা নাটকের বই দিন।

নাটকের বই—কোথায় পাব?

আপনার কাছে নাই?

তোমরা কি ভাবো বলো তো? আমি কি এখানে নাটকের দল নিয়ে এসেছি? আমার বাবা নাটক লিখতেন। ভাই নাটক করে। কিন্তু আমি ও রসে বঞ্চিত।

তাহলে নাটক হবে না? বিকাশ একটু ভেবে বলল, এক কাজ করো তোমরা—এমন একটা পালা বেছে নাও যার গল্প সবাই জানে। ধরো হরিশচন্দ্র। এরপর যে যার খুশি মতো সংলাপ বলে যাও। গল্পটা ধরে এগুলেই হবে।

বইয়ের দরকার হবে না।

সে আবার কী রকম হবে?

কিন্তু বিকাশ যখন বুঝিয়ে দিল ভালো করে তখন ব্যাপারটি মনঃপূত হল ওদের। ঠিক হল হরিশ্চন্দ্র পালাই হবে।

এই ঘটনার দিন পনের পরে দেবযানীকে একটি চিঠি লিখছিল বিকাশ। দু'একদিনের মধ্যে একটি জাহাজ আসবে। ক্যাপটেনের হাতে চিঠিটি দেবে পৌঁছে দেবার জন্য।

তাতে বিকাশ লিখল, দেখতে দেখতে দুমাস কেটে গেল ডিগলিপুরে। এই দুটো মাস যে কোথা দিয়ে কেটে গেল তা নিজেই বুঝতে পারছি না।

তবে এই দুমাসে উল্লেখ করার মতো ঘটনা হল এখানকার কালীপুজো। এমন মজার কালীপুজো আর কখনও দেখার সৌভাগ্য হবে কি না জানি না। প্রথমে এরা আমাকে পুরুত করবে ভেবেছিল। কিন্তু আমি মায়াবন্দরের এক ভট্টাচার্য সন্তান শিক্ষকের দিকে সুকৌশলে তীরটা ছুঁড়ে দিয়েছি। সে বেচারাকে ওরা গিয়ে একবারে কিডন্যাপ করে নিয়ে এসেছে।

পুজো যাই হোক, আসল মজার জিনিস ছিল এদের হরিশ্চন্দ্র নাটক অভিনয়। কোনও স্ক্রিপ্ট ছিল না। হরিশ্চন্দ্র সেজেছিল ভবেশ মণ্ডল বলে এখানকার এক নেতৃস্থানীয় সেটলার। সে তার বউয়ের একটি শাড়ি মালকোঁচা দিয়ে পরেছিল। মুরগির পালক দিয়ে রাজমুকুট তৈরি হয়েছিল। পেঁপের ডাল দিয়ে তলোয়ার। কাজল দিয়ে আঁকা গোঁফ।

শৈব্যা হয়েছিল কানাই বলে একটি ছেলে। বেচারির পরচুল ছিল না বলে তাকে

সর্বদা অবগুণ্ঠনবতী থাকতে হয়েছে। নাটকের অন্যান্য পাত্রপাত্রীদের সাজপোশাকও এই রকম।

কিন্তু এই অভিনয় দেখার জন্য লোক ভেঙে পড়েছিল সেদিন। এমনকী কেরলাপুরম থেকেও অনেক দর্শক এসেছিল। নাটকের সাফল্য নির্ভর করছিল পাত্রপাত্রীদের উপস্থিত সংলাপ বানাবার ক্ষমতার ওপর। প্রায়ই পাত্রপাত্রীরা জুতসই সংলাপ খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তার ফলে নাটকটি খুব মন্থরগতি হয়ে পড়ছিল। কিন্তু সময় যেখানে এসে স্তব্ধ হয়ে আছে বা ধাক্কা খেয়ে খুব ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে সেখানে সময় কোনও আনন্দেরই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় না। এখানেও দাঁড়ায়নি।

যাই হোক, ডিসেম্বরের আগে পোর্টব্লেয়ার যেতে পারব বলে মনে হয় না।

ইতি—বিকাশ।

কালীপুজোর পরেই ব্যস্ততা শুরু হয়েছে ধানভানা নিয়ে। আউশধান সব ভাদ্দর মাসেই তুলে ফেলা হয়েছে। কিন্তু এত ধান এক সঙ্গে ভানা সম্ভব নয়।

আশ্বিন মাসে এবার একদম বৃষ্টি হয়নি। কিন্তু প্রতিটি রাত জেগে পাহারা দিতে হয়েছে পাছে শুয়োর বা হরিণের পাল এসে ফসল নষ্ট করে দিয়ে যায়।

ফসল তোলা নিয়ে রঞ্জু দুমাসের ওপর পোর্টব্লেয়ার গিয়ে রয়েছে। কবে ফিরবে তা জানা যাচ্ছে না। বিকাশকে শুধু একটি চিঠি পাঠিয়েছে এর মধ্যে। বিকাশদা, কয়েকটি দ্বীপ ঘুরতে বেড়িয়েছি। সেখানে পুনর্বাসনের কাজ কেমন হচ্ছে একবার দেখতে চাই। ফিরতে ফিরতে নভেম্বরের শেষ হয়ে যেতে পারে। আমার মাকে খবরটি পৌঁছে দেবেন।

রঞ্জুর মাকে ডেকে খবরটি দিতেই হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন তিনি।

তুমি বলো বাবা, সেই যে গ্যাছে গিয়া নাম নাই। ঘর পালানো ছাওয়াল আমার। ফেরবে কিনা ভয় হয়।

বিকাশ বলে, না না ফিরবে না কেন? রঞ্জু সেরকম ছেলেই নয়। ও কিছু দ্বীপ ঘুরে আসবে। হয়তো চিফ কমিশনারই ওকে বলেছেন কয়েকটি দ্বীপ দেখার কথা। ওর ওপর আমরা সবাই খুব ভরসা করি।

কিন্তু আমার মাঠের ধান মাঠেই পড়ে আছে। সুখেন ঘরামিরে রঞ্জু ভাগে দিয়া গেছল। সেই চাষবাস করছে। এখন সুখেন বলে মাসি, তোমার ভাগের ধান কেমনে এনে ঘরে তুলি, আমার লোকজন নাই। আর তুললেও বা কোথায় তুলি? সবাই যে যার গোলা বানায়ে নেছে। আমারে কেডা বানায়ে দেয় এসব। আমি কি বুঝি, না জানি?

বিকাশ বলে, দেখছি আমি রাঁচি লেবারদের দিয়ে আপনার ভাগের ধানগুলি তুলে দিতে পারি কিনা। মাঠে পাহারা দিচ্ছিল কে?

এতদিন তো সুখেনের বড় ছাওয়াল দিচ্ছিল। সে ছেলে আর থাকতে চায় না। পাহারা উঠোলেই সব ধান হরিণের পেটে যাবে।

ভবেশের জমিতে বিঘে প্রতি পনেরো মণ ধান হয়েছে এবার। শুধু ভবেশ কেন, প্রত্যেকের জমিতেই ধান হয়েছে বিঘেতে দশ থেকে পনেরো মণ। এক-একটা ধামার মতো কুমড়ো। বিরাট বিরাট শসা, বেগুন, ভিণ্ডি। শীতের ফসল এখনো আসেনি।

অবশ্য ফসল ওঠার মুখে মাচা বেঁধে সারারাত হরিণ পাহারা দিতে হয়েছে ওদের। কিন্তু ভয় ছিল হরিণের চেয়ে কুমিরকেই বেশি। কারণ এই প্রথম ওরা দেখেছে কুমিরের আক্রমণ থেকে সাবধান হয়ে যাওয়ায় কুমিরের আক্রমণ আর ঘটেনি। আর এক ধরনের সরীসৃপকে তারা ভয় করত। সেটি হল একরকম মাথা মোটা সাপ। কামড়ালে জায়গাটা ফুলে উঠত। পরে দেহ ফুলে যেত।

ব্যারাকের পাশেই পর পর ঢেঁকি তৈরি করেছে ওরা। সারাদিন ধরে মেয়েদের নাওয়া খাওয়ার সময় নেই।

ভবেশ মুশকিলে পড়েছে। তার দুই ছেলেই ছোট। গৌরী এখন একটু সুস্থ। কিন্তু খুবই দুর্বল। বাচ্চাটিও খুবই ছোট। মাত্র একমাস বয়স। এর মধ্যে কী এক বিষাক্ত পোকা কামড়ে সারা গায়ে চাকা চাকা দাগ করে দিয়েছে। ঘা হয়ে গিয়েছে সারা দেহে। চট করে শুকোতে চাইছে না সেই ঘা। সারাদিন কাঁদে মেয়েটি। গৌরীকে সামলাতে হয়।

ভবেশ তাই নিজেই ঢেঁকির পাড় দেয়। এদের মধ্যে কুলদাপিসিকে জোগাড় করেছে। কুলদাপিসি তাদের সঙ্গেই ছিল বিষ্ণুপুর ক্যাম্পে। বিধবা হয়ে ভাইয়ের আশ্রয়ে ছিল। ভাই বউ-এর সঙ্গে বনিবনা হত না। কুলদাপিসীর নামে একটা জমির প্লটও বণ্টন হয়েছিল। কিন্তু সেই জমিটির দখল নেওয়ার পর তার ভাই আর তার দেখাশোনা করে না।

এ নিয়ে রাহাবাবু পর্যন্তও গড়িয়েছে ব্যাপারটি। কুলদাপিসি ভাইয়ের সংসার থেকে চলে এসেছে। ভবেশের কাছেই আছে এখন। ভবেশের কাজ করে দিচ্ছে। ভবেশ তাকে বলেছে তোমার ভাগে যা ধান হবে তা তোমায় দেব পিসি। তুমি আমার এই সময়টা উতরোয়ে দাও। বড্ড ঠ্যাকায় পড়ছি আমি।

ছোট বোন জন্মাবার পর বিমল কেমন যেন একটু গম্ভীর হয়ে গেছে। একে তো একমাস ধরে রঞ্জুদা নেই। তার প্রাণ খুলে কথা বলার মতো কোনও সঙ্গী নেই। ছোট ভাইয়ের সঙ্গে তার খুব একটা ভাব নেই। তার আলাদা খেলার সঙ্গী আছে। বিমল ভেতরে ভেতরে খুব নিঃসঙ্গ। সে সকলের সঙ্গে সহজে মিশতে পারে না।

মায়ের সঙ্গে ছিল তার যত ভাব। সেই মায়ের আঁতুড় ঘরে যাওয়া। জীবন মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম। তারপর মায়ের সমস্ত রক্ত শোষণ করে তুলতুলে পুতুলের মতো এক আগন্তুকের আগমন।

একদিকে ছোট্ট সজীব অসহায় প্রাণীটির প্রতি তার মন সহানুভূতিতে ভরে ওঠে। সে কল্পনা করে এই পুতুলের মতো বাচ্চাটিই একদিন হয়তো ময়নার মতো এক প্রাণবন্ত কিশোরীতে পরিণত হবে। কিন্তু পাশাপাশি বাবার প্রতি তার মন বিষিয়ে

ওঠে। মনে হয় বাবাই তার মায়ের এই পরিণামের জন্য দায়ী। যেখানে বেঁচে থাকার জন্যই নিত্য নিরন্তর সংগ্রাম, যেখানে জীবনের যেটুকু উত্তাপ আছে তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই সারাদিন সকাল থেকে রাত্রি নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যেতে হয়, সেখানে কোনও উদ্যোগ আয়োজন ছাড়া একজনের প্রাণকে বিপন্ন করে আর একজনকে নিয়ে আসা অর্থহীন শুধু নয়, নিষ্ঠুরতার নামান্তর। তাই তার মন বারবার তার বাবার প্রতি বিষিয়ে ওঠে।

গৌরী মাঝে মাঝে ক্ষীণ কণ্ঠে তাকে—অ-বিমল বিমল রে।

কী কও?

বুনডারে একডু রাখতে পারস? দিনরাত খালি চিল্লায়। আমি যে নাইতে যাবার পারি না।

বিমল এসে বসে কাছে। তার কোলে বাচ্চাটি আবার কেঁদে ওঠে। বিমল অপরাধ বোধ করে।

কান্দুক। একটু কান্দলে কিছু যাবে আসবে না।

না, না, অমন কইর‍্যা ধরে না বাপ। নরম ঘাড়। এইভাবে ধরো। ধরার কায়দা আছে। গৌরী দেখিয়ে দেয়, কীভাবে ধরতে হবে।

একটুতে আজকাল হাঁফিয়ে ওঠে গৌরী। তার হাত-পা সরু হয়ে গেছে। গলার হাড় বেরিয়ে গেছে। মুখের রং ফ্যাকাশে। বুকের দুধই মেয়ের একমাত্র খাদ্য। কিন্তু গৌরীর বুকে আর কতটুকু দুধ। আর দুধ হবেই বা কোথা থেকে। সে কি দুধ পাচ্ছে খেতে। দুধ বলতে তো ওই পাউডার গোলা।

গৌরীর মুখেও অরুচি। কুলদাপিসি এসে বলে, অ বউ, বেগুনির টক করবো, খাবা? বাচ্চা বিয়োনোর পর আমরা টক বেগুন খাতাম। করে দেব?

গৌরী বলে, না।

তাহলে তো মুশকিল। গোলমরিচের গুঁড়ো ভেজি ঘি দিয়ে গরম ভাতে ছড়ায়ে দিলি পোয়াতির মুখি বেশ তার হয়। তা কোথায় পাব গোলমরিচ। ভবেশেরে বলে দেখি যদি কাননের দোকান থেকি নিয়ে আসতে পারে।

গৌরী একদিন বিমলের গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে বলে, হ্যাঁরে, আমি রান্নাঘরে যাইতে পারতিছি না, তোর খাওয়াদাওয়ার খুব অসুবিধে হয় তাই না রে?

বিমল বলে, কই না তো।

একলা একলা নালার ধারে যাচ্ছস না তো?

না মা। জানো মা, এখানকার লোকে এহন ওই নালার নাম দেছে মগর নালা।

কী নালা?

মগর নালা। হিন্দিতে কুমিরেরে মগর কয়।

ওঃ। গৌরী হেসে ওঠে।

বিমলও হাসিতে যোগ দেয়, তার মা-র সঙ্গে। হাসতে গিয়ে লক্ষ্য করে

বিমল—মা কত রোগা হয়ে গেছে। একটা বীভৎস কঙ্কালের মতো হাসির সঙ্গে দাঁতের মাড়ি বেরিয়ে আসছে।

এমন সময় বাইরে থেকে রঞ্জুর গলা পাওয়া যায়—ভবেশদা আছ নাকি?

গৌরী তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় টেনে দেয়। বিমল বেরিয়ে আসে। রঞ্জুদা দাঁড়িয়ে। হাতে একটি হরলিকসের শিশি।

বউদির জন্য নিয়ে এলাম। তোর বাবা কোথায়? তোর বোন হয়েছে শুনলাম। কেমন আছে?

বিমল বলল, তুমি কবে আসলা রঞ্জুদা?

আজ সকালে। তারপর হেঁটে আসতে যত সময় লাগে। এসেই শুনলাম তোর বোন হয়েছে। চল তোর বোনকে দেখি।

বিমল ভেতরে গিয়ে গৌরীকে বলল, মা রঞ্জুদা আসছে।

রঞ্জু? কবে আইল?

এই অখনই।

একটু দাঁড়া। গৌরী তাড়াতাড়ি কাপড়চোপড় ঠিক করে নিল। মেয়েটা হওয়ার পর সে এখন ছেঁড়া ময়লা শাড়ি পরেই দিনের বেশিরভাগ সময় কাটায়। তার সব শাড়িগুলি পুরোনো হয়ে গেছে। কিন্তু ডিগলিপুরে তো কিছুই পাওয়া যায় না।

গৌরী তার মেয়েকে বিছানায় শুইয়ে দিল। মাই খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। এবার গৌরীর স্নান করার সময়। স্নান করে সে হেঁশেলে ঢুকবে। এতদিন ছোট জা রান্নাবান্না করত। গৌরী তার হেঁশেলের দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে।

গৌরী বলল, যা রঞ্জুকে ডাক।

রঞ্জু ঘরে ঢুকে তার হাত থেকে হরলিকসের শিশিটা মেঝের উপর রাখল, পোর্টব্লেয়ার থেকে তোমার জন্য আনলাম। ভবেশদা কোথায়?

বিমল বলল, বাবাতো মাঠে।

এখনও মাঠে?

এখনও তো সব ধানা আনা হয় নাই। মাঠে পড়া আছে। রাতে বাবায় তো মাঠে থাকে।

ও হো। তারপর রঞ্জুর বাচ্চার দিকে চোখ পড়ে যায়। বেশ ভালো দেখতে হয়েছে। কার মতো দেখতে হয়েছে বউদি?

গৌরী একটু সলজ্জ চোখে তাকিয়ে বলে, কে জানে!

রঞ্জু বলে, যাক বাচ্চাটি ভালোয় ভালোয় যে হয়ে গেছে এজন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দেই। আমার যা ভয় হয়ে গিয়েছিল তোমাকে দেখে। এখন কেমন আছ?

ভালো। গৌরী ম্লান হেসে জবাব দেয়।

একটু পরে উঠে যায় রঞ্জু। আসলে গৌরীর সঙ্গে তার কখনও সরাসরি গল্পগুজব করার সুযোগ হয়নি। ভেতরে ভেতরে লজ্জা পাচ্ছে গৌরী।

বিমলকে নিয়ে বাইরে আসে রঞ্জু। বেলা ন-টা বেজে গেছে। শেষ রাতে জাহাজ এসে ভিড়েছে এরিয়াল বে-তে। সোজা হাঁটতে হাঁটতে এসেছে ভবেশের বাড়িতে।

বিমল বলল, তুমি তোমার ঘর যাও নাই?

না, এখন যাব। কেমন আছে বুড়ি?

দিদিমা তো? ভালোই। তোমার কথা বলে আর কান্দে। তুমি দুই মাস কোনও খোঁজ খবর করো নাই রঞ্জুদা—সবাই বলছিল কি জানো? বলছিল, রঞ্জু আর ফেরবে না। সে মেন ল্যান্ডে চলে যাবে। তুমি নাকি বার বার পলাও। বলো না গো আমারে সত্য কথাডা। তুমি নাকি অনেকবার বাড়ি থেকে পলাইছ?

রঞ্জু হেসে বলে, কে বলল এ সব কথা?

অনেকেই বলাবলি করে। বলে রঞ্জুর পায়ে চাকা লাগানো আছে। কোথাও থিতু থাকতে চায় না।

তা ঠিক আমার কোথাও এক জায়গায় থাকতে ভালো লাগে না।

ডিগলিপুর তোমার ভালো লাগে না—?

ব্যতিক্রম শুধু ডিগলিপুর। জানিস, আমার সত্যি মনে হচ্ছিল আর যেন না ফিরি। কিন্তু ডিগলিপুরের মায়া আমাকে একেবারে বেঁধে ফেলেছে বিমল। ডিগলিপুরে না ফিরে তাই পারলাম না।

দুই মাস তুমি কী কী করলে? কোথায় কোথায় ছিলা?

একমাস পোর্টব্লেয়ারেই কাটালাম। হারাধনদা একদিন চিফ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিলেন। তাঁকে আমাদের অভাব-অভিযোগের কথা বললাম। তিনি সব শুনলেন। বললেন, নিয়মিত পোর্টব্লেয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে। হারাধনদাই বললেন, রঞ্জু অন্যান্য দ্বীপে রিফিউজিরা কেমন সেটল করেছে তুমি নিজের চোখে দেখে এসো। তাই আমি হ্যাভলক আর নীল দুটি দ্বীপ ঘুরে এলাম।

ওখানেও উদ্বাস্তু আসছে?

হ্যাঁ, তবে আগে থেকে স্থানীয় লোকও আছে। ডিগলিপুরের মতো অত সুন্দর দ্বীপই না। মাটিও তত ভালো-না। ডিগলিপুরে এলে মনেই হয় না বাংলার বাইরে আছি।

ফিরলা কোন জাহাজে?

ফেরা নিয়েই মুশকিল হচ্ছিল। পোর্টব্লেয়ারে ফিরে জাহাজ আর পাই না। তারপর দেখি পুলিশের একটা জাহাজ এসেছে। সেই জাহাজে এলাম। ডাক্তার আর হাসপাতালের ব্যাপারেও কথা বলে এলাম। শিগ্রি একজন ডাক্তার পাঠাচ্ছেন ওঁরা।

গোরু মোষের জন্যও টেন্ডার হবে। চিফ কমিশনার আমার কথা মন দিয়ে শুনেছেন।

বিমল জিজ্ঞাসা করল, শিব জ্যাঠা তোমার সঙ্গে ফিরেছে?

রঞ্জু বলল, আর তার কথা বলিস না। তাকে নিয়ে আমি খুব মুশকিলে

পড়েছিলাম। রাহাবাবু আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন গেস্ট হাউসে। সমুদ্রের ধারে বেশ ভালো বাড়ি। আমি ভালোই ছিলাম। এর বাড়ি ওর বাড়ি নেমন্তন্ন খেয়ে বেশ চলে যাচ্ছিল। কিন্তু শিবকেষ্টদাকে নিয়ে হল মুশকিল। বাজারে সাউথ ইন্ডিয়ানদের এক ধর্মশালা আছে। তাকে সেখানে রাখলাম। এদিকে তার খাওয়া জোটে না। নাকি পয়সা নেই। হোটেলে খেতে গেলে দিনে দু টাকা। চাল তিন টাকা কেজি। কলকাতায় যে চাল আমরা দেড় টাকা সের কিনেছি। শেষ পর্যন্ত পঞ্চাশ টাকা ধার দিতে হল তাকে। এদিকে হল কি জানো—এক মাদ্রাজি সোনারুপোর দোকানের মালিকের সঙ্গে রোজ গল্প করত। সে নাকি তাকে গহনা গড়াবার যন্ত্রপাতি আনিয়ে দেবে। আমায় না জানিয়ে তাকে দুশো টাকা দিয়ে এসেছে। সে নাকি বলেছে কলকাতা থেকে আনিয়ে দেবে। আমার সঙ্গে কিছুতেই আসবে না। বলে, আমার যন্ত্রপাতি না নিয়ে যাব না। আমি বললাম কবে তোমার যন্ত্রপাতি আসবে? সে বলল, কলকাতা থেকে নাকি প্লেনে করে পাঠিয়ে দেবে। আজও আসছে তো কালও আসছে। আমি বললাম, খুড়ো তুমি যদি এ জাহাজ মিস করো তাহলে আবার কবে ডিগলিপুর ফিরে যেতে পারবে তা বলতে পারি না। আমি কিন্তু দায়ী থাকব না তোমার জন্য। এদিকে তোমার ছেলেমেয়ে বউ একা পড়ে আছে ডিগলিপুরে। এই সব বলে তবে তারে নিয়ে আসতে পেরেছি।

বিমল রঞ্জুর সঙ্গে গল্প করতে করতে তার বাড়ি পর্যন্ত চলে যায়।

বাড়িতে গিয়ে রঞ্জু ডাকে, মা, মা আছ নাকি। রঞ্জুর মা বেরিয়ে আসে।

রঞ্জু তুই আইলি বাপ। হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে রঞ্জুর মা।

এই দ্যাখো কান্দো কেন কও তো।

সবাই বলছে তুই নাকি আর আসবি না।

সবার কথা যে মিথ্যে এখন তো বুঝতে পারলে। নাও আমার ব্যাগটা ধরো। কী আছে খেতে দাও। কাল রাতে জাহাজে খাওয়া হয়নি।

আগে হাত মুখ ধো। পানতা আছে খাবি?

দাও দাও। কতদিন পানতা ভাত খাইনি।

বিমল বলে, আমি আসি রঞ্জুদা।

আয়। ইস্কুলে যাচ্ছিস তো?

না। ক্লাস নিয়মিত হয় না। বাবায় বলল, আর গিয়া কাম নাই। জমির কাম-কাজ কর।

না, না, বাবার কথা শুনিস না। আমি ইস্কুলের কথা বলে এসেছি। এই জানুয়ারি থেকেই ইস্কুল হবে। আবার পড়তে হবে তোকে। না পড়লে বড় হবি কী করে বিমল।

তুমিও তো আর পড় নাই রঞ্জুদা। তবু তুমি তো কত জানো।

আমি পড়িনি বলে অনেক ঠকেছি। এখন বুঝতে পারি, কী ভুল করেছি আমি।

আমি ঠিক করেছি প্রাইভেটে স্কুল ফাইন্যাল দেব। পোর্টব্লেয়ার হাইস্কুলের সঙ্গে কথা বলে এসেছি। ওখানেই সিট পড়বে। আমি চাই তোরা সবাই লেখাপড়া শেখ। যতদিন না তোরা লেখাপড়া শিখবি ততদিন তোরা নিজেদের চিনতে পারবি না।

তার মানে?

তার মানে, কিছু দাবি আদায় করার আগে নিজেকে একবার জানা দরকার। সেটা জানতে গেলে পড়াশোনা করতে হবে। তবেই মনটা কাচের মত স্বচ্ছ হবে। এসব কথা তুই বড় হয়ে বুঝবি, কিন্তু আমি তোকে যেটা বলছি সেটা আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি। কোনও বইয়ের কথা বলছি না।

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে বিমল ফিরছিল। সত্যি এখন তার মনে হচ্ছে লেখাপড়া তাকে শিখতে হবে যেভাবেই হোক। তাদের ইস্কুলটা চলছিল কোনোরকমে। কোনও নির্দিষ্ট বই ধরে পড়ানো হত না। হাতের লেখা, অঙ্ক, মুখে মুখে পড়া। কারও কাছেই পড়ার বই খুব একটা ছিল না।

তবু একটা চর্চা তো ছিল।

কিন্তু ধান কাটার মরশুম আসতেই স্কুল আর জমল না। ছাত্ররা প্রায়ই কামাই শুরু করে দিল। ধান আগে না পড়াশোনা আগে।

তাছাড়া ডিগলিপুরের প্রধান সমস্যা—কাজ আছে লোক নেই। এমনকী চাষের জমি পড়ে আছে কাজ করার লোক নেই।

কিন্তু বিমলের মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। তার খুব ইস্কুলে যেতে ইচ্ছে করল। ইস্কুল থেকে পাশ করে সে কলেজে পড়বে। সে কলকাতায় চলে যাবে। দেখা করবে বেহালা শখেরবাজারে ময়নার সঙ্গে। ততদিনে ময়নাও কত বড় হয়ে যাবে। কিন্তু ময়না কি চিনতে পারবে তাকে?

অথবা ততদিনে ময়নার যদি বিয়ে হয়ে যায় কারও সঙ্গে। একথা ভাবতেই তার মনটা কেমন যেন হু হু করে উঠল।

দেখতে দেখতে আর একটা বছর কেটে গেল। এই এক বছরে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল ডিগলিপুরে। প্রত্যেক পরিবারকে বাড়ি তৈরির অনুদান দেওয়া হল।

পুরোনো উদ্বাস্তুরা সবাই যে যার নিজের জমিতে বাড়ি করে উঠে গেল।

গ্রাম পত্তনের আগে নম্বর অনুসারে প্রত্যেকটি গ্রামের নাম দিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন এক নম্বর নাম হয়েছে রামকৃষ্ণ গ্রাম, দুনম্বর মধুপুর, তিন নম্বর সুভাষ গ্রাম,

চার নম্বর বিদ্যাসাগর পল্লী, পাঁচ নম্বর ক্ষুদিরামপুর, দশ নম্বর দেশবন্ধু গ্রাম।

ভবেশদের এলাকার নাম হল সুভাষ গ্রাম।

বেত, বাঁশ আর তালপাতা দিয়ে ঘর। করোগেটেড টিন সরকার থেকে আসার কথা ছিল, আসেনি। কিন্তু তার জন্য অপেক্ষা করেনি কেউ। তালপাতা দিয়ে দিব্যি চাল হয়ে গেছে।

ভবেশ মেয়ের নাম দিয়েছে শ্যামা। ছোট ছেলে শ্যামলের নামের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে দেখতে শ্যামার বয়স দুবছর হয়ে গেল। সে এখন আধো আধো স্বরে দু-একটা কথা বলতে পারে। উঠোনে খেলে বেড়ায়। গৌরী তাকে চোখে চোখে রাখে সব সময়। সরকারি কৃষি বিভাগ থেকে ফলের চারা দিয়ে গেছে। আম, জামরুল, কাঁঠাল, লিচু, পেঁপে, কলা। সবাই জমিতে লাগিয়েছে রকমারি ফল।

পোর্টব্লেয়ারের সঙ্গে ইতিমধ্যে যোগাযোগও আর একটু ভালো হয়েছে। আগে যেমন কবে কোন্ জাহাজ আসবে তার ঠিক ঠিকানা ছিল না, এখন আন্দামান প্রশাসন থেকে মাসে একবার করে একটা জাহাজ আসে। ওই জাহাজে করে দোকানের জিনিসপত্র নিয়মিত আসে। চিঠিপত্রও আসে।

এর মধ্যে শোনা গেল রঞ্জু একটা মুদিখানার দোকান খুলছে। এরিয়েল বে-র কাননবাবু তাকে সাহায্য করছেন।

ভবেশের সঙ্গে রঞ্জুর ইদানীং দেখাসাক্ষাৎ কম হয়। আগে যখন সবাই ব্যারাকে ছিল তখন কাছাকাছি ছিল। এখন যে যার গ্রামে চলে গেছে। রঞ্জুর বাড়ি হয়েছে রামকৃষ্ণ গ্রামে। তাছাড়া এই ক-বছরের মধ্যে আবার মাসখানেকের জন্য পোর্টব্লেয়ার গিয়েছিল রঞ্জু। গিয়েছিল মোষের তাগাদা করতে। প্রায় দু-বছর কেটে গেল এখনও হালের মোষ এল না। কোদাল কুপিয়েই চাষ চলছে। সামনে পুজো আসছে। তার আগেই দোকান খোলার তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে রঞ্জু। বাজারের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় দোকান ঘর করা শুরুও হয়ে গিয়েছে।

ভবেশের সঙ্গে সেদিন রঞ্জুর দেখা হয়ে গেল হঠাৎ।

ভবেশ বলল, রঞ্জু কেমন আছ? তোমার সঙ্গে দেখাই হয় না আর।

রঞ্জু বলল, মাঝখানে পোর্টব্লেয়ার গিয়েছিলাম।

বাবুদের সঙ্গে কথাবার্তা কিছু হল?

হ্যাঁ। মোষের কথা তো এবারও বলে এলাম। ইস্কুলটা এ বছরই হয়ে যাচ্ছে। এই জানুয়ারি থেকে ক্লাস শুরু হবে। বিমল কোন্ ক্লাসে পড়ত?

দেশে তো ক্লাস থ্রি-তে উঠেছিল। তারপর চার বছর তো পড়া হল না। এতদিনে সাত ক্লাশে উঠে যেত।

আমাদের কত ছেলের যে ক্ষতি হয়ে গেল এ ভাবে। যাক ওবে তো ক্লাশ ফোরে ভরতি করে দিন। ফোরে যদি বেশ কিছু ছেলে জোটে তাহলে ওটা পরের বছর থেকে জুনিয়র ইস্কুল হয়ে যাবে।

হ্যাঁ রঞ্জু, তুমি নাকি দোকান দিতেছ?

রঞ্জু হেসে বলল, হ্যাঁ। একটা ছোটখাটো মুদিখানার দোকান পুজোর আগেই খুলব ভাবছি। এখানে বাজার বসবার স্কিম আছে। আমি একটা কিছু শুরু করে দেই। দেখাদেখি হয়তো অনেকে তখন আসবে।

তা ভালোই করছ বাপু। ত্যাল লবণের জন্য সেই এরিয়েল বে-তে দোকানে আর দৌড়োন লাগবে না। তোমার খানেই সব পাওয়া যাবে।

শুধু পাওয়া যাবেই নয়। আমি যদি জাহাজে পোর্টব্লেয়ার থেকে মাল সরাসরি আনাতে পারি তাহলে কাননবাবু মানে কৃষ্ণস্বামী যে দরে মাল দেবে আমিও সে দরে সবাইকে মাল দেব।

ভবেশ খুব সমর্থন করল।

কিন্তু সীতানাথ এই মুদির দোকান করা নিয়ে রঞ্জুর বিরুদ্ধে বদনাম করে বেড়াতে লাগল।

সীতানাথ সুভাষগ্রামে বাড়ি বানিয়ে নিয়েছে। তার মেয়েটি এখন একটু বড় হয়ে উঠেছে। কিন্তু সীতানাথের ভাগ্য ভালো তার মা-মরা মেয়েটির দায়িত্ব তাকে নিতে হয়নি। তার গ্রাম সুবাদে আত্মীয় সত্য দাসের বউ তাকে মানুষ করছে। মাঝে মাঝে সীতানাথ বাড়ি নিয়ে আসে।

সীতানাথও তার জমি নিজে চাষ না করে সত্য দাসকে দিয়ে দিয়েছে। সত্য দাস তাকে যে ধান দেয় তার কিছুটা বেচে তার অন্য খরচ চলে যায়। কিন্তু সীতানাথের অলস জীবন কাটতে চায় না। সে গ্রামে গ্রামে ঘোরে। তার মাথাতেও নানা প্ল্যান ঘোরে। একটা কিছু করতে চায় সে। কিন্তু কী করবে সে বুঝতে পারে না।

সীতানাথের অহংকার সে ম্যাট্রিক পাশ। ঢাকা থেকে ১৯৪৮ সালে সে ম্যাট্রিক পাশ করেছিল। সার্টিফিকেটটা সে সযত্নে রেখে দিয়েছে।

পাকিস্তানে থাকার সময় রাজনীতির মধ্যে সে কিছুটা জড়িয়েছিল। এই জন্যই পুলিশ লেগে যায় তার পিছনে। ১৯৫৩ সালে বিয়ের পরই সে পাকিস্তান ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল।

পশ্চিমবাংলায় এসে ক্যাম্পে থাকার সময় সে পিএসপি-র সঙ্গে ছিল। কয়েকবার বিডিও অফিস ঘেরাও, রেল অবরোধ করেছে। ডিগলিপুরে আসার আগে তার পরিকল্পনা ছিল আন্দামানে উদ্বাস্তুদের মধ্যে সে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেবে। কিন্তু জাহাজে তার স্ত্রীর মৃত্যু তার সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে দেয়।

ডিগলিপুরে এসে সে দেখে রঞ্জু ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। রঞ্জুর প্রতি সে ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে ওঠে। রঞ্জু থেকে সে সব দিক দিয়েই বড়। বয়সে, লেখাপড়ায়, রাজনীতিতে তার অভিজ্ঞতাও আছে। সে তুলনায় রঞ্জু একটা ভ্যাগাবন্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। তবু সকলের মুখে ওর নাম।

রঞ্জু মুদির দোকান দিচ্ছে শুনতে পেরে সীতানাথ আরও রেগে যায় মনে মনে। তার

যেন সবসময় মনে হয় জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে রঞ্জু তার থেকে এগিয়ে যাচ্ছে। তার ইচ্ছে ছিল একটা কাপড়ের দোকান দেওয়া। এখন ওর আগেই দোকানটা দিয়ে ফেলল রঞ্জু। যদিও মুদিখানার দোকান, কাপড়ের দোকান নয় তবু সীতানাথ যেন বন্ধুকে ক্ষমা করতে পরে না। ঈর্ষা থেকেই শত্রুতা আসে। আর ঈর্ষার কোনও কারণ নেই।

সন্ধ্যার আর দেরি নেই। পাখিরা কিচিরমিচির করতে করতে বাসায় ফিরছে। একা একা নির্জন রাস্তা ধরে হেঁটে বাড়ির দিকে যাচ্ছিল সীতানাথ। এমন সময় দেখল তার আগে একটি লোক যাচ্ছে।

সে ডাকল, কে যায়?

লোকটি থমকে দাঁড়াল। বুড়ো হয়ে গেছে লোকটি। মাথায় পাকাচুল। হাঁটুর ওপর ধুতি। ধুলিমলিন পথ ধরে লোকটি একাই এগিয়ে যাচ্ছিল।

সীতানাথ গিয়ে তাকে ধরে ফেলল। একটি মধ্যবয়স্ক লোক। আপনাকে আগে দেখছি বলে মনে হয় না।

আমরা ছমাস হইল আসছি।

কোথায় আছেন?

পাঁচ নম্বরে জমি পাইছি।

দ্যাশ কোথায় ছিল?

ঢাকা বিক্রমপুর। আপনার?

খুলনে।

খুলনের কোথায়?

বাগিরহাট।

আপনার নামডা জানতি পারি?

সীতানাথ মণ্ডল।

লোকটি বলল, আমার নাম সুদাম সরকার।

সীতানাথ লোকটির সঙ্গে খেজুরে আলাপ জুড়ে দিল।

ডিগলিপুর কেমন লাগতিছে আপনার?

জায়গাডাতো ভালোই। তবে সরকার কিছু করে না।

সরকারে কিছু করবে না। রিফিউজিদের সরকার জঞ্জাল মনি ভাবে। কোনও রকমে তাড়ায়ে নিয়ে এসিছে। ব্যস। এই দ্যাখেন না মোষ দেবে দেবে করি আজ দু বছরের ওপর আমাদের আশায় আশায় রেখি দেছে। আপনে কি ভাবেন, আমরা সব্বাই ভিখিরি ছিলাম। বাগেরহাটির যে কোনো লোকরে আমার নাম জিগাইবেন। আমি বাগিরহাট ইস্কুল থে ম্যাট্রিক পাশ করছি। আই অ্যাম দি ওনলি ম্যাট্রিকুলেট ইন ডিগলিপুর। আমি হক সাহেবের সঙ্গে রাজনীতি করা ছেলে। এপারে আমি—সুরেশ বাঁড়ুয্যেরে চেনেন—পিএসপি নেতা, আমি তাঁর প্রিয় পাত্র ছেলাম। অথচ আমি ওই বিকাশ দত্তর তাঁবেদার হতি পারিনি বলে আমারে পাত্তা দেয় না।

যাক, আপনার কথা শুনি। আপনার পরিবারের কি সবাই আসছেন?

সাতক্ষীরের পাটকেল ঘাটায় আমার বড় মেয়ের বিয়া দিছি। মেয়ে জামাই পাকিস্তানে রয়ে গেছে। ওরা আসল না। ছোট দুই মাইয়ারে নিয়া আসছি। আমার সোমত্ত মেয়ে, তারে আর পরিবারের নিয়া গত বছর এপারে আসছি। পাছপোর্ট করাই ছিল। ইন্ডিয়া ঘুরতে যাচ্ছি বলে ভিসা নিয়ি চলে তো আলাম। তারপর পুনর্বাসন নিয়া টালবাহানা। অবশেষে আসে পড়লাম আন্দামানে। এখন কিন্তু সবাইকে আন্দামান পাঠাচ্ছে না। আমার জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে অফিসারদের নেহাত জানাশোনা ছেল তাই। নয়তো আন্দামান আসার চান্স জীবনে হত না।

আপনি এদিক কোথায় আসিছিলেন?

ব্যারাকের কাছে একজন জমি পাইছে। নাম সন্তোষ মণ্ডল, চিনেন?

হ্যাঁ চিনবনা ক্যানে?

সন্তোষ মণ্ডলের পোলাডার সঙ্গে যদি মাইয়াডার বিয়া দিতি পারতাম। তাই আসছিলাম কথাবার্তা বলার জন্যি।

সীতানাথ একটু অবাক হয়ে বলল, সন্তোষ মণ্ডলের পোলা—কোন পোলা—বড় পোলা?

হ।

তার নাম কি ভূতো? ভূতনাথ মণ্ডল?

হ্যাঁ, আপনে চিনেন?

চেনবনা ক্যানো। ভূতনাথ মানে কালো বেঁটে করে?

হ্যাঁ। ক্যামন ছেলে?

বিয়ের পাকা কথা হয়ে গেছে নাকি?

তেমন কিছু নয়। বুড়ো এখন নানান ধানাই পানাই করে। ইদিকে বাড়িতে সোমত্ত মেয়ে আমি আর কতদিন পুষে রাখি কন তো দেখি? জমিটাও পাইচি একেবারে জঙ্গলের ভেতর। আমাদের উদিকে আবার বড় বড় ইন্দুরের উৎপাত।

তাই নাকি? সীতানাথ অবাক হয়।

এক একটা বিড়ালের মতো ইন্দুর।

ইন্দুর ধরা কল নাই?

কল পাব কোয়ানে?

বিকাশ দত্ত আছে না। ওদের কাছে চাইবেন। অনেক কল সরকার থেকে দিয়েছিল। আপনার সঙ্গে রঞ্জু করে কারও আলাপ হয়েছে?

সুধীরঞ্জন দাস তো?

হ্যাঁ।

ওরে কে না চেনে। খুব পরোপকারী।

উপকার পাইছেন নাকি কিছু?

পাই নাই। সবাই কয়।

একটু সাবধান থাকবেন। ধান্দাবাজ ছোকরা।

শুনলাম একটা দোকান দেচ্ছে।

হ্যাঁ, মুদিখানা। আমারও দোকান দেওয়ার প্ল্যান আছে। তবে আমি দোকান দিলি বড় দোকান দেব। মুদিখানা দোকান দেব না।

সুদাম সরকার বলল, ব্যবসা যদি করতি পারেন, তাতে টাকা আছে।

ব্যবসা করব, তবে আমি ব্যবসায়ী হতে চাই না। ব্যবসা করে কিছু টাকা তোলব রাজনীতির জন্যি।

আপনি রাজনীতি করতেন কইছিলেন বটে—এখন ছাড়ান দেছেন নাকি?

রাজনীতির এখানে স্কোপ কোথায়? ইলেকশন আসুক আমি একদিন পার্লামেন্টে দাঁড়াব দ্যাখবেন। দিল্লি না হলি পলিটিক্স করে আরাম?

আপনি কোন দলে আছেন?

এখন কোন দলি নেই। আমি নির্দল বলতি পারেন। তবে মনের দিক থেকি আমি একজন কমিউনিস্ট।

মানে কাস্তে হাতুড়ি পার্টি?

হ্যাঁ! তবে এটা আমার মনের কথা। বাইরে প্রকাশ করি না। আগে ভোট আসুক, তারপর দ্যাখব কোন পার্টিতে যাই।

আর কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর সুদাম সরকার বলল, তাহলে আসি। আপনার সঙ্গে আলাপ কইর‍্যা বেশ ভালো লাগল। একদিন আসেন আমার বাড়িতে।

সীতানাথ এই আমন্ত্রণের জন্যই অপেক্ষা করছিল। সে বলল, ঠিক আছে। একদিন যাব। তবে আমার পক্ষে সব সময় ঘর থেকে বেরোনো একটু অসুবিধে। একা মানুষ। হাত পুড়িয়ে খাই। পাঁচ বছরের একটা বাচ্চা মেয়ে আছে। তারেই দেখতে হয়। সে আর আমায় কত দেখবে।

সুদাম সরকার বলল, আপনার পরিবার নাই?

সীতানাথ বলল, গত হয়েছেন। ডিগলিপুরে আসার পরই বিনে চিকিচ্ছেয় তিনি মারা যান। সরকার কোনও কেয়ার নেয় নাই। আমাদের গেরু গাধার মতো আনছে জানেন। এই জন্যিই তো এই সরকারের বিরুদ্ধে আমার এত রাগ। আপনার কী মতামত আমি জানি না। তবে আপনি আর কিছুদিন থাকেন, বোঝবেন কী অবহেলার মধ্যি আমরা আছি।

দিন দশেকের মধ্যেই রঞ্জুর মুদিখানা দোকান খুলে গেল। প্রথম দিনই বেশ ভালো বিক্রি হল।

অনেক লোকই এসেছিল। রঞ্জু নিজেই ওজন করে মাল দিল সবাইকে।

কেউ কেউ বলল, দোকানে একজন কাউকে সঙ্গে রাখো। একা তুমি সামাল দেবার পারবা?

রঞ্জু বলল, এইটুকু তো দোকান তার আবার কর্মচারী।

কিন্তু তোমার তো নানা কাজ। তার ওপর পোর্টব্লেয়ার যাওয়া আছে।

তখন দোকান বন্ধ থাকবে। দোকান তো আমার ব্যবসা নয়। এটাকে একটা ক্লাব ধরে নিতে পারেন। আপনারা পাঁচজন আসবেন। গল্প গুজব করবেন। তাছাড়া এখানে শিগ্‌গিরই বাজার বসে যাচ্ছে।

একজন বলল, সীতানাথ নাকি একটা কাপড়ের দোকান দেচ্ছে?

রঞ্জু বলল, তা দিক না, তাহলে তো ভালোই হয়। একটা কাপড়ের দোকান এখানে খুব দরকার।

একজন এসে বলল, এই যে রঞ্জু তোমার দোকানে তামাক আছে?

না দাদা। তামাক নেই।

ভাবলাম তোমার দোকান হইল, এহন যে তামাকের জন্য এরিয়েল বে ছুটতে হবে না নে, তা আমার আর কী লাভ হল কও।

রঞ্জু বলে, আমার সামান্য পুঁজি। তাও নিজের পুঁজি বলতে কিছু নেই। কাননবাবু অর্ধেক মাল ধারে দিয়েছেন।

দোকানডা বাড়াও রঞ্জু। আরও মাল আনাও। বিক্রির অভাব হইব না।

পরের জাহাজে সীতানাথ পোর্টব্লেয়ার চলে গেল। উদ্দেশ্য ছিল পোর্টব্লেয়ার গিয়ে সে বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করে আসবে।

কিন্তু গিয়ে হতাশ হল সে। কংগ্রেসের অফিস আছে। কিন্তু বামপন্থীদের কোনও অফিস চোখে পড়ল না। ফেরার সময় কয়েকটি কাপড় নিয়ে এল সীতানাথ। কাপড়গুলি বিক্রি হয়ে গেল দুদিনের মধ্যেই। তারপর একদিন সকাল বেলা হাজির হল সুদাম সরকারের বাড়ি।

সুদাম সরকার তখন মাঠে। এখনও ভালো করে বাড়িটা তৈরি করতে পারেনি। একটি মাত্র ঘর। সামনে একটু ছোট দাওয়া। উঠোনটাও আগাছায় ভর্তি। সেই অপরিষ্কার উঠোনটি শক্ত ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করছিল একটি মেয়ে। বছর কুড়ি-বাইশ বয়স হবে। কালো রং। মুখশ্রী খুব ভালো নয়। পরনে একটি খয়েরি রঙের মিলের শাড়ি। গায়ে কমলা রঙের ব্লাউজ। মেয়েটি সীতানাথকে দেখে তাড়াতাড়ি ঝাঁটা রেখে দিয়ে বলল, কাকে চাই?

এটা কি সুদাম সরকারের বাড়ি?

হ্যাঁ। আপনে?

আমার নাম সীতানাথ মণ্ডল।

বসেন। বাবা মাঠে গিয়েছে। আসতে তো বেলা হবে।

আমি বরং মাঠেই যাই। কতদূর?

ওই তো দেখা যায়। আপনি না হয় বসেন, আমি ডাইক্যা আনছি।

চলেন, আমিও না হয় আপনার সঙ্গে যাই। বাড়ি থেকে বেরিয়ে উলটো দিকের

পথ ধরল মেয়েটি।

সীতানাথ বলে, আপনাদের জমিডা কোথায়? ধানি জমি-না পাহাড়ি জমি?

পাহাড়ি জমি অ্যালট হইছে সম্প্রতি। বাবা গ্যাছে সেই জমিডারে সাফ করতে।

কতদূর?

তা প্রায় আধা ক্রোশ হবে। মেয়েটি আগে আগে যাচ্ছে। সীতানাথ পিছনে। দুদিকের জঙ্গল এত ঘন যে সূর্যের আলো ঢোকে অনেক কষ্টে ফাঁক ফোঁকর দিয়ে। মেয়েটির দেহের একটি আলগা চটক আছে। হাঁটার সময় সেটি বোঝা যায়। মুখশ্রী যে সুন্দর নয় সেটা পিছন থেকে বোঝা যায় না। ব্লাউজের ওপর গলার অনাবৃত অংশটুকু বেশ পুরুষ্টু ও ভরাট। মাথার চুলও বেশ বড়। আলগা খোঁপা করে জড়ানো আছে চুলের গুচ্ছ।

সীতানাথ যেতে যেতে কথা বলে, আপনার নামটি কী?

ছায়া।

আপনি কি একমাত্র মেয়ে নাকি সুদামবাবুর?

ছায়া এবার একটু ঘুরে দাঁড়াল। সীতানাথের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলে, না আমরা তিন বুন। দুই দিদির বিয়ে হয়ে গ্যাছে। আমরা আগে কুপার্স ক্যাম্পে তিন বছর আছিলাম। ওখানেই মেজ দিদির বিয়া হল। মেন ল্যান্ডে আছে ওরা। এহানে আমি আর আমার ছোট বুন ও বাবা থাকি।

আপনার মা নাই? সীতানাথ প্রশ্ন করে।

না। দাঙ্গায় আমার মা মারা যায়।

বিক্রমপুরে?

না কুমিল্লায়। আমরা যখন পলায়ে আসছিলাম সে সময় চান্দপুরের কাছে নৌকো অ্যাটাক হয়। একটা গুলি লাগছিল মা-র বুকে। আমরা কোনওরকমে পলাইয়ে আসি। মা ওইখানেই মারা যায়।

আহারে। কত সালের ঘটনা?

ফিফটি থ্রিতে।

এখানে কেমন লাগে?

ভালোই।

আপনার বাবা বলছিল খুব ইন্দুরের উৎপাত।

ছায়া হেসে ফেলল। বলল, আর কয়েন না। ইন্দুর না বিড়াল তা বোঝা দায়। তবে কল বানায়ে ইন্দুর মারছি অনেকগুলা। আপনে ক-নম্বরে থাকেন?

তিন নম্বরে।

জমিতে ইন্দুর নাই?

অত নাই। আমার জমি আবার উইয়ের ঢিবিতে ভর্তি।

হরিণ কেমন ওদিকটায়?

তা আছে অনেক। তবে আমার অত হ্যাপা সামলাতে হয় না।

কেন?

আমি তো আর নিজি চাষ করি না। ভাগে দে দিছি। তারাই হরিণ তাড়ায়।

কেন, আপনে চাষ করেন না কেন?

আমার একটা বাচ্চা মেয়ে আছে। মাত্র পাঁচ বছর বয়স। সেডারে দেখাশোনা করতি হয়। তাছাড়া আমি পলিটিক্স করব ঠিক করছি—

সেডা কী?

যারে রাজনীতি কয়। ক্ষ্যামতা না থাকলি কেউ পাত্তা দেয় না। রিফিউজিদের এখানে নিয়ে এসে ফেলায়ে সরকার আর তাদের দিকি নজর দেচ্ছেনা। আমাদের মধ্যি যতদিন না নেতা জন্মাবে ততদিন আমাদের কোনও উন্নতি হবেনানে। আপনি ইস্কুলে পড়ছেন?

ছায়া জবাব দিল, গ্রামে দু ক্লাস পর্যন্ত পড়ছি। তারপর ছাড়ান দিয়া বাড়ি বসে ছেলাম। আমার বাবা আবার মাইয়াদের অত নেকাপড়া পছন্দ করেন না।

ওরা এসে পড়ল পাহাড়ি জমিতে। রাস্তাটা ক্রমশ উঁচু হয়ে পাহাড়ের ওপর উঠে গেছে। এখানে দাঁড়ালে নিচের বসতিগুলি দেখা যায়। ছোট ছোট অনেক ঘর হয়ে গেছে নিচে। অনেক বাড়ি থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে।

সুদাম সরকার তার মাঠে বসে জিরিয়ে নিচ্ছিল। অনেকখানি জঙ্গল সাফ করা হয়েছে।

সুদাম সীতানাথকে দেখে প্রথমটায় চিনতে পারেনি। মাত্র একদিন দেখেছে। তাও সন্ধ্যা হয় হয় তখন। তাছাড়া এই এতদূর পথ ভেঙে সীতানাথ যে আসবে তা ভাবতে পারেনি। ছায়াই বলল, বাবা সীতানাথবাবু আইছেন, তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য। উনি গেছলেন আমাগোর বাড়ি। তা তুমি কখন ফেরবা না ফেরবা আমি তাই এনারে সঙ্গে করে নিয়ে আলাম।

সীতানাথ বলল, আপনারে সেদিন কথা দেছিলাম আসব। তাই আলাম। আপনে ধানি জমি পেলেন ওখানে আর পাহাড়ি জমিটা এত দূরে?

সুদাম চিনতে পারল এতক্ষণ পর। ও আপনে সীতানাথবাবু? কী সৌভাগ্য আমার। চলেন, চলেন, ঘরে চলেন।

সীতানাথ বলল, আপনার পাহাড়ি জমিটা কিন্তু বড্ড দুরি হয়ে পড়িছে। পালটাবার চেষ্টা করেন নাই?

করি নাই আবার? সবাই কইল, রঞ্জু দাসরে ধরতে। আমি রঞ্জুবাবুর সঙ্গেও কথা কইছি। সেও তো আমায় ঘুরায় খালি।

সীতানাথ বলে, সে আপনার জন্য কিছু করবে নানে। পেয়ারের লোকেদের জন্যই খালি করে। আপনারে বলছি না সেদিন?

যা কইছেন। গরিবের কেউ মুরুব্বি নাই। গাঁয়ে কি না ছেল আমাদের। আমাদের

আজ ভিখারি বানাইল সরকার।

ওই নেহরুই দেশ ভাগ করছে মনে রাখবেন। নেহরু-জিন্না-গান্ধি এই তিন সর্বনাশের মূল। কে যেন কয়েছিল না, বাংলারে বাদ দিয়াই স্বাধীনতা আসুক। বাঙালিরা ওদের চক্ষুশূল। আর ওদির যারা মদত দেয়, তাদের আমি দালাল বলি।

সীতানাথকে ওরা না খাইয়ে ছাড়ল না। তাড়াতাড়ি ছায়া খ্যাপলা জাল নিয়ে বেরুল। কিছুদূর গেলেই সমুদ্রের ব্যাক ওয়াটার। সেখানে জাল ফেললে কিছু না কিছু মাছ ধরা পড়ে।

সুদাম মেয়েরে বলল, জলে নাবিস সাবধানে। কুমির-টুমিররে বড় ভয় করে।

সীতানাথ বলে এদিকটায় কাটছে নাকি কারেও?

সুদাম বলে, কাটে নাই কারেও। তবে প্রায়ই দেহা যায়। মুখ বাড়ায়ে জলে ভেসে আছে।

সীতানাথ বলল : আমাদের পাড়ায় একজনেরে নে গেছে এর মধ্যে। এই তো কদিন আগে নটবর মিস্ত্রির বউ নালায় গেছে বাসন মাজতি। পা ধোয়ার জন্যি জলে নেমে দ্যাখে কেমন কেমন ঠেকতিছে। পায়ের নীচে কাঠের মতো ঠেকে। অথচ নরম কাঠ। তাড়াতাড়ি উঠি এসে দেখে সেই কাঠ সচল হয়ে ভোঁস করি ভেসে উঠেছে একটা বিরাট কুমির। নটবরের বউ তো বাসন-কোসন ফেলায়ে থুয়ে হাঁক পেড়ে দে দৌড়।

সুদাম বলে, তাই তো সবাইরে কই, সাবধানের মার নাই। শ্যাষ ম্যাষ কি বিদেশে আইছি কুমিরের প্যাটে যাওয়ার জন্যি? আপনি আজ আইয়া পড়ছেন ভালো হইছে। আপনারে একডা জিনিস খাওয়াব আজ। কি কন দেখি? সীতানাথ হেসে বলল, ঠাহর হচ্ছে না।

সুদাম বলল, হরিণের মাংস।

মারছেন নাকি হরিণ?

কাল একডারে মারছি। রোজ রোজ হালায় ফসল নষ্ট করে। কাল ফাঁদ পাতে রাখছিলাম। একডা ধরা পড়ছে। কাল ওডারে মেরে অর্ধেকটা খাইছি। অর্ধেকডা আছে। আগে কোনওদিন হরিণ খাইছেন?

খাইনি। তবে শুনছি ছিবড়া লাগে।

সে সম্বর হরিণ। এ হরিণ দ্যাখবেন, খুব নরম মাংস। দেশে বইয়্যা তো অনেক জানোয়ার খাইছি, যেমন ধরেন খরগোশ, বুনো শুয়োর, শজারু। কিন্তু হরিণ তো দেশে বইয়া পাই নাই। শুনছি হরিণ মারার লাইগা বন্দুক দেবে প্রত্যেকেরে—তখন হরিণ খাওয়া যাবে বেশি করে।

হরিণের মাংস, সমুদ্র থেকে ধরা মাছ, খেতের কুমড়ো বেগুন ট্যাঁড়শ দিয়ে চচ্চড়ি—পাশে বসে ছায়া খাওয়াল। মেয়েটিকে দেখে বেশ ভালো লেগে গেল সীতানাথের। ভীষণ স্মার্ট আর কাজের মেয়ে।

খাওয়া দাওয়ার পর সীতানাথ সুদামকে আলাদা করে ডেকে বলল, আপনারে একটা কথা বলি। আমি ফ্র্যাংক মানুষ। ফ্র্যাংক কথা কব। আপনার মেয়েডারে যদি দেন আমি বিয়ে করতে চাই। আমার কথা তো সব বলিছি আপনারে। আমি ম্যাট্রিকুলেট।

সুদাম বলল, আপনার মতো শিক্ষিত মানুষ যদি আমার মুখ্য মাইয়াডারে নেন তাহলে তো আমি বেঁচে যাই ছার।

আনন্দের আতিশয্যে সুদাম তার হবু জামাইকে সার সম্বোধন করে ফেলে।

সীতানাথ বলে, দ্যাখেন, আমার কাছে মনডাই হল সব। লেকাপড়া বেশি জানি কি হাত পা গজাবে? আমি লেখাপড়া চাই না। কাজ কম্মো জানা চটপটে একডা মেয়ে চাই। বিয়া আর করব না ঠিক করেছিলাম। তা সবাই মিলে এমন করি ধরি পড়তিছে যে তাদের কথা ছাড়ান দিতিও পারি না। কচি মেয়েডার কথাও তো ভাবতি হয়। তবে একটা শর্ত আছে সুদামবাবু। শর্তটা সামান্যই। আমারে পানশো টাকা নগদ দিতি হবে। আমি কাটা কাপড়ের দোকান দেব ডিগলিপুরি। এবার পোর্টব্লেয়ার থেকি কিছু কাপড় আনছিলাম। কিন্তু পুঁজি বেশি ছিল না বলি বেশি আনতি পারিনি। এখন থেকে যদি দোকানডা দিতি পারি তাহলি কয়েক বছরের মধ্যেই দাঁড়ায়ে যাব। পলিটিক্স করতি হলি অনেক টাকার দরকার। আপনার মেয়েরে আমি সব শেখায়ে পড়ায়ে নেবানে। এখন টাকাডা দিতি রাজি কিনা বলেন—যদি রাজি থাকেন তো বিয়েডা তাড়াতাড়ি লাগায়ে দেন।

সুদাম রাজি। দোজবরে হলেও সীতানাথ পাত্র খারাপ নয়। শিক্ষিত। ভালো স্বাস্থ্য। বয়স এখনও ত্রিশের ঘরে। একটা মাত্র মা মরা মেয়েকে নিয়ে নিশ্চয়ই বিব্রত হয়ে আছে বেচারা। পাঁচশো টাকার সংস্থান তার আছে। জামাই যদি দোকান দিয়ে দাঁড়াতে পারে তা মন্দ কি।

সে বলল, রাজি। আপনি বিয়ের তারিখ টারিখ দ্যাখেন।

যাবার সময় সুদামই বলল, মেয়েকে একটু এগিয়ে দিতে। খাওয়া দাওয়ার পর আবার যেতে হবে জঙ্গলের অর্ধসমাপ্ত কাজ শেষ করার জন্য। বিয়ের মোটামুটি পাকা করে ফেলেছে ওরা। পুরুত যদি না থাকে নিজেরাই মালা বদল করে বিয়ে করবে।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সীতানাথ আর ছায়া দুজনে নীরবে হেঁটে যাচ্ছিল। ছায়া সবই শুনেছে। সে কোনও কথা বলছিল না।

যেতে যেতে সীতানাথ লক্ষ্য করল ছায়া কোন ফাঁকে শাড়িটা পালটে টিয়া রঙের একটি ভালো শাড়ি পরে এসেছে। চুলে ফুলও দিয়েছে।

সীতানাথ বলল, তুমি সাজিছ দেখতিছি। কোথাও বেড়াতি যাবা নাকি?

ছায়া সলজ্জ চোখে তাকাল। কোনও কথা বলল না।

তার চোখের দিকে দৃষ্টি রেখে সীতানাথ থমকে দাঁড়াল। তারপর বলল, সব শোনছ তো?

ছায়া সলজ্জ গলায় বলল, কী শোনব?

কিছুই শোনো নাই? আমারে পছন্দ হয় তো?

ছায়া সরাসরি সে কথার জবাব না দিয়ে বলল, আমি এহন আসি। আপনে যেতে পারবেন তো?

কী কথার কী জবাব?

আমি আসি।

ছায়া চলে যেতে চাইছিল। কিন্তু এক হাতের ঝটকায় তাকে ধরে বুকের কাছে টেনে নিয়ে এল সীতানাথ। সেই মুহূর্তে ছায়া ভাবছিল গত কাল ফাঁদ পেতে ধরা হরিণীটির কথা। গর্তের মধ্যে বন্দি হরিণীটাকে প্রথম যখন আবিষ্কার করল, তখন সেও অজানা আশঙ্কায় দুরু দুরু করে কাঁপছিল।

এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে চলে গেল ছায়া।

সেই দিকে তাকিয়ে সীতানাথ চেঁচিয়ে বলল, তুমি রাজি কিনা বলে গেলা না

কিন্তু ছায়া ততক্ষণে দূরে চলে গেছে।

কিছুদিন থেকে পি ডবলু ডির লোকজন এসে ডিগলিপুরে কালপং নদীর উত্তরপাড়ে কতকগুলি সরকারি বাড়ি তৈরির কাজে হাত দিয়েছিল। দরমার বেড়া। মাথায় করোগেটেড টিনের ছাদ।

বিকাশ বাড়ি তৈরির কাজকর্ম তদারক করতে আসার সময় রঞ্জুর দোকানে এসে বসে।

রঞ্জু হয়তো তখন খদ্দের সামলাচ্ছে। বিকাশকে দেখে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ে রঞ্জু। একটু বসুন বিকাশদা। আমি এইটা সামলে এখুনি আসছি আপনার কাছে।

বিকাশ বলে, না-না তুমি ব্যস্ত হয়ো না। কাজ করো। দোকানের সামনে বেঞ্চে বসে পড়ে বিকাশ। মউজ করে একটা সিগারেট ধরায়।

যারা দোকানে মাল কিনতে এসেছিল তারা বিকাশকে দেখে বলে, নমস্কার দত্ত বাবু। আমাগোর গোরু মোষ কবে আসবে?

আসবে। আসবে। এত ব্যস্ত হওয়ার কী আছে। গোরু মোষ না থেকেই যা ধান তুলছ তাই রাখার জায়গা হচ্ছে না। গোরু মোষ দিয়ে চাষ করলে তখন কি ধান সমুদ্দুরে ফেলে দেবে?

তহন আমরা ব্যাচব। ধানের দাম নাই নাকি? এহানে বিক্রি না হয় পোর্টব্লেয়ার পাঠাব। তাই বলে গোরু মোষ আসবে না? সারা জীবন আমরাই গোরু মোষ হয়ে খাটব নাকি?

বিকাশ বলল, না-না তা কেন? কবে আসবে জিজ্ঞাসা করলে কিনা। আমি তাই বললাম। তুমিও যেখানে আমিও সেখানে। আমি কি বেশি খবর রাখি? হারাধনদা প্রাণপণ চেষ্টা করছেন শুধু এইটা বলতে পারি।

খদ্দের চলে যাবার পর সব ফাঁকা হয়ে গেলে রঞ্জু বলে, ওদের সঙ্গে খামোখা কথা বাড়াবেন না বিকাশদা। ওরা যে কোনও ছুতোয় এখন সরকারি লোকজনদের অপমান করতে চায়। আসলে উসকানি আসছে এক জায়গা থেকে। সীতানাথ এখানে একটা দল করার চেষ্টা করছে। দিন-রাত কান ভাঙাচ্ছে।

দেব রিপোর্ট করে। পুলিশ এসে তুলে নিয়ে যাবে।

না-না। সেটা খুব খারাপ হবে। আমরা ওর মোকাবিলা করব। আমার হাতেও ছেলে কম নেই। কিন্তু আমরা তো এখানে অশান্তি করতে আসিনি। তাই চুপচাপ সহ্য করি অনেক জিনিস।

শোনো, সীতানাথ একটা কাপড়ের দোকান দিতে চায়। আমার কাছে জমির জন্য দরখাস্ত দিয়ে গেছে।

সে তো ভালোই।

আমাদের বাজারটা তো বসাতেই হবে। দোকানের জন্য যে জায়গাগুলো ইয়ারমার্ক করা আছে সেখানে দোকান করতে পারে। তুমি যেমন করেছ। তা তোমার দোকান কেমন চলছে?

দোকান বোধহয় বেশিদিন চলবে না, একটু হেসে রঞ্জু বলে।

কেন? এই তো বেশ ভিড় হচ্ছে।

অধিকাংশ লোকই বাকি রেখে যাচ্ছে! দিনে দশ-বারো টাকার মাত্র ক্যাশ সেল। কাননবাবুর কাছে ধারে মাল নিয়ে আসি। কিন্তু আগেরটা শোধ করে তবে তো আবার পরে মাল নিতে হবে।

তুমি ধারে দিচ্ছ কেন?

তা নাহলে ওরা মাল কোথায় পাবে বলুন। নগদ টাকার এখানে বড় অভাব।

এক এক সময় বিমল আসে। হয়তো খদ্দেরের ভিড় সে সময়। তখন রঞ্জু বলে, বিমল আমায় একটু সাহায্য করো।

দোকানদারি করতে বেশ মজা পায় বিমল। রঞ্জু হয়তো বলে, বিমল এক পোয়া চিনি দে তো। বিমল লবণ কোথায় আছে দেখ তো? তেলের জায়গা এনেছেন? বিমল আট আনার তেল দে এখানে।

খদ্দের চলে গেলে কাচের বয়েম থেকে বিস্কুট বার করে রঞ্জু বিমলকে দিয়ে বলে, খা বড্ড খেটেছিস আজগে।

রঞ্জু তখন ক্যাশ সামলায়। বাকির খদ্দেরদের নামে হিসেব লিখে রাখতে হয়। এই লেখালেখির জন্যই এক হাতে সামাল দেওয়া যায় না।

রঞ্জু বিমলকে বলে, বিমল আমি যদি চলে যাই, তুই আমার কাজগুলো সব দেখতে পারবি তো?

কোন কাজগুলো রঞ্জুদা—?

এই আমার ফুল গাছগুলো, আমার দোকান, আমার বুড়ি মা—

ওতো তোমার নিজের মা নয় শুনছি।

তুই কার কাছ থেকে শুনলি?

আমি শুনছি তুমি নাকি বানভাসি? বানের জলে ভাসে আইছ? তুমি মায়ের কুড়ানি ছেলে।

তা এক রকম বলতে পারিস। পেটে ধরলেই শুধু মা হয় না। যে মা লালন পালন করে, নিজে না খেয়ে সন্তানকে খাওয়ায়—সেই আসল মা।

বিমল বলে, তোমার ছোটকালের কথা কিন্তু আমাদের একদিনও কও নাই রঞ্জুদা—

রঞ্জু বলে, আমিও তোদের মত ছোট ছিলাম। ঢাকা জেলার গ্রামে মানুষ হয়েছি।

: কিন্তু তোমার কথা তো ঢাকার কথা নয়।

: আমি যে ছোটকাল থেকে কলকাতায় মানুষ। তোর ভাইয়ের বয়স থেকে কলকাতায় আছি। আমরা যখন যাদবপুর বাঘা যতীন কলোনিতে ছিলাম তখন সেটাও গাঁ। ঘুরতে ঘুরতে কোথা থেকে কোথায় এসে হাজির হয়েছি দ্যাখ। ডিগলিপুরের নামও ছোটবেলায় শুনিনি। আর কি জন্যই বা শুনব। ডিগলিপুর তো একটা জনহীন দ্বীপ। আজ সেই দ্বীপে আমরা বাস করছি। ভাবা যায়?

এমন সময় একজন খদ্দের এসে পড়ায় ওদের কথা চাপা পড়ে যায়।

খদ্দের বলে, সরষে আছে নাকি রঞ্জু ভাই? মাছ মারছি কাল, বউ বলল রসা করবে। সরষে নে আসো।

ফাল্গুন মাস পড়তে না পড়তেই সীতানাথের সঙ্গে ছায়ার বিয়ে হয়ে গেল। আর পয়লা বৈশাখ নববর্ষের দিনই কাপড়ের দোকানের উদ্বোধন করে ফেলল সীতানাথ।

শ্বশুর সুদাম বলেছিল, দোকান যখন করবা তখন ভালো করেই করো। পানশো টাকায় আর কত মাল হইব। আমি তোমারি দুহাজার টাকা দিচ্ছি। এই টাকার মাল পুরা বিক্রি করতে পারলে ভালোমতো দাম পাইবা।

হাজার দুয়েক টাকার শাড়ি নিয়ে সীতানাথের দোকান শুরু হল। প্রথম দিনই বিক্রি হয়ে গেল চার পাঁচটি শাড়ি। রোজই খদ্দের আসতে থাকল।

সীতানাথের সঙ্গে রঞ্জুর রোজই দেখা হয় যদিও তাদের দোকান খুব পাশাপাশি নয়। কিন্তু তাহলেও দূরত্বও বেশি নয়। দোকান বন্ধের সময় সন্ধেবেলা দুজনের

সঙ্গে রাস্তাতেই দেখা হয়ে যায়।

রঞ্জুই জিজ্ঞাসা করে, কেমন দোকান চলছে সীতানাথদা?

সীতানাথের মুখে খই ফোটে অনর্গল। সে বলে, খদ্দের প্রচুর আছে। কিন্তু পছন্দমতো মাল পাওয়া ভার। ভাবছি এবার কলকাতা গিয়া হাজার দশেক টাকার মাল তোলব জাহাজে।

দশ হাজার? এত খরিদ্দার আছে ডিগলিপুরে?

তোমার কোনও ধারণা আছে রঞ্জু। অনেকেরই পয়সা আছে। এই ধ্যাড়ধেড়ে গোবিন্দপুরে পয়সা খরচার আর কোনও জায়গা আছে কি? একি আর তোমার ত্যাল নুন যে দু' পয়সা চার পয়সা করি বিক্রি হবে? এর নাম কাপড়ির দোকান, যারি কয় রীতিমতো 'টেড অ্যান্ড কমর্স।'

কদিন পরে সীতানাথ দোকানে বসে আছে এমন সময় দুটো অল্প বয়সি ছেলে এসে তার কাছে হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করল, ইধার কই কাম হ্যায়?

সীতানাথ হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করল, কী কাজ? তোমরা কারা?

ছেলে দুটির মধ্যে একজন বলল. আমরা নতুন এসেছি। যদি জমিতে চাষবাসের কাজ পাওয়া যায় তার সন্ধানে।

কোথায় বাড়ি তোমাদের?

রাঁচির কাছে মুরীতে।

কথায় কথায় জানল ওরা কলকাতায় আন্দামানের গল্প শুনেছে। ওখানে নাকি প্রচুর জমি, অথচ কাজ করার লোক নেই।

তোমরা চাষের কাজ করেছ আগে?

আমরা তো চাষের কাজই করি। বীরভূম, বর্ধমানে জমির কাজ করতে যাই। এ বছর খরা হয়েছে। সে সময় কে যেন বলল, আন্দামান চলে যাও, প্রচুর কাজ পাবে। তা আমরা তাই শুনে জাহাজে উঠে বসলাম।

কোথায় উঠেছ?

এরিয়াল বেতে রিফিউজিদের জন্য যেসব ছাউনি তৈরি হয়েছে তার একটায় আছি আমরা। এখানে এসে দেখি আমরাই প্রথম নাই, আরও চার-পাঁচজন লেবর এসেছে। তবে তারা তামিল।

সীতানাথ বলল, আমার জমি আছে। কিন্তু আমার লোক নাই, তাই ফ্যালায়ে রাখি। তোমরা রাজি থাকো তো কাল থেকেই কাজে লেগে যাও। এখানে এখনও হাল বলদ আসেনি কিন্তু।

তবে কীভাবে কাজ হয়?

পুরোনো পদ্ধতিতে। কোদাল দিয়ে মাটি কুপুইয়ে আট নং ধান ফেলে দেই। তাতেই ইদানীং চলে যাচ্ছে। তবে শিগ্‌গিরই হাল বলদ আসি যাবে।

ভবেশের সঙ্গে রঞ্জুর দেখা হতেই ভবেশ রঞ্জুর কাছে কথাটা তুলল।

তুমি শোনছ রঞ্জু। সীতানাথ তার জমিতে তামিল মজুর লাগাইছে।

রঞ্জু বলল, আমি শুনেছি। তিন চারজন তামিল ঘোরাঘুরি করছিল ওর সঙ্গে। তবে তারা তামিল নয়, রাঁচি।

তুমি এর প্রতিবাদ করলা না?

আমি এর কী প্রতিবাদ করবো? ভারতের যে কোনও নাগরিকের যে কোনও জায়গায় কাজ করার অধিকার আছে। তাছাড়া বাঙালির জমি বাঙালি যদি পুরোটা চাষ করতি না পারে তাহলে সে জমি ফেলে না রেখে মুনিষ দিয়ে চাষ করানোটা কি খারাপ?

ভবেশ বলল, তোমার কথাডা মানলাম না রঞ্জু ভাই। এইভাবে যদি বাইরে থেকে লোক আসতে আরম্ভ করে তো হইলে একদিন আমাগোর সব জমি হাতছাড়া হইয়া যাইব। হর লগে কি আমরা এই দ্বীপান্তরে আইছি?

তাহলে কি করতে বলো তুমি?

আমাগোর মধ্যি এমন নিয়ম করার দরকার যে যার জমি সে জমি সে নিজে চাষ না করল সরকার সে জমি নিয়া যে চাষ করতে চায় তারে দেবেন।

রঞ্জু বলল, তাহলে তো আমার জমিও সরকারকে ফেরত দিতে হয়। আমিও আমার জমি এ বছর নিজে হাতে চাষ করিনি।

তবু তুমি তো বাইরের লোককে জমি চাষ করতে দাও নাই। তোমার হইয়া অন্যে তোমার জমি চাষ করে। সে তোমার আত্মীয়ের মতোই। ধরো, আমি কোনও কারণে অসুস্থ হয়ে পড়লাম, এখন আমার জমি যদি রমেশ বা রমেশের পোলাপানরা চাষ করে তাহলে সেডা অন্যায় হবে ক্যান? আমার আপত্তিডা অন্যখানে।

রঞ্জু একথার জবাব দিল না। সে বলল, ঠিক আছে, এ নিয়ে আমরা সবাইকে ডাকি। সমস্যাটা তাদের কাছে খুলে বলি। দেখি সবাই কী বলে।

রঞ্জু যখন মিটিং ডাকার তোড়জোড় করছে, সে সময় জানা গেল পরের জাহাজে রাহাবাবু আসছেন। সেই সঙ্গে নতুন তহশিলদার, নতুন ফাঁড়ির চার্জ নেবার জন্য একজন হাবিলদার সহ কজন পুলিশও আসছে এই জাহাজে।

রঞ্জু বলল, তাহলে তো ভালোই হল। আমাদের মিটিংটা আমরা কদিন পিছিয়ে দেই। ওই মিটিংয়ে আমরা সম্বর্ধনা জানাব নতুন অফিসারদের।

সব শুনে সীতানাথ বলল, সম্বর্ধনা জানানো চলবে না নে। ডিগলিপুরের মানুষের জন্যি গত দুই বছরে সরকার কী করিছে? আজও একটা হেলথ সেন্টার পর্যন্ত হল না এখানে। আমরা আমাদের অভিযোগ জানাব তাদের কাছে।

কথা হচ্ছিল রঞ্জুর দোকানে বসেই। রঞ্জুর দোকানে বিকেলের দিকে অনেকেই এসে জড়ো হয়। দোকানের সামনে বাঁশ কেটে বেঞ্চ করে দিয়েছে রঞ্জু। সেখানে বসে আড্ডা দেয় অনেকে। জাহাজে আসা পনেরো দিনের থেকে এক মাসের পুরোনো বসুমতী কাগজও রেখে দিয়েছে। সেটাই সবাই পড়ে।

রঞ্জু বলে, সীতানাথদা, এখনই যদি আমরা গর্মেন্টের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করি তাহলে যেটুকু পাচ্ছি সেটুকুও পাব না।

সীতানাথ বলে, কেন আমাদের কি সরকার দয়া করতিছে নাকি? আমরা কি বানির জলে ভাসি আইছি নাকি? আমাদের পায়ে ধরি সরকার নিয়ে আসেনি?

রঞ্জু বলে, সরকার তো এ পর্যন্ত আমাদের কম দেয়নি। আজ যেটুকু আমাদের হয়েছে তা সরকারেরই দেওয়া।

সীতানাথ বলে, আর কংগ্রেসের কত দালালি করবা রঞ্জু। তোমার মতো দালাল আমি অনেক দেখিছি। দালালদের আমি পকেটে গুঁজি।

অপমানে কান ঝিমঝিম করতে থাকে রঞ্জুর। গরম হয়ে ওঠে মাথার ভেতরটা। কিন্তু রঞ্জু জানে তার দোষ, সে চেঁচিয়ে ঝগড়া করতে পারে না। নিজেকে রক্ষা করতে জানে না সে। সে এ পর্যন্ত শিখেছে কেমন করে সুখে দুঃখে লোকের পাশে দাঁড়াতে হয়, বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাদের দিয়ে কোনও কাজ করাতে হয়। কিন্তু কোমর বেঁধে সে ঝগড়ায় নামতে পারে না।

সীতানাথ আরও কী বলতে যাচ্ছিল। কিছু লোক তাকে থামিয়ে দেয়।

মাথা গরম কোরো না সীতানাথদা। কী হবে মাথা গরম করে? এ সব কথা যদি কইতেই হয় তাহলে রাহাবাবুরে কওয়াই ভালো। তিনি তো আসছেন শিগ্‌গিরই।

এমন সময় ছুটতে ছুটতে আসে বিমল। অনেক দূর থেকে ছুটে আসছে বলে হাঁপাচ্ছে। কোনও বিপদ আপদের আশঙ্কায় দুরু দুরু বুকে এগিয়ে গেল ভবেশ। গৌরীর শরীর কিছুতেই ভালো হচ্ছে না। তার সব সময় আশঙ্কা বউকে নিয়ে। সে বলে, কী হয়েছে রে বিমল?

বিমল বলে, নটবর জ্যাঠা একটা ইয়া বড়ো কুমির ধরছে।

কুমির ধরা পড়েছে?

হ্যাঁ বড়শি গাঁথিয়া ধরছে।

কোথায়?

মগর নালায়।

কুমিরডা থুয়েছে কোথায়?

পাও আর মুক বেঁধে থুয়েছে ওরই বাড়ির উঠানে।

গ্রাম সুদ্ধ লোক ভেঙে পড়ল নটবর মিস্ত্রির বাড়িতে।

নটবর মিস্ত্রির জমির পাশ দিয়েই গেছে মগর নালা। অনেক দিন ধরে তক্কে তক্কে ছিল নটবর। নটবর মিস্ত্রি নিজের কুমির ধরার গল্প বলছিল। বার বার ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান। প্রায় প্রতি রাতেই আমার উঠোন থে মোরগা ধরে ধরে খাচ্ছে। আমি ঠিক করলাম আর না। এবার উচিত শিক্ষে দিতে লাগে। কামারের কাজ জানি। লোহার শিক দিয়া বঁড়শি বানাইলাম। তারপর লোভে পড়ে মাছ খাইতে আইল কুমিরডা।

বড় লোহার হুক তৈরি করে তার মধ্যে মাছের টোপ দিয়ে রোজ নালার কাছে বসে থাকত নটবর। হুকের সঙ্গে লাগানো ছিল শক্ত দড়ি। সেই দড়ির একটা প্রান্ত বাঁধা ছিল গাছের সঙ্গে। কুমিরটা টোপটা খেতেই হুক তার গলার টাগরায় গিয়ে বিঁধে যায়।

কুমিরটা লম্বায় দশ হাত হবে। সারা দেহটা পোড়া কাঠের মতো। লম্বা ল্যাজ, যেন এক অতিকায় গোসাপ। তার চারটে পা বাঁধা দড়ি দিয়ে। বঁড়শিটা মুখের ভেতর বেঁধা। মুখও দড়ি দিয়ে বাঁধা। কষ বেয়ে তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। কুমিরটা বেঁচে আছে কি মরে গেছে বোঝা যাচ্ছে না। কেউ বলছে মরে গেছে। কেউ বলছে, না বেঁচে আছে। দড়ি একবার খুলেই দিলেই সেটি মুহূর্তের মধ্যে জানা যাবে।

সবাই ধন্য ধন্য করল।

রঞ্জু এসে বলল, কুমিরটাকে নিয়ে এখন কি করবে ঠিক করেছ? কুমিরের চামড়া খুব দামি। যদি বিক্রি করে দাও অনেক টাকায় বিক্রি হবে।

নটবর বলল, শালারে আগে কাটি। চামড়া ছাড়ায়ে রাখি। তারপর বিক্রি হয় তো হবে। একটারে যখন ধরিছি। তখন একের পর একে ধরব।

নটবরের বউ এসে বলল, ওগো শোনছ। তুমি এখন একডু খাওয়া দাওয়া সেরে নাও। সারাদিন ভাত খায়নি লোকডা। যমের মুখ থেকি ফেরত এয়েছে।

কাল থে সমানে বলছে কুমির ধরব। আমি তো ভয়ে মরি। পুরুষ মানষের গোঁ, ঠিক ধরে তবে ছাড়ল। শোনছ, চাড্ডি খেয়ি নেবা চলো।

বাড়ি যেতে যেতে রঞ্জু ভাবছিল মানুষ প্রয়োজনে কত সাহসী হতে পারে। জঙ্গলের নদীর হিংস্র জানোয়ারকে আর সে এখন ভয় করে না। যতদিন প্রকৃতি অজানা থাকে ততদিনই প্রকৃতিকে ভয় কিন্তু যেই একবার তুমি তাকে জানতে পারলে অমনি তোমার ভয় কেটে গেল। রঞ্জু মনে মনে নমস্কার করল মানুষের ভেতরের লুকিয়ে থাকা শক্তিকে। যার আবাহন মানুষ করে এসেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী।

দিন দশেকের মধ্যে চুলঙ্গা জাহাজ এসে পৌঁছোল। জাহাজ আসার খবর ডিগলিপুরে কিছুক্ষণের মধ্যেই রটে যায়। সাধারণত জাহাজ আসার পর একটা রাত ডিগলিপুরেই থাকে। তখন যাত্রীরা পোর্টব্লেয়ারের জাহাজ কখন ছাড়বে জেনে নিয়ে ডিগলিপুরের কিছু কিছু যাত্রী পোর্টব্লেয়ারে যায়। অনেকে চিঠিপত্র লিখে যাত্রীদের হাতে দিয়ে দেয়। ওই জাহাজে ডিগলিপুরের ডাকও আসে।

জাহাজ ডিগলিপুরের কাছে সমুদ্রে নোঙর করা থাকে। জাহাজ থেকে নেমে ডুঙ্গিতে উঠে যাত্রীদের তীরে আসতে হয়। জাহাজে উঠতেও হয় ওই ভাবে।

একজন এসে রঞ্জুকে জানাল, এই জাহাজে রাহাবাবু এসেছেন। তবে তাঁর সঙ্গের মালপত্র নামবে, সেজন্য তাঁর ডিগলিপুর আসতে দেরি হবে।

রঞ্জুকে তাই এরিয়াল বে-তে যেতে বলেছেন রাহাবাবু।

রঞ্জু দোকানেই ছিল। তার দোকানে শেষের দিকে মালপত্র বেশি থাকে না।

আবার জাহাজ এলে তবে মাল আসে। জাহাজ যখন এসেছে তখন মাল আনার জন্যই এরিয়াল বে-তে যেতে হবে।

রঞ্জুর ব্যবসার অবস্থা খুব ভালো নয়। তার দোকান থেকে অধিকাংশ লোকই ধারে মাল নিয়ে যায়। উদ্বাস্তুদের প্রত্যেকের ঘরেই ধান আছে, তরি-তরকারি আছে কিন্তু নগদ টাকা নেই। সরকার থেকে চাল কিনে নেবার কথা হচ্ছে কিন্তু খুব বেশি এগোয়নি। তার পুঁজি ফুরিয়ে এসেছে এর মধ্যেই। আর কতদিন দোকান চালাতে পারবে তা সে নিজেই জানে না।

রঞ্জু এরিয়েল বে-তে যাবার সময় আরও কয়েক জনকে ডেকে নিয়ে গেল। হাজার হোক, এতদিন পরে হারাধনবাবু আবার আসছেন। এটি তাদের একটা বড় ভরসা। আরও সরকারি অফিসাররা আসছেন। সুতরাং আজকের দিনটি ডিগলিপুরের ইতিহাসে বেশ স্মরণীয় দিন।

রঞ্জুরা যখন এরিয়াল বে-তে গেল তখন সেখানে চল্লিশ পঞ্চাশজন লোকের ভিড়। কেরলপুরমের লোকেরা আগেই এসে গেছে। এরিয়াল বে-র ডানদিকে যেসব উদ্বাস্তু পরিবার পরে এসে বসবাস করছে তারাও অনেকে এসেছে। ভিড়ের মধ্যে সীতানাথকে দেখতে পেল রঞ্জু। সীতানাথ হাত-পা নেড়ে একদল লোককে কী বোঝাচ্ছে।

একজন বলল, রঞ্জুদা তুমি এসে গেছ। তুমি ওই ডুঙ্গিটায় উঠে জাহাজে চলে যাও। ওঁরা বোহয় দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে নামবেন। ওঁদের মাল নামতেছে এখন।

রঞ্জু দেখল একটি ডিঙি করে মাল নামানো হচ্ছে। কিছু মালপত্র আগেই নামানো হয়েছে। তার মধ্যে চেয়ার, টেবিল, টাইপ মেশিন, খাট, থেকে শুরু করে কাঠের আলমারি পর্যন্ত আছে। এত জিনিস কীভাবে যাবে কে জানে।

তবে কেরলপুরমে ঠ্যালা গাড়ি আছে কয়েকটি। ধান-চাল বওয়ার কাজে লাগানো হয় সেগুলি। সেগুলি এনে রাখা হয়েছে। তার ওপর মাল তোলা হচ্ছে।

রঞ্জু একটি ডিঙিতে উঠে পড়ল। মোটর লাগানো নৌকোকে ডুঙ্গি বলে। জনা দশেক লোক ধরে। ব্যাক ওয়াটারে সমুদ্র শান্ত। কিন্তু একটু ভেতরে যেতেই ঢেউয়ে নৌকো দুলতে থাকে। আর দড়ির মই বেয়ে জাহাজে ওঠা বেশ শক্ত কাজ। একটু সাহসী না হলে ওঠা মুশকিল। নিচের নৌকা টলোমলো। অন্তত চার-পাঁচতলা সমান উঁচু জাহাজে উঠতে হবে দড়ির সিঁড়ি বেয়ে। হাওয়ায় দুলতে থাকে দড়ি।

রস আইল্যান্ডে তারা এইভাবে নেমেছিল। অবশ্য ডিগলিপুরে আসার সময় বিশেষ ধরনের জাগাজ ছিল যেটি অগভীর খাঁড়িতেও ঢুকতে পারে। তাও জল কাদা ভাঙতে হয়েছে নামার সময়।

জাহাজের ডেকে উঠে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল রঞ্জু। কেবিনগুলি সব তিনতলায়। কেবিনে নক করে দেখল ভেতরে কেউ নেই।

জাহাজের ক্যাপটেন মজুমদারের সঙ্গে দেখা। তিনি চিফ ইঞ্জিনিয়র দীপঙ্কর সেনের

সঙ্গে কথা বলতে বলতে আসছিলেন। রঞ্জু বলল, চিনতে পারছেন স্যার?

ক্যাপটেন মজুমদার বললেন, আরে রঞ্জন দাস না?

হ্যাঁ স্যার। চিনতে পেরেছেন তাহলে?

দীপঙ্করদা ভালো আছেন?

দীপঙ্কর জবাব দিল, হ্যাঁ ভাই, তুমি ভালো?

হ্যাঁ।

আচ্ছা ক্যাপটেন মজুমদার, হারাধনদা কোথায়? ক্যাপটেন মজুমদার বললেন ডেকে দাঁড়িয়ে আছেন। এসো আমার সঙ্গে। তিনতলার ডেকে হারাধনবাবু ও বিকাশ দাঁড়িয়েছিল।

রঞ্জু বলল, হারাধনদা, আমরা কিন্তু খুব আশায় আশায় ছিলাম যে আপনি এবার হাল বলদ নিয়ে আসছেন।

হারাধনবাবু হেসে বললেন, বিকাশ, দ্যাখো রঞ্জু আসতে না আসতেই বলদের দাবি জানাচ্ছে। তোমায় বলেছিলাম না, বলদের বদলে মানুষ নিয়ে যাচ্ছি দেখে রঞ্জুবাবুর খুব রাগ হবে।

বিকাশ হাসতে লাগল। কিন্তু রঞ্জুর মনটা খচখচ করতে লাগল। হাল বলদ যে ডিগলিপুরের পক্ষে কতখানি জরুরি সে কী করে বোঝাবে। পর পর তিনটে মরশুম ডিগলিপুরের মানুষ কোদাল দিয়ে মাটি কেটে সেখানে চাষ করেছে। কিন্তু অর্ধেক জমিতেই ফসল ফলানো যায়নি।

রাহাবাবু নিশ্চয়ই বোঝেন এটা। কিন্তু সরকারি লালফিতার বাঁধন কিছুতেই খুলছে না।

রঞ্জুর তাই ভীষণ ইচ্ছে করে এমন একটা কিছু হতে যাতে করে তার প্রচুর ক্ষমতা থাকে। অকর্মণ্য আমলাদের বরখাস্ত করে সে দ্রুতগতি দক্ষ এক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে পারে। সরকার শেষ পর্যন্ত দেয় সব। কিন্তু এত দেরি করে দেয়, এত এলোমেলোভাবে দেয় যে তা মানুষের উপকারে আসে না শেষ পর্যন্ত।

রাহাবাবু বলেন, তোমাকে আর একটা ভালো খবর দেই রঞ্জু। বিকাশের প্রমোশন হয়েছে। সে এখানকার প্রথম বিডিও হিসেবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেল।

রঞ্জু খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। সে বিকাশকে বলল, আপনি আমাকে এটা বলেননি বিকাশদা।

বিকাশ বলল, আমিও কি জানতাম। এই জাহাজে কিছুক্ষণ আগে রাহাদা আমাকে অর্ডারটি দিলেন।

হারাধনবাবু বললেন, তোমার জন্যও ভালো খবর আছে। চিফ কমিশনার সাহেব তোমাকে দেখা করতে বলেছেন। সেবার তোমার সঙ্গে আলাপ করে খুব ভালো লেগেছে ওঁর। আমাদের সমস্ত আন্দামান নিয়ে একটি প্ল্যানিং কমিটি হচ্ছে। তাতে ডিগলিপুর থেকে তুমি একজন সদস্য থাকবে।

রঞ্জু বলে, আমি কি এসব পারব। ইংরেজি জানার দরকার। আমি গ্রামের মুখ্যু ছেলে।

হারাধনবাবু তাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে এলেন। তারপর ডিগলিপুর দ্বীপের দিকে হাত দেখিয়ে বললেন, রঞ্জু এই যে সবুজ দ্বীপটা দেখছ, এ দ্বীপটা কীভাবে তৈরি হয়েছিল জানো? কোটি কোটি প্রবাল কোটি কোটি বছর তাদের দেহ দিয়ে এই যে বিশাল সমুদ্র তাকে বেঁধে ফেলেছে। এর পিছনে আছে ত্যাগ আর ধৈর্য। মানুষের মধ্যে যদি এ দুটি জিনিস থাকে, সেই সঙ্গে যদি সততা আর পরিশ্রম করার মতো মন থাকে, তাহলে সে দু বছরেই অনেক কিছু অসম্ভব কাজ করে ফেলতে পারে। তুমি যখন পোর্টব্লেয়ারে গিয়েছিলে তখন আমি তোমাকে বলেছিলাম কি না যে তুমি আবার পড়াশোনা শুরু করো। প্রাইভেটে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষাটা অন্তত দিয়ে দাও। তোমার বুদ্ধি আছে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ম্যাচিয়ুরিটি এসে গেছে, তুমি পারবে।

আপনি ঠিকই বলেছিলেন—

কিন্তু তুমি তো তারপর আমাকে কিছু জানালে না। আমি শুনলাম তুমি মুদিখানার দোকান দিয়েছ। দোকানের মধ্যে যদি তুমি হারিয়ে যাও তাহলে আর নিজেকে খুঁজে পাবে না।

কিন্তু দোকানটাতে কত লোকের উপকার হচ্ছে।

অস্বীকার করছি না। কিন্তু ডিগলিপুরে বাজার বসছে। দোকান করার লোকের কি অভাব হবে? কিন্তু অভাব যেটা হবে সেটা তোমার মতো লোকের। সমস্ত জায়গায় অভাব হল নেতৃত্বের।

কিন্তু আমি একা লেখাপড়া শিখলে তো হল না হারাধনদা। গত দু বছর ধরে চেষ্টা করার পর সবে একটা প্রাইমারি স্কুল হয়েছে, কত ছেলের জীবনে কত অমূল্য বছর নষ্ট হয়ে গেল।

যখন একটা বিরাট ঝড় হয় তাতে কিছু গাছ তো উপড়ে পড়বেই। দেশ বিভাগ এমনি এক ঝড়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমন ঘটনা তো কখনও ঘটেনি। আমাদের ভাগ্য ভালো, ইওরোপের মতো, জাপানের মতো যুদ্ধের অভিশাপ প্রত্যক্ষভাবে আমাদের সহ্য করতে হয়নি। কোটি কোটি লোক মারা গেছে সে দেশে। শহরের পর শহর শ্মশান হয়ে গেছে। এখানে তবু তো সম্পত্তির ওপর দিয়ে ঝড়টা গেছে। তোমরা আজ হোক কাল হোক, যা হারিয়েছিলে সব ফিরে পাবে। হয় তো দ্বিগুণ করে ফিরে পাবে। কিন্তু বাবা-মা-ভাই-বোন বউ হারালে তাদের কি আর ফিরে পাওয়া যায়? সেজন্য ভাগ্যকে ধন্যবাদ দাও। আর একথা কেন বলছ যে, তুমি একা লেখাপড়া শিখছ। সব প্রদীপ তো একসঙ্গে জ্বালানো যায় না। একটা প্রদীপ আগে জ্বালিয়ে নিতে হয়। সেটা থেকে অসংখ্য প্রদীপ জ্বালানো সহজ হয় তখন।

সমুদ্রের ঢেউয়ের দোলায় জাহাজটা সামান্য দুলছিল। এখান থেকে দেখা যায়

তীরে দাঁড়িয়ে বেশ কিছু লোক। তারা এসেছে সবাইকে স্বাগত জানাবার জন্য। মাথার ওপর নীল আকাশে সাদা তুলোর মতো মেঘেরা উড়ে বেড়াচ্ছে। হারাধনদার কথাগুলো যেন দৈববাণীর মতো মনে হয়। রঞ্জুর মনে হয় সৃষ্টির প্রথম দিনে নির্জন উলঙ্গ পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে সে যেন দৈববাণী শুনছে। তার চারপাশে কেউ কোথাও নেই।

তহশিলদার কৃষ্ণমূর্তি এসে বলল, স্যার, আমাদের ডিঙি এসে গেছে। আমরা কি এবার নামব?

হারাধনবাবু বললেন, আমাদের মালপত্র?

সব নেবে গেছে।

তোমার সঙ্গে রঞ্জুর আলাপ হয়েছে তো। ফিউচার অব ডিগলিপুর। ওয়াচ হিম।

রঞ্জু হাসল অপ্রতিভ হয়ে।

রঞ্জু কৃষ্ণমূর্তিকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি মাদ্রাজের লোক?

কৃষ্ণমূর্তি বলল, না। আমরা আন্দামানের লোক। আমার ঠাকুরদার বাবা কয়েদি হয়ে এসেছিলেন। এখানেই বিয়ে-থা করে সেটল করে যান। আমার ঠাকুরদার মা ছিলেন ইউপির মেয়ে। আমার ঠাকুর্দা তামিল বিয়ে করেন। কিন্তু আমার মা আবার মালয়লম। আমি অবশ্য এখনও বিয়ে করিনি।

হারাধনবাবু বললেন, আন্দামানের যারা আরলি সেটলার তারা প্রায় সবাই কনভিক্ট হয়ে এসেছিল। এই পরিচয় কিন্তু সবাই গর্বের সঙ্গে দেয়। এমনকী, যে যত খুন করেছিল, তার পরিবারের তত বেশি প্রেস্টিজ।

কৃষ্ণমূর্তি বলল, আমার বাবা মাত্র তিনটে খুন করেছিলেন। ওঁর ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। পরে আপিলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়।

কৃষ্ণমূর্তি বলল, চলুন স্যার, যেতে যেতে কথা হবে। তারপর রঞ্জুকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি এখন কী করেন? রঞ্জুর এই প্রথম সংকোচ হল বলতে যে মুদির দোকান আছে। সে বলল, ছোটখাটো ব্যবসা করি।

হারাধনবাবু বললেন, ব্যবসা-ট্যাবসা কিছু নয়—বেশিরভাগ সময় পরোপকার করে বেড়ায়। রঞ্জুকে আমি চিনি গত পাঁচবছর ধরে বাসুদেবপুর ক্যাম্পে যখন যেতাম সেই সময় থেকে। ও তখন ভীষণ অ্যান্টি আন্দামান ছিল। তারপর আমার সঙ্গে কথা বলে ওর ভয় কাটে।

ডিঙিতে নামার আগে ক্যাপটেন মজুমদার, চিফ ইঞ্জিনিয়র দীপঙ্কর সেন ডেকে এসে দাঁড়িয়ে ওদের বিদায় দিলেন।

রাহাবাবু বললেন, মজুমদার কাল কখন জাহাজ ছাড়বে?

একটু সামান্য রিপেয়ার আছে। আজকের মধ্যে সেরে ফেলতে পারলে কাল আটটায় ছেড়ে দেব।

আটটায় ছাড়লে অত সকালে আসব কী করে? দশ মাইল রাস্তা।

কৃষ্ণমূর্তি বলল, স্যার, আমরা তো মোটর সাইকেল নিয়ে এসেছি। আপনার কোনও অসুবিধা হবে না।

হারাধনবাবু বললেন, তাহলে ঠিক আছে। আমার মনে ছিল না।

ডিঙি তীরে এসে পৌঁছোতেই ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল সীতানাথ। সীতানাথের হাতে একটি গাঁদা ফুলের মালা। সেই মালাটি সে বিনা ভূমিকায় হারাধনবাবুকে পরিয়ে দিয়ে বলল, সার চেনতে পারেন?

রাহাবাবু বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনি সীতানাথবাবু তো? তা এসব মালাটালা আবার কী?

সীতানাথ বলল, আমার গ্রামের ছেলিরা আপনাকে দেখতি এয়েছে। আপনি তো আর ইদিক পানে মাড়ান না।

হারাধনবাবু বললেন, সত্যি! বছরখানেক আসতে পারিনি ডিগলিপুরে। এখন তো দেখছি বেশ উন্নতি হয়েছে। এই তো দিব্যি রাস্তা হয়ে গেছে। আপনি এখন কী করছেন?

একটা কাপড়ের দোকান দিয়িছি।

কাপড়ের দোকান? বেশ বেশ। কোথা থেকে কাপড় আনাচ্ছেন?

পোটব্লেয়ার। এই জাহাজেই আমার মাল আসছে। এখন নে যাবো।

আপনার মেয়েটি কত বড় হল?

তা পেরায় পাঁচ বছর হতি চলল।

কার কাছে থাকে?

আমি আবার বিয়া করিছি ছার। বউর কাছেই থাকে। প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্য সীতানাথ অন্য কথা পাড়ল।

ছার, আপনার সঙ্গি আমাদের কিছু কথা ছেল।

রঞ্জু বলল, বেশ তো স্যার আজ রাত্তিরে থাকবেন। বিকেলে আসুন না সীতানাথদা। তখন কথা হবে।

সীতানাথ রেগে গিয়ে বলল, তুমি কথার মধ্যি কথা বলার কেডা? যা বলার ছার বলবেন, আমি ছারের সঙ্গে বোঝব।

তারপর সঙ্গের লোকজনের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমরা দেখতিছ তো, ছারে আসিছেন আমাদের যাতি ভালো হয় তা দেখার জন্যি। আর কিছু ফেউ আছে সেডা হতি দেবে নি। ছার নিজের চোখে দ্যাখেন। বারো হাত কাঁকুড়ির তেরো হাত বিচি।

সীতানাথের সঙ্গে যারা এসেছিল রঞ্জু সবাইকে চেনে। আশেপাশের গ্রামের বাসিন্দা সব। এদের মধ্যে দু একজন রাঁচি লেবরকেও দেখল।

রঞ্জু কোনও কথা বাড়াল না। হয়তো সীতানাথ এমন একটা দৃশ্যের অবতারণা করে বসবে যে তার সম্মান রাখা দায় হবে।

হারাধনবাবু বললেন, বেশ তো বেশি সময় যদি না নেন, তাহলে আপনাদের কথা শুনে নেই।

কাননবাবু এসে বললেন, সার, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি কথা হয়। আমার দোকানে বসুন। বসে কথা বলুন।

হারাধনবাবু বললেন, বিকাশ কোথায়?

বিকাশ এসে বলল, কিছু বলছেন হারাধনদা?

হারাধনবাবু বললেন, তুমি আমার সুটকেস থেকে ডিগলিপুরের ডেভলপমেন্ট প্ল্যানটা নিয়ে এসো তো। আর যাবার ব্যবস্থা কী করেছ?

কৃষ্ণমূর্তির মোটর সাইকেল আছে। প্রথম ট্রিপে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে চলে আসবে। দ্বিতীয় ট্রিপে আমি যাব। হাবিলদার সাহেব হেঁটেই যাবেন। নয়তো অপেক্ষা করলে থার্ড ট্রিপ হতে পারে।

এক কাজ করো, তুমি ও হাবিলদার একসঙ্গে চলে যাও। কৃষ্ণমূর্তি ছেড়ে দিয়ে চলে আসুক। আমি কাননের দোকানে এদের নিয়ে একটু বসছি।

প্ল্যানটা বার করে হারাধনবাবু সবাইকে দেখালেন। বললেন, আমাদের প্ল্যানের মধ্যে আছে আমরা রাস্তা করব। ডিগলিপুরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পিচের রাস্তা তৈরি হবে। প্রত্যেকটি গ্রামে বিদ্যুৎ থাকবে। প্রত্যেকটি গ্রামে একটি করে প্রাইমারি স্কুল হবে। সরকার এজন্য ব্যাপক টিচার রিক্রুটমেন্ট স্কিম নিয়েছেন। পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকবে। আর সীতানাথবাবু যে বাজারের কথা বলেছেন সেই বাজারও হবে।

কিন্তু সব হবে ধীরে ধীরে। আমাদের দেশে সব হয়, কিন্তু বড় দেরি করে হয়। অনেক সময় দেরি দেখে আমিও অধৈর্য হয়ে পড়ি। এই ধরুন না আপনাদের গোরু-মোষের ব্যাপারটা। গোটা আন্দামানের সেটলারদের জন্য গোরু-মোষ কিনতেই দু কোটি টাকা ব্যয় হবে। এখন কোথা থেকে গোরু কেনা হবে। কীভাবে পাঠানো হবে, এসব ঠিক করতে করতেই সময় চলে যাচ্ছে। দশ হাজার গোরু, দশ হাজার মোষ। দু কোটি টাকার গোরু-মোষ কেনা সোজা ব্যাপার নয়। এর ওপর আরো এক কোটি টাকার স্কিম আছে লাঙল কেনার জন্য।

সীতানাথ বলল, আমাদের টাকা দিয়ে দিউক না সরকার, আমরা কিনে আনি।

রাহাবাবু হাসলেন, আপনারা কোথা থেকে কিনবেন? পোর্টব্লেয়ারে গোরু মোষ কেন, একটা গাধাও কিনতে পাবেন না। মেন ল্যান্ড থেকে আনতে হবে। তা আপনাদের পক্ষে কি আনা সম্ভব? সরকার একসঙ্গে জাহাজ বোঝাই করে গোরু-মোষ আনাবে। আর একটা সমস্যা, জাহাজ নেই। এর জন্য আলাদা জাহাজ লাগবে। হরিয়ানা, পাঞ্জাব ইউ পি থেকে গরু-মোষ কিনে মালগাড়িতে করে কলকাতায় কিংবা মাদ্রাজে পাঠাতে হবে। সেখান থেকে জাহাজে করে পাঠাতে হবে ডিগলিপুরে। ডিগলিপুরে আবার জেটি নেই। বুঝতেই পারছেন, অনেক সমস্যা আছে।

হারাধনবাবু পরদিন পোর্টব্লেয়ার ফিরে গেলেন। যাবার আগে রঞ্জুকে বলে গেলেন, তরি-তরকারির বাজার চালু করে দেবার জন্য বিকাশকে বলে গিয়েছি। কিন্তু তোমার মুদিখানা দোকান কেমন চলছে?

একদম বাজে। শ পাঁচেক টাকার পুঁজি ছিল, পুঁজি শেষ। দোকানে আর মাল নেই। কাননবাবুর দোকানেও ধার পড়ে গেছে অনেক। তিনি আর বাকিতে দিতে চাইছেন না। অথচ আমি ধার আদায় করতে পারছি না।

তোমার মুদিখানা দোকান চলবে না রঞ্জু। আমি বলি কি, তুমি দোকান তুলে দাও। এখানে একটি কো-অপারেটিভ চালু করো। পোর্টব্লেয়ারে স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংক আছে। তারা লোন দেবে। বেশি পুঁজি না থাকলে এখানে দোকান চালাতে পারবে না। তাছাড়া কো-অপারেটিভ হয়ে গেলে ধার বাকিতে কারবার চলবে না। তোমরা প্রাইমারি কো-অপারেটিভ তৈরি করো। তুমি সেক্রেটারি থাকো। একটা অনারেরিয়াম নাও। বিকাশ তোমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবে। আর বাকি সময়টা পড়াশোনা করো। আমি তোমায় বইপত্র সিলেবাস সব পাঠিয়ে দেব।

স্কুল ফাইন্যালটা পাশ করে কলকাতায় গিয়ে কলেজে ভরতি হও। বি, এ পাশ করে আবার ফিরে এসো। নেতৃত্ব দিতে গেলে তার দীর্ঘ প্রস্তুতি দরকার।

রঞ্জু সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল হারাধনবাবুর দিকে।

আর ডাক্তারের কী হবে?

প্রাইমারি হেলথ সেন্টারের স্কিম দিয়েছি। তবে মায়াবন্দরে হাসপাতাল এ বছরই চালু হচ্ছে। সেরকম গুরুতর রোগী থাকলে মায়াবন্দরে পাঠানো যেতে পারে। মুশকিল হচ্ছে রোজ তো জাহাজ নেই। যদি ট্রলার আসে তাহলে ব্যবস্থা করতে হবে। আর কালীঘাট পর্যন্ত রাস্তা হয়ে গেলে এখান থেকে নৌকোয় করে পাঁচঘণ্টার মধ্যে মায়াবন্দর চলে যাওয়া যাবে।

কালীঘাট? সেটা আবার কোথায়?

যেসব গ্রামে সেটলমেন্ট হয়নি, তার নাম এতদিন ঠিক হয়নি। এখন ঠিক হয়ে গেছে। কালীঘাট হল উত্তর দিকের গ্রাম। আরও উত্তরে গেলে সমুদ্র। এখানে একটি বিচ আছে। এ জায়গার নাম দিয়েছি রামনগর। কালীঘাট থেকে একটা খাল আছে। ওই খাল ধরে গেলে তুমি সমুদ্রে পড়বে। তারপর মায়াবন্দর। আমি লঞ্চে করে ঘুরেছি। কালীঘাট থেকে মায়াবন্দর লঞ্চে করে গেলে মনে হবে, সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছ। দুপাশে ম্যাংগ্রোভের জঙ্গল। একটু এগুলেই কত ছোট ছোট দ্বীপ দেখবে। আমি তো মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি এই রাস্তা দিয়ে একদিন যাত্রীবাহী স্টিমার চলছে। এমন কি বহু ট্যুরিস্টও আসছে ডিগলিপুরে।

হারাধনবাবু ম্যাপ বার করে দেখালেন। ডিগলিপুরকে ঘিরে মোট চারটে রাস্তা করব আমরা। একটি যাবে শিবপুর হয়ে কালীপুরে। আর একটি ক্ষুদিরামপুরে। আর একটি রাধানগরের দিকে। আর একটি কালীঘাট হয়ে রামনগরে। বিশ ফুট চওড়া

পিচের রাস্তা স্যাংশন হয়েছে।

প্রচুর লেবর দরকার হবে এইসব রাস্তা করতে। রাঁচি জেলা থেকে ঠিকাদাররা দেড় হাজার লেবর আনছে। তাদের খাওয়াবার ব্যবস্থা করতে হবে। কো-অপারেটিভ না হলে সামাল দেওয়া মুশকিল। তাছাড়া কো-অপারেটিভ থেকে গ্রামের উৎপন্ন চাল কেনবার ব্যবস্থাও থাকবে।

রঞ্জু বলল, আমার খুব ইচ্ছে হারাধনদা, নেতাজি সুভাষচন্দ্রের নামে কিছু করি এখানে।

রাহাবাবু বললেন, আমিও কি ভাবিনি ভাবছ নাকি? সুভাষচন্দ্রের নাম সবার আগে ভেবেছি বলেই আমরা ডিগলিপুরের একেবারে মাঝখানে যেখানে এখন আছি তার নাম দিয়েছি সুভাষগ্রাম।

রাতের বেলা কথা হচ্ছিল বিডিও-র নতুন বাংলোয় বসে। এই বাংলোতেই বিকাশ চলে আসবে। বাড়ির সামনেই অফিস। পেডোক কাঠ আর করোগেটেড টিন দিয়ে বাড়ি বানানো হয়েছে। বাড়িতে দুটি ঘর। কাঠের মেঝে। একটি ক্যাম্প খাট পাতা। অফিস সাজানো হচ্ছে। চেয়ার টেবিল আলমারি এসে গেছে।

বিকাশ এসে বলল, হারাধনদা, আমাদের সব মাল এসে গেছে। ক্যাপটেন মজুমদার বলছেন কাল সকাল দশটায় জাহাজ ছেড়ে দিতে চান। আপনাকে খবরটা দিতে বললেন।

ঠিক আছে, এখন ক-টা বাজে? হারাধনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন। বিকাশ বলল, দাঁড়ান ঘড়িটা ঘরে আছে। দেখে এসে বলছি। এখানে পরশু থেকে এসে রাত দিন ভুলে গেছি। যা মশার উৎপাত না এখানে।

রাহাবাবু বললেন, মশারি টাঙাতে কোনও দিন ভুলো না। রাতে টর্চ নিয়ে বেরুবে। আমি রঞ্জুকে কো অপারেটিভের কথাটা বলে গেলাম—আচ্ছা তুমি ঘড়ি দেখে এসো, পরে কথা বলছি।

বিকাশ ঘড়ি দেখে এসে বলল, সাতটা বাজে।

তাহলে তো আমায় উঠতে হয়।

রঞ্জু বলল, রাহাদা আজ রাতে কিন্তু আমার বাড়িতে খাবেন। রাহাবাবু বললেন, এবার আর খেতে পারব না ভাই। সীতানাথ আর তার নতুন বউ এসে বার বার করে বলে গেছে। আমাকে ওর বাড়িতে যেতেই হবে। এখন স্নান করে বেরিয়ে পড়ব। কৃষ্ণমূর্তি যদি পৌঁছে দেয়। রঞ্জুর মুখ দিয়ে আর কোনও কথা বেরুল না। সীতানাথ যে ভেতরে ভেতরে এতখানি এগিয়ে গেছে, সে বুঝতে পারেনি। তারই উদারতার সুযোগ নিয়ে সীতানাথ এগিয়ে যাচ্ছে।

রঞ্জুর স্বভাবই এই যে, সে যখন প্রতিবাদ করে নীরবে করে। তার নিরুচ্চার প্রতিবাদ এক ধরনের ঘৃণায় পরিণত হয়। তার চোখ দিয়ে ঘৃণা আর উপেক্ষা ঝরে পড়ে। সে ভেতরে ভেতরে অত্যন্ত অনমনীয় হয়ে পড়ে। তার মধ্যে যেটি ধিকি

ধিকি জ্বলতে থাকে সেটি জেদ। এই জেদেরও কিছু বহিঃপ্রকাশ নেই। কিন্তু যারা তাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানে, তারা সেই জেদটুকুর খবর রাখে।

সীতানাথ এল একটু পরেই। রঞ্জুকে ঘরে দেখে সে একটু গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর রঞ্জুকে একরকম উপেক্ষা করেই সে হারাধনবাবুকে বলল, ছার, আপনি রেডি তো?

হারাধনবাবু বললেন, আমি আর একটু পরেই উঠছি।

রঞ্জু বলল, তাহলে আসি হারাধনদা। আবার কবে আসছেন?

ঠিক বলতে পারছি না। আমায় দিল্লি যেতে হবে। এবার দিল্লি গিয়ে থাকতে হবে কিছুদিন; ক্যাটল পারচেজিং কমিটির মিটিং আছে। লোকসভার অধিবেশন শুরু হয়েছে। সি পি আই সদস্যরা নাকি সরকারকে আন্দামান সেটলমেন্ট নিয়ে অনেক প্রশ্ন করে নাস্তানাবুদ করতে পারে। তাই আবার কবে আসব জানি না। তবে বিকাশ রইল। ওকে কোঅপারেট কোরো। ছেলেমানুষ। আমার তো বয়স গেছে। কিন্তু বিকাশের মতো ছেলেরাও তো সব ছেড়ে এই জঙ্গলে পড়ে আছে।

রঞ্জু চলে গেলে হরাধনবাবু বিকাশকে ডাকলেন।

বিকাশ বলল, কিছু বলছেন হারাধনদা?

আজ সকাল থেকে তো তোমার সঙ্গে বসতেই পারলাম না। তুমি পোর্টব্লেয়ার যাচ্ছ কবে?

বিকাশ বলল, আপনি যখন ডেকে পাঠাবেন। যাওয়া না যাওয়া তো আমার ইচ্ছার ওপর নয়।

হারাধনবাবু বললেন, এই যে তুমি বিডিও হলে, প্রোমোশন পেলে আমায় তো একবারও ধন্যবাদ দিলে না।

আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করতে চাই না।

তুমি খুশি হওনি?

নিশ্চয়ই খুশি হয়েছি। তবে এ খবর জানতে পারলে মা আরও খুশি হবে। আমি মা-কে একটা চিঠি লিখে দেব। আপনি পোর্টব্লেয়ার থেকে পোস্ট করে দেবেন।

তোমার কিন্তু দায়িত্ব খুব বেড়ে গেল। বিডিও মানে গেজেটেড অফিসার। তোমার ফাইন্যানসিয়াল পাওয়ার বাড়বে। এখন থেকে ডেভেলপমেন্টের যা টাকা খরচ হবে সব তোমার মাধ্যমে। টাকা পয়সার ব্যাপারে খুব বদনাম হয়। আর এটা সেনসিটিভ জায়গা। আমাদের সরকারি অফিসারদের অনেকটা সিজারের বউয়ের মতো সব সময় সন্দেহের ঊর্ধ্বে থাকতে হয়।

তারপর বিকাশের দিকে তাকিয়ে বলেন একটা কথা তোমায় বলি বিকাশ। কথাটার এখনই জবাব দেবার কোনও দরকার নেই। পরে জবাব দিলেই চলবে। আমি বুঝি এই নির্জন দ্বীপে একা একা কাটাবার যন্ত্রণা কী ভীষণ। তুমি বিয়ে করবে না? বাড়ি থেকে তোমার মা কিছু বলেন না?

বিকাশ বলল, মা-তো প্রতি চিঠিতেই বিয়ের কথা লেখেন। আমি কিন্তু বিয়ের কথা ভাবিনি। এই তো মাইনে পাই। এই টাকা থেকে আবার বাড়িতেও পাঠাতে হয়। বাবা আর চাকরি করেন না। ভাইয়েরা এখনও পড়ছে। আমিই বড় ছেলে।

এখন তো তোমার পদোন্নতি হল। মাইনেও কিছুটা বাড়বে। এমন মেয়েকে তোমার বিয়ে করা উচিত যে তোমাকে বুঝবে।

বিকাশ খুব ধীরে ধীরে জবাব দেয় : সেই মেয়ে পাওয়া খুব মুশকিল হারাধনদা। ডিগলিপুরের জঙ্গলে কোন মেয়ে এসে থাকতে রাজি হবে? আমি এখন ভাবছি কি জানেন, এই চাকরি তো অনেক দিন করলাম, এখন এই সেটলমেন্টের সময় চাকরিতে যে চ্যালেঞ্জ আছে, পরের দিকে তা থাকবে না। সেটা তখন রুটিন চাকরি হয়ে যাবে। তখন এখানকার জীবন অসহ্য হয়ে যাবে। আমি তার আগেই পালাতে চাই।

বেশ তো, যদি উন্নতি করতে পারো তাহলে বৃহত্তর জগৎ তোমাকে ডাকবে। তা না হলে পালিয়ে গিয়ে কোনও লাভ নেই। যাক যে কথা বলছিলাম, দেবযানীকে তোমার কেমন লাগে? হারাধনবাবু বলেন।

বিকাশ চমকে উঠল দেবযানীর নাম শুনে। দেবযানীর মুখ মনে রেখেই তো সে এখন পর্যন্ত বিয়ের সমস্ত প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছে। এখানে এসে একটি মুখই শুধু মনে পড়ে—সে মুখ দেবযানীর।

কিন্তু কী বলতে চান হারাধনদা? হারাধনদা কি ধরে ফেলেছেন?

সে চুপ করে থাকল।

হারাধনবাবু আবার বললেন, আমি জানি দেবযানী তোমায় ভালোবাসে। তুমি যদি তাকে ভালোবাসো, তোমার বাবা-মায়ের যদি আপত্তি না থাকে তাহলে তাকে বিয়ে করলে তুমি সুখী হবে। মনকে জিজ্ঞাসা করে যদি জবাব পাও আমায় জানিয়ো। তবে তোমার বাবা-মায়ের মত এক্ষেত্রে জরুরি।

বিকাশ যদি সেই মুহূর্তে চিৎকার করে বলতে পারত যে আমি রাজি, আমিও দেবযানীকে ভালোবাসি, তাহলে বোধহয় সে খুশি হত। কিন্তু তার স্বভাবসুলভ লজ্জাবশত সে কোনও কথা বলল না। মুখ নীচু করে থাকল।

হারাধনবাবু বললেন, মোটরসাইকেলের শব্দ শোনা যাচ্ছে। কৃষ্ণমূর্তি এল বোধহয়। তোমাকেও যেতে হবে।

কোথায়? সীতানাথের বাড়ি?

হ্যাঁ।

কিন্তু আমার লোকটিকে একদম পছন্দ নয়।

সেই জন্যই তো যেতে হবে। আমি তো এখানে থাকব না। আমি চাই তুমি সবার সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলো। এখানে যে কোনও লোক ঝামেলা বাধিয়ে তোমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলতে পারে। প্রথম দিকে এরা এখন এসেছিল তখন দেখছ কেমন যথেষ্ট মিলমিশ ছিল। এখন একটা ব্যবধান গড়ে উঠছে ধীরে ধীরে। এরপর

যখন রাজনীতি ঢুকবে, দল ঢুকবে তখন সব শেষ হয়ে যাবে। মানুষ তো সবাই সমান হয়ে জন্মায়—কিন্তু বড় হয়ে কেউ ধনী, কেউ ফকির হয়ে যায়। শিশুরা সবাই সরল থাকে, যত বড় হয় ততই তারা জটিল হয়ে ওঠে।

সীতানাথের সঙ্গে তুমি ওপর ওপর খাতির রেখো। এটা তোমার স্ট্র্যাটেজি।

গ্রামের কাঁচা রাস্তা দিয়ে মোটরসাইকেলে করে যাওয়া খুব আরামপ্রদ নয়। তবু আকাশে চাঁদ ছিল।

জ্যোৎস্না মেখে দু পাশের অরণ্য আর মাঝে মাঝে তৈরি বাড়িগুলি যেন ঘুমিয়ে আছে। দু একটি বাড়ি থেকে আলোর রেখা দেখা যাচ্ছে। মোটরসাইকেলের শব্দে অনেক বাড়ির দরজা খুলে লোকেরা বেরিয়ে এসে দেখছে। কারণ ডিগলিপুরে এই প্রথম যন্ত্রের শব্দ শোনা গেল।

মোটরসাইকেলের শব্দ পেয়ে সীতানাথ ও তার বউ ছায়া বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সীতানাথের হাতে একটি টর্চ।

ওরা তিনজন মোটর সাইকেল থেকে নামতেই সীতানাথ বলল, আসেন ছার, আসেন। আপনার দেরি দেখি আমি ভাবলাম আপনারা বুঝি আসলেন না।

হারাধন বললেন, কথা যখন দিয়েছি আসব। সীতানাথ তার বউয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল।

জ্যোৎস্নার আলোতে হারাধনবাবু দেখলেন বেশ অনেকখানি জমি সাফ করে ফেলে নানা তরিতরকারির চারা লাগিয়েছে সীতানাথ। মাটির বাড়িটিও বেশ পরিচ্ছন্ন। একটি ঘর, পাশে একটি রান্নাঘর।

হারাধন বললেন, আপনার মেয়েকে তো দেখছি না, সে কোথায়?

ছায়া বলল, এতক্ষণ জাগে ছিল, কিছুক্ষণ আগে ঘুমায়ে পড়ল।

ছায়া বলল, একটু চা খান ছার।

হারাধন বললেন, না না এত রাতে চা খাব না।

ছায়া বলল, আপনি যে আসবেন আমরা ভাবতেই পারি নাই। আমাদের যে কী সৌভাগ্য। সময় পালাম না, তাহলে বাবারে খপর দেতাম। বাবা খুব আনন্দ পেতেন।

হারাধন বললেন, তোমার বাপের বাড়ি কোন গ্রামে?

তিন নম্বরে। এবার যখন আসপেন আপনারে নে যাব।

সীতানাথকে জিজ্ঞাসা করলেন হারাধনবাবু, আপনি নিজে জমি চাষ করেন?

সীতানাথ জবাব দিল, না ছার। আমি সময় পাই না। আপনারে কলাম না একটা কাপড়ের দোকান দিছি। দুডো মাডরাসি লেবর পাইছি, তারাই এসে চাষবাস করে। হাল গোরু আসুক, তখন নিজে ধরব আবার। কোদাল দিয়ি চাষ না তো ছাগল দিয়ি হাল চাষ।

ছায়া কিন্তু তিন কাপ চা করে নিয়ে এল।

হারাধনবাবু বললেন, বললাম যে চা খাব না এখন।

সীতানাথ বলল, খান ছার। করে ফেলিছে যখন। রান্নাবান্নাও কমপ্লিট, আজ সকালে জেলেদের কাছে গিইলাম মাছের জন্যি, তা ভালো মাছ পাইছি।

আগে সমুদ্দুরের মাছ মুখে ঠেকাতি পারতাম না। এখন তো এই মাছই খাতিছি। চা-ডা নেন। দুধ টুধ তো পাই না। গুঁড়ো দুধের কি স্বাদ আছে কোনো।

চা দিতে গিয়ে ছায়ার সঙ্গে চোখাচোখি হয় বিকাশের। খুবই অল্প বয়স মেয়েটির। জাহাজে সীতানাথের আগের বউকে দেখেছিল বিকাশ। সেই বউ মারা যাবার খবরও পেয়েছে। সীতানাথের নতুন বিয়ের খবরও পেয়েছিল। কিন্তু বউয়ের সঙ্গে দেখা এই প্রথম।

সীতানাথ বলল, আমার নতুন বউরে তো আগে দেখেননি ছার। বউ আমার খুব কাজের। আমার মেয়েডারে খুব ভালোবাসে। বউডা আর একটু চটপটে হলি ওর ওপর দোকানডার ভার দে আমি পলিটিক্স নে থাকব।

তুমি পলিটিক্স করবে?

উদ্বাস্তুদের সুখ দুঃখের কথা আমরা ছাড়া আর বলবে কিডা? আমাদের কোনো ন্যাতা নাই।

রাহাবাবু বললেন, কেন? রঞ্জু তো আছে। ওঁকে সবাই মানে। আমার তো মনে হয় আন্দামানের বাঙালিদের নেক্সট জেনারেশনের ওই নেতৃত্ব দিতে পারবে।

সীতানাথ হেসে বলল, কিছু মনে করবেন না ছার। বারো হাত কাঁকুড়ির তেরো হাত বিচি দেখছেন কখনও? ওতো নেকাপড়াই জানে না। বলে তো থার্ড ক্লাস পড়িছে। আমার বিশ্বাস হয় না। আমি ঢাকা বোর্ড থেকে ম্যাট্রিক পাশ করিছি। চারখানা ইংরাজি বই পড়তি হয়েছে। দু পাঁচ কথা বলার পারি। আমারে যদি একটু ব্যাকিং করতেন, লিডারশিপ কারে বলে দেখায়ে দিতাম। আমার শ্বশুর তো আমার সঙ্গে কথা বলে সন্তুষ্ট হয়ে মেয়ে দেলেন। আমারে তো স্পষ্টই বলল, তোমার মধ্যি বিদ্যে আছে।' তোমারে নয়—বিদ্যেটার সঙ্গে মেয়ের বিয়া দেলাম।

কোন্ পার্টি করবেন ঠিক করেছেন? হারাধনবাবু বলেন।

মনে প্রাণে আমি ছার বামপন্থী। সীতানাথ বলল, কিন্তু কংগ্রেস রাজত্ব। প্রকাশ্যে তো বলতি পারি না! তবে আমি লাল পার্টিরে সাপোর্ট করি। আপনে বঙ্কিম মুখার্জির নাম শুনিছেন? এম এল এ বঙ্কিম মুখুজ্যে। আমারে খুব ভালোবাসে।

ভাত খেতে বসে ছায়া খুব যত্ন করে পরিবেশন করল। সারাক্ষণ কাছে বসে রইল। মেয়েটি রাঁধেও ভালো। বেশ গুণী বউ পেয়েছে সীতানাথ। কিন্তু ওর মতলবটা বুঝতে পারছে না বিকাশ।

খাওয়া শেষ হবার পর সীতানাথ বলল, রাস্তা তৈরি করতি অনেক রাঁচি লেবর আসছে শুনলাম ছার।

হ্যাঁ তা আসছে।

যত বাইরের লোক আসবে ততই আমাদের বেচাকেনা বাড়বে। মার্কেটটা তাড়াতাড়ি করে দিন ছার। আর যে জায়গায় আমরা দোকান দিয়েছি ওই জায়গাটা যদি দোকানদারদের নামেই বন্দোবস্ত করে দ্যান।

একটু থেমে সীতানাথ আবার বলে—

দোকান তো দেতেই হবে কাউকে না কাউকে। জমিটা নিজির হলি দোকানডা বাড়াতে পারি একডু একডু করে।

হারাধন একটু একটু বুঝতে পারে সীতানাথের মতলবটা কী!

তার চোখের ভাষাও পড়তে পারে। দুই তারার মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিদ্যুতের ঝিলিক দেখতে পান হারাধন রাহা।

বিডিও-র পোস্টের দায়িত্বভার নেবার পর আর নাওয়া খাওয়ার সময় পাচ্ছে না বিকাশ। এতদিন মাথার ওপর হারাধনবাবু ছিলেন। বিকাশ শুধু হুকুম তামিল করেই কাজ চালিয়ে গেছে। কিন্তু হারাধনবাবু বিকাশকে কাজকর্ম বুঝিয়ে চলে যাবার পর সে একা একা অত্যন্ত নার্ভাস বোধ করছে।

অবশ্য সবই হারাধনবাবুর ছক মতো চলছে। ডিগলিপুরে গ্রাম পত্তন সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। মাপজোখ শুরু হয়ে গিয়েছে। এতদিন মোটামুটি আন্দাজে সীমানা দেখানো ছিল। এখন সেখানে আমিন দিয়ে চেন ফেলে জমি মাপা হয়েছে। তিন একরের বেশি ধানিজমি কাউকে দেওয়া হবে না। কিন্তু পাহাড়ি জমি ধানিজমি থেকে বেশি দূরে হলেই লোকে চ্যাঁচামেচি শুরু করছে। রাস্তা তৈরির কাজও শুরু হয়ে গেছে। এখন শুরু হয়েছে মাটির কাজ। প্রথম রাস্তাটা হচ্ছে এরিয়েল বে থেকে সুভাষগ্রাম পর্যন্ত।

বাজার তৈরি শেষ হয়ে এল পাঁচ ছ-মাসের মধ্যে। বেশ কটি দোকানও বসে গেল। তারপর একদিন ধুমধাম করে কো-অপারেটিভ স্টোরেরও উদ্বোধন হয়ে গেল। রঞ্জু তার সেক্রেটারি।

বিকাশ ডিগলিপুরে এসে গত ছ মাসে মাঝে মাঝে চিঠি লিখেছে দেবযানীকে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ থাকলেও সন্ধ্যার পর কিছুই করার থাকে না। রেডিয়ো

শোনার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এখান থেকে রেঙ্গুন স্টেশন ছাড়া আর কিছু ধরা যায় না। তাই মোমবাতি জ্বালিয়ে দেবযানীকে চিঠি লিখতে বসে বিকাশ।

দেবযানী,

এখানে এসে এমন ব্যস্ততার মধ্যে দিনগুলি যদি কেটে না যেত তাহলে খুব খারাপ লাগত। আমি কলকাতার বাড়িতে একান্নবর্তী পরিবারে এতদিন কাটিয়েছি। নিজেকে নিয়ে আলাদা করে ভাববার কখনও সময় পাইনি। সকালবেলা খেয়েদেয়েই বাবার সঙ্গে অফিস চলে যেতাম। অফিস থেকে যেতাম বঙ্গবাসী কলেজে। সেখান থেকে দমদমের বাড়িতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে যেত। জানো দেবযানী, কখনও স্বপ্ন দেখার সময় পাইনি জীবনে। আন্দামানে এসে এখানকার সবুজ আর নীলের মধ্যে আকণ্ঠ মগ্ন হয়ে আমার নিজের জীবনটাও সবুজ হয়ে উঠল। আমি স্বপ্ন দেখতে শিখলাম।

ডিগলিপুরের মানুষেরাও এখন স্বপ্ন দেখতে শিখেছে। একদিন এরা ভেবেছিল এরা বুঝি ফুরিয়ে গেছে। আজ থেকে চার বছর আগে আমি যখন এদের সঙ্গে করে এখানে এনেছিলাম, সেদিনের ওদের মুখের রেখা, চোখের দৃষ্টির সঙ্গে আজ ওদের অনেক তফাত।

ডিগলিপুরকেও এখন আগের তুলনায় চেনা যাবে না। এখন বাজার বসে গেছে। এরিয়েল বে থেকে ডিগলিপুরে আমাদের বাংলো পর্যন্ত রাস্তার কাজ শুরু হয়ে গেছে। বাইরে থেকে প্রচুর লোক আসছে কাজের আশায়। অধিকাংশই রাঁচি অঞ্চলের, তামিল ছেলেরাও আসছে কিছু কিছু। কেরলের লোকও আসছে। কিন্তু আমি এ পর্যন্ত একটি বাঙালি ছেলেকে আসতে দেখলাম না। অথচ এই সময় যারা ঘাম ঝরাতে পারবে তাদেরই দিন।

আমার দৈনিক রুটিন শোনো। ডিগলিপুরে অনেক আগে আগে ভোর হয়। ভোরবেলা উঠে একটু বেড়িয়ে আসি। ভোরবেলা ওঠা আমার ছোটবেলার অভ্যাস। অফিসের জন্য সকালের মধ্যে বেরিয়ে যেতে হতো তো।

তারপর ঘরে ফিরে স্টোভ ধরিয়ে নিজেই রান্না করে খাই। পোর্টব্লেয়ার থেকে আসার সময় তুমি যে বিস্কুটের টিনটা দিয়েছিলে সেটা এখনও চলছে। চা খেয়ে বেরিয়ে যাই কাজ দেখতে। ফিরে এসে অফিস করি। কদিন ধরে টাইপিস্টটি অসুস্থ হয়ে পড়েছে। নিজেকেই সব চিঠি টাইপ করতে হচ্ছে।

এখানে স্কুলের জন্য একটা জায়গা দিয়েছি। বাড়িও তৈরি হয়ে গেছে। এখন স্কুল চলছে। মাত্র একজন টিচার দিয়েছে। অথচ তিনজন স্যাংশন হয়েছে। আজ এডুকেশন ডিপার্টমেন্টকে রিমাইন্ডার দিলাম। গত জানুয়ারি থেকে গ্রামবাসীরা একটি সমিতি গঠন করেছে। ঠিক পঞ্চায়েতের মতো। তবে দলাদলিও শুরু হয়ে গেছে। কো-অপারেটিভ নিয়ে রঞ্জুর একটা বিরোধী দল তৈরি হয়ে গেছে। রঞ্জু ছেলেটিকে

তুমি তো দেখেছ। এত ছেলের মধ্যে আমি ওর মধ্যে একটা সম্ভাবনা দেখতে পাই। হারাধনদাও সেই কথা বলেন। কিন্তু মুশকিল, ও যে আর লেখাপড়া করল না। ক্লাস সেভেন না এইটে উঠে আর পড়েনি। অবশ্য ওর সঙ্গে কথা বলে এটা বোঝা যায় না। হারাধনদা ওকে প্রাইভেটে স্কুল ফাইন্যাল দিতে বলে গেছেন। কী করবে জানি না।

এবার জাহাজে তুমি যা ম্যাগাজিন পাবে তা তো পাঠাবেই, সেই সঙ্গে একটি ডিকশনারি পাঠিয়ে দিয়ো। আমি তাড়াতাড়িতে আনতে ভুলে গেছি।

এইবার তোমাকে আমার নিজের কথা বলি। এই কথাটা আগেই বলতে পারতাম। কিন্তু ভাবলাম নিজের কথাটা স্বার্থপরের মতো, আগেই বলব কেন যখন এত কথা বলার আছে।

তোমাকে একটা কথা সরাসরি লিখতে আমার কোনও দ্বিধা নেই। আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমার মনে এতদিন সন্দেহ ছিল সমস্ত ব্যাপারটা একতরফা হয়ে যাচ্ছে কি না। কিন্তু সেদিন হারাধনদা আমাকে সাহস দিয়ে গেছেন। তাঁর কাছে আভাস পেলাম আমার সঙ্গে তোমার অদৃষ্ট জড়াতে তোমার কোনও আপত্তি নেই।

দেবযানী, আমি সে দিনটির জন্য সারা জীবন অপেক্ষা করে আছি যেদিন তুমি আমার হবে।

এখানে সমুদ্র শান্ত। জীবন স্থির একটা বিন্দুর মতো। কিন্তু যত ঝড় সমস্তই আমার মনে। যতক্ষণ না তোমার চিঠি পাচ্ছি এ ঝড় থামবে না। ইতি—বিকাশ।

চিঠিটি লিখে খামের মধ্যে পুরে ঠিকানা লিখল বিকাশ। তারপর অন্যান্য চিঠিপত্রের ফাইলটি বার করল। প্রতি এক মাস অন্তর জাহাজ আসার আগের দিনটা তার প্রচণ্ড কাজের চাপ থাকে।

যাবতীয় স্টেটমেন্ট, অ্যাকাউন্টস, ফাইল সব জাহাজে পোর্টব্লেয়ারে পাঠাতে হয়। তারপর জাহাজ থেকে সমপরিমাণ ডাক নামে। এই ডাকে সেটলারদেরও কারও কারও চিঠিপত্র থাকে। এখনও পর্যন্ত ডাকঘর হয়নি এখানে। চিঠি আসে পোর্টব্লেয়ার পোস্ট অফিসে। তারপর সেটি বড় প্যাকেটে পুরে বিডিও ডিগলিপুরকে পাঠানো হয় ডেলিভারির জন্য।

জাহাজ আজকেই আসবে। চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছে বিকাশ। হঠাৎ সীতানাথ এসে হাজির। একটু গম্ভীর মুখে বিকাশ বলল, আপনি এখন এলেন। আমি উঠছি সীতানাথবাবু।

আমিও আর বিরক্ত করব না ছার। আমি জানতি এলাম আজ কি জাহাজ আসপে?

তাইতো শুনেছি।

আমার মাল আসতিছে কিনা। তাই খোঁজ নিচ্ছি। একটা পোস্ট অফিসির ব্যবস্থা করেন ছার। চিঠিপত্রের তা নাহলি বড় অব্যবস্থা। আমি দিল্লিতে চিঠি পাঠাই—কলকাতায় চিঠি পাঠাই দু-তিন মাস লেগি যায় উত্তর আসতি। একেবারে অরাজক অবস্থা।

বিকাশ বলল, খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। পোস্ট অফিস, ওয়ারলেস স্টেশন সব স্যাংশন হয়ে আছে। ওপরের পাহাড়টা ডেভেলপ করে ওখানেই অফিসগুলো হবে।

অত উঁচুতি।

সিঁড়ি থাকবে। কোনও অসুবিধা হবে না। ওখান থেকে স্যাডল পিকের ভিউ দেখেছেন? একসেলেন্ট। ওখানে তহশিলদারের অফিসও হবে। ট্রেজারি আর পোস্ট অফিসও থাকবে। এক কথায় ওপরটাতে হবে সেক্রেটারিয়েট।

কবে নাগাদ হবে ছার?

হবে, হবে, ধৈর্য হারাবেন না। নেই নেই করেও কম তো হয়নি। তারপর বলুন, আপনার দোকান কেমন চলছে?

ভালো ছার। আপনাদের আশীর্বাদে ভালোই চলতিছে। এবার কলকাতায় লোক পাঠায়েছি বড়বাজার থেকে মাল আনতি।

বেশ, বেশ।

কো-অপারেটিভ নিয়ে একটা কথা ছেল ছার। ওই যে পোর্টবেলেয়ার থেকে যে একমণ আলু এসেছিল, সেগুলি সব পচে গেছে।

বলেন কী?

হ্যাঁ ছার।

কী করে পচল?

রঞ্জুরে অনেক বলেছিলাম বস্তায় বেঁধি অত আলু রেখো না। আমার কথা শোনল না। এখন স্টক মেলাতি গিয়ে দেখি সবগুলি পচে গ্যাছে।

বিকাশ একটু বিচলিত হল। যদিও সে পদাধিকার বলে কো-অপারেটিভ দেখাশোনা করে কিন্তু তার পরিচালনার দায়-দায়িত্ব কমিটির। রঞ্জু কমিটির সেক্রেটারি। সমস্ত দায়ভাগ তার ওপর এসেই বর্তাবে। যদিও রঞ্জু খাটছে খুব। তার নিজের দোকানটা তুলে দিয়েছে। এখন সে দিনরাত কো-অপারেটিভ নিয়েই পড়ে থাকে। কিন্তু এক কুইন্টাল আলু পচে যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে কেউ তাকে ক্ষমা করবে বলে মনে হয় না।

বিকাশকে চিন্তিত দেখে সীতানাথ বলল, ছার, এ নিয়ে আপনি একদম ভাববেন না। আপনার তো কোনও দোষ নেই। দেকা যাক কী করা যায়। আপনি একটা তদন্ত করায়ে দেন।

তারপর একটু থেমে বলল, একটা কথা বলব ছার? শোনলাম পনেরশো লেবর আসতিছে রাস্তার জন্যি।

হ্যাঁ। এক হাজার এসে গেছে। আর পাঁচশো এসে পড়বে শিগ্‌গিরই।

শোনলাম সরকার থেকি ওদের রেশন ছাপলাই করা হবে।

হ্যাঁ, এতদিন ওদের নগদ টাকা দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু সে টাকায় ওরা সময় মত সরবরাহ পাচ্ছিল না। তাই ঠিক হয়েছে মাইনে থেকে একটা অংশ কেটে নিয়ে ওদের রেশন দেওয়া হবে। এ নিয়ে ওপেন টেন্ডার দেওয়া হবে।

আমি একটা টেন্ডার দিতি চাই ছার—

আপনি কাপড়ের দোকান দিয়েছেন। কোঅপারেটিভে আছেন, আবার রেশনের দোকানের মধ্যে কেন?

কাপড়ের দোকান ভাবছি তুলে দেব ছার। আরও দুডো দোকান হয়ে গেছে। ধার বাকিতে কাজ করতি হয়। রেশনের দোকানডা যদি আমারে দ্যান। দ্যাখবেন, আমি ভালো মাল সবচেয়ে কম দামে দেব।

বিকাশ বলল, ঠিক আছে। আপনি দরখাস্ত তো জমা দিন।

সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেল সীতানাথ।

এই বর্ষাকালটা প্রায় সব সময় বৃষ্টি লেগেই আছে। তবু তো এখানকার লোকেরা বলে আগের তুলনায় এখন অনেক বৃষ্টি কমে গেছে। রাস্তাটা প্রায় শেষ হয়ে এল। জাহাজে করে আসছে বড় বড় পিচের ড্রাম। স্টোনচিপস। দুটো স্টিম রোলার এসেছে। যদিও পি ডবলু ডি থেকে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়র এসেছে তবু বিডিওকেই দেখতে হয় সব কিছু। অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়াররাও গেছে মায়াবন্দরে এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়রের সঙ্গে দেখা করতে।

কোয়ার্টার্স থেকে বেরুতেই ঝির ঝির বৃষ্টি এল। বিকাশ আবার ঘরে গিয়ে ছাতাটা নিয়ে এল। তারপর বাজারের রাস্তা ধরল। গোটা ছয়েক দোকান বাজারে। তার মধ্যে রঞ্জনের দোকানটি বন্ধ রয়েছে। হরিপদ মণ্ডলের স্টেশনারি দোকান, শ্যামসুন্দর গাইনের দোকান, পতিপাবন মাণ্ডে ও কাশীশ্বর বিশ্বাসের কাপড়ের দোকান। সীতানাথের দোকান আরও আগে। আর একটু এগিয়ে যেতেই কো-অপারেটিভ। রঞ্জু সেক্রেটারি হলেও দোকানের কাজ সেই করে। একটি ছেলে আছে প্রায়ই তাকে এখানে ওখানে যেতে হয়।

বিকাশ গিয়ে দেখে রঞ্জু খদ্দেরের মাল ওজন করছে। বিকাশকে দেখতে পেয়ে বলল, আপনি বসুন। আমি একে ছেড়ে আসছি।

দোকানে বেশি ভিড় নেই। একটি লোক বসেছিল। সাধুর মতো পোশাক। পরনে কৌপীন। খালি গা। গলায় রুদ্রাক্ষ। মুখে এক মুখ দাড়ি। লোকটি বিকাশকে নমস্কার করে বলল, নমকার বিডিও সাহেব।

নমস্কার।

আমার নাম গদাধর ঠাকুর। দুর্গাপুরে মায়ের মন্দির করেছি। একদিন পায়ের ধুলো দেবেন।

বিকাশ বলল, আপনি কি সাধু নাকি?

গদাধর বলল, হ্যাঁ। সাধু হয়ে গদাধর ঠাকুর নাম নিছি।

হরিচান্দ ঠাকুরের নাম শোনছেন? তিনি আমাদের গুরুদেব। আমি তাঁরই চরণাশ্রিত।

বিকাশ বলল, আপনি তাঁর শিষ্য বুঝি?

শিষ্য বলতে পারেন। তবে আমি তাঁরে স্বপ্নে দেখছি। আমি একদিন সারারাত হরিচান্দের ভাগবত পাঠ করলাম। তখন ঠাকুর আমায় স্বপ্নে দেখা দিলেন। বললেন, মানুষ পাপের জন্য এই ফল ভোগ করতেছে। তুই মানুষেরে পাপ থেকে মুক্ত কর। আমার নাম প্রচার কর। আমি কানতে কানতে চোখের জলে অন্ধকার দেখতাছি। জন্মের চাইতে ধম্মো বড়।

বিকাশের মনে পড়ে গেল মাস কয়েক আগে দুটি নাবালক ছেলেমেয়েকে নিয়ে এক মহিলা এসেছিল তার কাছে। তার স্বামীর মাথায় ছিট আছে। তীর্থ করতে যাচ্ছি বলে মাস আষ্টেক আগে সেই যে মেনল্যান্ডে চলে গেছে আর তাঁর খোঁজ নেই। বিডিওসাহেব যদি তার খোঁজ খবর এনে দিতে পারেন। কারণ দুটি বাচ্চা নিয়ে খুব কষ্টে আছে সে।

বিকাশ বলল, ও আপনিই সেই যে তীর্থ করতে বেরিয়েছিলেন? কবে ফিরলেন? গিয়েছিলেনই বা কোথায়?

গদাধর বলল, প্রথমে কামাখ্যায়। তারপর কৈলাস পাহাড়ের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করছি। সে সময় ভাত ছাড়ান দিয়া শুধু ফল-জল খেয়ে থাকছি। এরপর শুধু হাওয়া খেয়ে শুষ্ক হলাম।

বলেন কি, শুধু হাওয়া খেয়েই কৈলাসে রওনা দিলেন? বিকাশের চোখে মুখে কৌতুক।

উপরে চড়তে পারলাম কই? কৈলাসের নীচে থেকে বাবা বললেন, ফিরে চলো। তুমি যখন যা চাইবে তা পাবে। আমি চলে আলাম ডিগলিপুরে। তা এসে দেখি বউয়ের বড় কষ্ট। আপনার কাছে আসছিল বলল।

হ্যাঁ বেচারি তোমার জন্য অনেক কষ্ট পেয়েছে। খাওয়া জোটে না শেষ পর্যন্ত।

আপনি রঞ্জনেরে বলিয়া র‍্যাশনের ব্যবস্থা করে দেছেন। সে আমারে বলছে। কিন্তু আজ আইছি আপনি একটা বিচার করেন। আমারে পাহাড়ি জমি দেছে ওই লক্ষ্মীপুরে। আর আমি ধানিজমি পাইছি মধুপুরে। মধুপুরেই আমি বাড়ি করছি। আপনি বলেন, এ আমিনের কোন ধারা বিচার?

বিলাস বলে, আমি তো এ ব্যাপারে কিছু করতে পারব না। আপনি তহশিলদারের

কাছে যান। জমি-জমা দেবার মালিক হলেন তিনি।

তিনি তো আমারে ভাগায়ে দেলেন। কথা শোনলেন না।

তাহলে রঞ্জুকে ধরুন। সে ব্যবস্থা করবে।

রঞ্জু তার হাতের কাজ সেরে সেই গদাধরকে একটু ধমকের সুরে বলল, তোমাকে তো বলেছি তোমার ব্যাপারটা দেখব। স্যারকে কেন বিরক্ত করছ এখন। তারপর বলল, বিকাশদা, আমি হয়তো পরের জাহাজে পোর্টব্লেয়ার যাচ্ছি। মি. রাজভোজ আমায় চিঠি দিয়েছেন। বোধহয় কংগ্রেসের কোনও সাংগঠনিক দায়িত্ব দিতে চান আমায়।

বিকাশ বলল, কিন্তু রঞ্জন, তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। এক কুইন্টাল আলু নাকি পচে গেছে। তুমি উপযুক্ত ব্যবস্থা নাওনি।

রঞ্জন বলল, চাষিরা বীজের আলু চাইছে অনেক দিন। তাই এবার আলু বিক্রি না করে বীজের জন্য রাখব ঠিক করেছিলাম। আপনি জানেন, আমাদের দোকানে রাখার ভালো ব্যবস্থা নেই। আলু বাইরে রাখলে ইঁদুর আস্ত রাখবে না। বস্তার মুখ বেঁধে রেখে দিয়েছিলাম। সীতানাথ আমাকে পরামর্শ দিয়েছিল আলুগুলো বেচে দিতে। আমি বেচিনি। তারপর বলেছিল বস্তা থেকে খুলে রাখতে, সেটা রাখিনি সঙ্গত কারণেই। বস্তা থেকে চাষিদের বীজের জন্য আলু বেচেছি, কিন্তু আধ কুইন্টালের বেশি কেউ তোলেনি। বাকিটা নিয়ে কী করব তার জন্য মিটিং ডাকব ঠিক করেছি। এমন সময় সীতানাথ এসে বলল, করেছ কী, সব আলু পচে গেছে। চাষিরা অভিযোগ করছে। কয়েকটি পচা আলুর নমুনাও দেখাল। আমি বস্তা চেক করে দেখেছি কিছু পচেছে, সবটা নয়। এটা তো হতেই পারে।

ওরা কিন্তু এটা নিয়ে একটা ইস্যু করতে চাইছে। বিকাশ বলল।

যদি তেমন হয় আমি কো-অপারেটিভ ছেড়ে দেব। রঞ্জু নিস্পৃহ স্বরে জবাব দিল।

রঞ্জনের সঙ্গে কিছুক্ষণ রাস্তা দিয়ে হাঁটল বিকাশ। রঞ্জন ছেলেটি সৎ পরিশ্রমী। কিন্তু পলিটিক্স একদম বোঝে না।

দেড় লক্ষ টাকা পুঁজি নিয়ে যে কো-অপারেটিভ তৈরি হয়েছিল তা এখন অনেক বেড়েছে এক বছরে। এমনকী, এখন কো-অপারেটিভ থেকে প্রাইভেট দোকানগুলিও মাল কেনে। কিন্তু এই দ্বীপে সমৃদ্ধি যত আসছে ততই কিছু মানুষ সেই সমৃদ্ধির সিংহভাগ নিজের জন্য রাখতে চাইছে।

তুমি আমাকে এ সমস্ত কিছুই জানাওনি রঞ্জন। বিকাশ মনে মনে ক্ষুব্ধ হল। এখন কোঅপারেটিভ নিয়ে যদি কোনও আর্থিক অপচয়ের অভিযোগ ওঠে, আমি ফেঁসে যাব। বীজের জন্য আলু দেওয়ার কোনও স্কিম আমাদের আপাতত নেই। আলু আনা হয়েছিল যেমন বিক্রি হয় তেমন বিক্রির জন্য। আজ এক মাস ধরে ডিগলিপুরের কোনও দোকানে আলু নেই। অথচ কো-অপারেটিভে এক কুইন্টাল

আলু রয়েছে—সে আলু ব্যবহারের অযোগ্য।

বিকাশের মুখ দেখে মনে হল সে অপ্রসন্ন হয়েছে। বিকাশের কাছ থেকে এই রুক্ষতা সে আশা করেনি।

পোর্টব্লেয়ার থেকে জরুরি ডাক এল স্পেশ্যাল ম্যাসেঞ্জার দিয়ে। জাহাজ মাত্র মাসে একদিন আসে। বাকি ২৯ দিন ডিগলিপুর পৃথিবীর মানচিত্রের বাইরে।

সেজন্য এই জরুরি প্যাকেটটি এল প্রথমে মায়াবন্দরে। মায়াবন্দর থেকে পুলিশের লঞ্চে করে কালীঘাট। কালীঘাট থেকে জঙ্গলের মধ্যে পায়ে চলা পথ ধরে চারঘণ্টা হেঁটে একটি পুলিশ কনস্টেবল প্যাকেটটি পৌঁছে দিল বিকাশকে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার রাহা অফিসিয়াল চিঠি লিখছেন, আগামী মঙ্গলবার একটি বিশেষ জাহাজে মোষ যাচ্ছে এটাই প্রথম লট। পাঁচশো মোষ যাচ্ছে এই লটে। তার পরের লট যাবে এক মাস পরে।

মোষ যাতে এরিয়েল বে-তে নামতে পারে তার জন্য এরিয়েল বে-তে একটি এল সি ডি পাঠানো হচ্ছে মায়াবন্দর থেকে। বিডিও যেন অন্তত ত্রিশজনের মতো কুলি এনগেজ করে মোষ নামানোর জন্য। মোষদের সঙ্গে তাদের আপাতত খাদ্য হিসাবে এক টন ফডার পাঠানো হচ্ছে। কিন্তু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বৈধ সেটলারদের মধ্যে মোষ বণ্টন করে দিতে হবে। প্রথম লটে তাদেরই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে যারা নিজের হাতে চাষ করে। তাদের তালিকা এখনই করে ফেলতে হবে।

টাইপ করা চিঠির সঙ্গে হারাধনদার হাতে লেখা চিঠি :

প্রিয় বিকাশ,

ডিগলিপুরের ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব এবার তোমার ওপর দিচ্ছি। সেটি হল মোষ বণ্টন করার দায়িত্ব। ডিগলিপুরে যারা পুনর্বাসন পেয়েছে তারা সবাই চাষি। জমি ওদের প্রাণ। জমির জন্য ওরা রক্ত ঝরাতেও প্রস্তুত। এই মানুষগুলো এতদিন ছিল নদীমাতৃক বাংলার সম্পদ। মাটি মেখে, মাটির নেশায় বুঁদ হয়ে এরা জীবনের সব দুঃখ ভুলে থাকত! এই মাটির নেশাতেই কিন্তু এরা কোনওদিকে না তাকিয়ে আন্দামানে এসেছে। এরা সেই মাটি পেয়েছে। কিন্তু মাটির বুক চিরে সোনা বার করবার মতো হাতিয়ার এতদিন ওদের হাতে ছিল না। এতদিন পরে সেই হাতিয়ার ওরা পাচ্ছে।

তুমি দেখবে যতটা সম্ভব ট্যাক্টফুল হয়ে মোষ বিতরণ করা যায় কিনা। নিশ্চয়ই

যাবে। আমি তোমার পাশে থাকতে পারলাম না। আমাকে আবার কলকাতা ছুটতে হচ্ছে।

এবার কলকাতায় গিয়ে দমদমে তোমার বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলে পাকা কথা পেড়ে আসব। অসবর্ণ বিয়ের প্রস্তাব তাঁরা মেনে নেবেন কিনা জানি না। কিন্তু আমার মন বলছে নেবেন। তোমার বাবার লেখা বই, প্রবন্ধ আমি পড়েছি। তিনি সেকালের মানুষ হয়েও অনেক বেশি আধুনিক। আব যদিও মনের তলায় কোনও খুঁত-খুঁতানি থাকে, দেবযানীকে দেখার পর সেটুকুও কেটে যাবে। ইতি—হারাধনদা।

সেই সঙ্গে দেবযানীর চিঠি।

দেবযানী এবার ছোট চিঠি লিখেছে। কোনও উচ্ছ্বাস নেই, আতিশয্য নেই।

রঞ্জুদা,

তোমার চিঠি পেয়েছি। তোমাকে নতুন করে লেখার দরকার নেই। যদি লিখতে হয় তাহলে বুঝবে আমাদের পরস্পরকে বোঝাটাই ভুল।

এটা জেনে রেখো, আমি সব সময়ই প্রস্তুত। তোমার ওপর নতুন দায়িত্ব পড়ছে, দাদার কাছে শুনলাম। তুমি এই পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হও—এই আশা করি। ইতি—তোমার দেবযানী।

'তোমার' কথাটি বার বার পড়ল বিকাশ। এতদিন দেবযানী শুধু লিখত 'ইতি—দেবযানী।' এখন 'তোমার দেবযানী' কথাটি লেখায় তার হৃদয় মন দুই-ই ভরে উঠল।

সঙ্গে আর একটি খামবন্ধ চিঠি রঞ্জুর নামে।

রঞ্জুকে ডেকে চিঠিটা দিতেই রঞ্জু খুলে পড়ে বলল, বিকাশদা, রাজভোজবাবু আমাকে পোর্টব্লেয়ার যেতে লিখেছেন।

রাজভোজ মানে আন্দামান কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট?

হ্যাঁ। সেবার গিয়ে আলাপ হয়েছিল। আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুমি কংগ্রেসে জয়েন করতে চাও কি না। আমি বলেছিলাম, আমার আপত্তি নেই।

রাজভোজ কী লিখেছেন?

উনি বলছেন পোর্টব্লেয়ারে গিয়ে সেক্রেটারির কাজ করতে।

কিন্তু তোমার পড়াশোনা শেষ না করে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লে আর পড়া হবে না। হারাধনদার তোমার ওপর খুব আশা।

রঞ্জু বলল, কিন্তু এখানে পড়ে থাকলে আমার লেখাপড়া হবে না বিকাশদা।

কিন্তু আমার মনে হয়, এখনই তোমার এদের ছেড়ে যাওয়া উচিত হবে না। যতদিন না তোমার যোগ্য সহকারী গড়ে তুলতে পারো ততদিন এখানে তোমার থাকতে হবে।

আপনি কি বলতে চান আমি সারাজীবন ধরে কো-অপারেটিভের মাল ওজন

করব আর আলু পচে যাওয়ার জন্য কৈফিয়ত দিয়ে যাব প্রত্যেকের কাছে।

যারা কাজ করে তাদের কৈফিয়ত দিতে হয় বইকি। আমাকে, হারাধনদাকে সবাইকেই জবাবদিহি করতে হয়।

কিন্তু আপনি মাইনে পান। আমি কি পাই?

তুমি যা পাও, আমরা মাইনে পাই বলে তা কোনওদিনও পাব না। তুমি পাও বিরাট তৃপ্তি। আমরা শুধু দায়িত্ব পালন করে মুক্তি পাই মাত্র। যাক যা ভালো বুঝবে, তাই করবে। কবে যাবে ঠিক করেছ?

সামনের জাহাজে।

সামনের মঙ্গলবার মোষ আসছে। ঠিক এই সময় তুমি চলে গেলে আমি একটু অসুবিধেয় পড়ব রঞ্জু।

আমি লিস্ট বানাবার ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে পারি। কিন্তু রাজভোজ বলেছেন, তিনি এই মাসের শেষে দিল্লি চলে যাচ্ছেন। আমাকে এই জাহাজে যেতেই হবে।

তোমার মায়ের কী হবে?

মা এখানেই থাকবে। তাকে দেখার লোক আছে। তাছাড়া তার আর্থিক দায়দায়িত্ব আমি অস্বীকার করছি না। আমার জমি থেকে যা ভাগে পাই তা থেকে মায়ের চলে যাবে।

বিকাশ দেখল রঞ্জু তার সিদ্ধান্ত থেকে কিছুতেই ফিরে আসবে না। সে আর কথা বাড়াল না। তার চেয়ে রঞ্জু যখন একবার জেদ ধরেছে তখন সে না হয় যাক, গিয়ে ঘুরে আসুক। যেখানেই যাবে ডিগলিপুরকে বেশিদিন ভুলে থাকতে পারবে না রঞ্জু।

গত ক-দিন ধরেই ডিগলিপুরে রটে গিয়েছিল, এর পরের জাহাজেই গোরু মোষ আসছে। ডিগলিপুরের মানুষের মুখে ওই একই কথা, কবে আসছে গোরু-মোষ। কেউ বলল গোরু নয় মোষ আসছে। কেউ বলল, গোরু আর মোষ মিশোনো। একজন বলল, গরু আর মোষের সংমিশ্রণে গোষ নামে এক অদ্ভুত জন্তু তাদের জন্য বরাদ্দ হয়েছে। এক একটা গোষ প্রচুর জাবনা খায়। বিরাট বিরাট শিং তাদের। কিন্তু একটা মোষই লাঙ্গল টানতে পারে। দুটোর আর দরকার নেই।

ভবেশ এবার তার জমিতে দুজন 'রাঁচি' লাগিয়েছে। রাঁচি মানে রাঁচি জেলা থেকে আসা লেবর। কিন্তু রাস্তার কাজে মাইনে এত বেশি যে মাঠের কাজে রাঁচি লেবর পাওয়া মুশকিল। দুজন লেবারকে দিনে পনেরো টাকা করে নগদ দিতে হচ্ছে। তাছাড়া তিনবেলা খাওয়া। রাক্ষসের মতো খায় লোকগুলো।

এবার সবটাই আট নং ধান লাগিয়েছে ভবেশ। তার পনেরো বিঘা জমিই পরিষ্কার হয়ে গেছে এখন। বাড়ির বাগানে পেঁপে ধরেছে এক একটা কুমড়োর মতো। নারকেল আর আমের কলম লাগিয়েছিল গত বছর। বেশ বেড়ে গেছে এর মধ্যে। বিকাশবাবু

তো বলেছেন, পাহাড়ি জমিতে বাগিচা করার জন্য সরকার থেকে আগামী বছরই নানান ধরনের চারা দেওয়া হবে। সরকারি খামার তৈরি হয়েছে এজন্য।

গৌরীর স্বাস্থ্য আর ভালো হয়নি। তবে তার এমনিতে কোনও অসুখ নেই। এখন সে দিব্যি কাজকর্ম করে। ভোরবেলা উঠে পুরো উঠোন আর বাড়ি নিকোনো। তারপর সকালবেলা ভবেশ ও বাচ্চাদের জন্য ফ্যানভাত করে দেওয়া। তার মেয়ের বয়স দেখতে দেখতে সাত হয়ে গেল। এখন মেয়েও তার দাদাদের সঙ্গে তিনবেলা ভাত খায়। তা না হলে গুঁড়ো দুধ করে দিতে হত মেয়েকে। মেয়েটি খুব ঠান্ডা হয়েছে। তার ছোট ছেলের মতোই।

ভবেশ মেয়ের নাম রেখেছে শ্যামা। তার গাঁয়ের মেঘনা নদীর কথা এখনও মনে পড়ে তার। এক এক সময় ভবেশের মনে হয় নদী আর মাকে কোনো সন্তানই ভুলতে পারে না—ভোলা যায় না।

শ্যামা মায়ের সঙ্গে সঙ্গেই ঘোরে। টুকটাক কাজও করে দেয়। বাড়িতে কিছু মুরগি পুষেছে ভবেশ। শ্যামার কাজ সকালবেলা উঠে দেখা কোন ডিম আছে কিনা। একটু বেলা হলে মুরগিদের চালের গুঁড়ো খেতে দেয় শ্যামা।

ভবেশ এসে গৌরীকে প্রথম খবরটি দিল।

শোনছ পরের জাহাজে আমাদের বলদ আসে যাচ্ছে।

বিমল কাছেই ছিল। বলল, বাবা, শুনছি গোষ আসবে।

গৌরী জিজ্ঞাসা করে সেটা আবার কারে কয়?

বিমল বলে, গোরুও নয়, মোষও নয়—গোষ। আমাদের ইস্কুলে সবাই কচ্ছিল।

বিমল ও কমল ইস্কুলে যাচ্ছে। মাঝে মাঝেই চাষবাসের কাজ পড়ে গেলে মাস্টারমশাইরা অনুপস্থিত হয়।

গৌরী হেসে বলে, মোষই হোক আর গোষই হোক, আমি কী ভাবছি কও তো—গোবর পাওয়া গেলেই হল। এমন দ্যাশে আইছি যে, একটা গোরু পর্যন্ত নাই। গোবর ছাড়া কি শুদ্ধ হয় নাকি কিছু!

শ্যামা এসে দাঁড়ায়। জিজ্ঞাসা করে, মা গোষ কী?

বিমল বলে, গোরু দ্যাখছ? গোরুই তো দ্যাখো নাই। তোমারে গোষ বোঝাই ক্যামনে?

কমল তাড়াতাড়ি একটি বই নিয়ে এল। ছেঁড়াখোঁড়া একটি বই। তাতে গোরুর ছবি আছে। কমল এই ইস্কুলেই পড়তে শিখেছে। সে এখন বাংলা বর্ণমালা চিনতে পারে।

কমল শ্যামাকে দেখিয়ে দিল, এই দ্যাখো গোরুর ছবি।

ভবেশ যেন আক্ষেপ করেই বলে, হায় কপাল আমার। এমন দ্যাশে আইলাম যেখানে গোরু নাই, কুকুর নাই, বিড়েল পর্যন্ত নাই। আছে শুধু ইন্দুর শুয়োর আর হরিণ।

বিমল বলল, না বাবা বিড়েল আছে।

বিড়েল কোথায় দেখলি?

কালীপুরে মনতোষ কাকার বাড়ি দেখছি।

ভবেশের মনে পড়ল, হ্যাঁ তাদের বাড়ি বেড়াল দেখেছে বটে। মনতোষ মণ্ডল ফরিদপুরের লোক। ১৯৫৭ সালে এসেছে। এই পরিবারের সঙ্গে বেশ প্রীতির সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেছে ভবেশের।

আগামী রবিবার ওদের সবাইকে দুপুরে নেমন্তন্ন করেছে মনতোষ। বাড়িতে মনসা পুজো আছে। কিছু লোকজনকে খেতে বলেছে এই উপলক্ষে।

ভবেশ গৌরীকে বলল, তুমি যাইবা তো? সকলরে যেতে বলেছে কিন্তু।

গৌরী বলল, সেই কালীপুর পাঁচ ছয় কোরোশ রাস্তা আমি কি হাঁটতে পারি। তুমি বিমল আর শ্যামলরে নিয়া যাও। আমি আর শ্যামা ঘরে থাকি।

শ্যামা বলল, মা আমিও যাবো।

গৌরী বলল, তুমি ছেলেমানুষ। এই জল কাদার রাস্তা যাইবা কেমনে?

শ্যামার মুখ দেখে মনে হল সে ভীষণ অখুশি হয়েছে। সে বলল, তোমরা আমায় চোত সংক্রান্তির মেলায় যাইতে দাও নাই।

বড় হইলে কত যাইবা।

ভবেশ বলল, আর দু একটি বছর যাক, শ্যামাকে আমি মেনল্যান্ড ঘুরায়ে আনব।

বিমল ও শ্যামল বলল, বাবা আমরাও যামু।

ভবেশ বলল, তোমরা তো দ্যাখছ। মাইয়া আমার রেলগাড়ি মোটরগাড়ি কিছু দ্যাখে নাই।

শ্যামল বলল, ও জাহাজ দ্যাখছে।

শ্যামা বলল, সে তো তোমরাও দ্যাখছ। আমি তো দূর থে দ্যাখচি। তোমরা তো চড়ছ।

শ্যামল বলল, হ-হ আমার মনে আছে। কত লোক বমি করছিল। আমার বমি পায় নাই।

বিমল বলল, আমারও না।

শ্যামা বিমলের খুব ন্যাওটা হয়েছে, দাদার সঙ্গে জঙ্গলে ঘুরতে তার ভালো লাগে। বিমল তাকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে গাছ চেনায়, এই দ্যাখ প্যাডক গাছ। এই হল পেমা, এই মারবেল গাছ।

কত অজানা পাখির সঙ্গে তাদের দেখা হয়। এখানকার অপরিচিত পাখিদের সে পরিচিত পাখির সঙ্গে মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করে। শালিক চড়াই, বক....আর ওই যে বিরাট বিরাট চিল।

বৃষ্টির ফোঁটা এসে পড়ে রাশি রাশি কচু গাছের ওপর। এক একটা মুক্তোর বিন্দুর মতো জল টলটল করে। কোথা থেকে এল এত কচু গাছের জঙ্গল। সবুজ

ঘাসেরা অবাধ্যের মতো শাসন না মেনে লকলক করে বেড়ে ওঠে। তার ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে চলে এক একটি জোঁক।

শ্যামা বলে, দাদা, আমায় মেনল্যান্ডের গল্প কও।

বিমল বলে মেনল্যান্ড কত বড় জানো, এক মুড়ো থিকা আর এক মুড়ো যাইতে হইলে টেরেনে যাইতে হয়।

টেরেন কি দাদা?

টেরেন একরকমের গাড়ি। লাইনের ওপর দিয়া চলে। অথচ পড়ে না। দ্যাখার মতো জিনিস। রেল চালানোর মধ্যে গুঁতো আছে। কলকেতা শহর দেখছি আমি। একদম বনজঙ্গল নাই। শুধু বিরাট বিরাট বাড়ি! কয়তলা বাড়ি জানো?

কয়তলা?

বিশতলা পঁচিশতলা।

অত উঁচা! ভাঙ্গে পড়ে না?

না, ভেতরে লোহা থাকে। ভাঙ্গে না।

শ্যামা যেন বিশ্বাস করতে পারে না। এমন দেশও আবার আছে নাকি? যেখানে রাস্তা দিয়ে এত গাড়ি যায় যে লোক রাস্তা পারাপারের সুযোগ পায় না। অবশেষে পুলিশ হাত দেখিয়ে গাড়ি থামিয়ে দেয়। এমন আবার হয় নাকি!

শ্যামা বলে, দাদা, আমারে একবার কলকেতা দেখাবি?

দেখামু। আগে বড় হ। তোর কলকেতায় বিয়া দিমু।

শ্যামা বলে, ধ্যেত।

বিমল আবার বলে কলকেতায় বেহালা বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে ময়না থাকে।

ময়নার কথা তুমি আগেও বলছ। ময়না কে দাদা?

বিমল আনমনা হয়ে বলে ময়না—ময়না একটা দারুণ ভালো মাইয়া।

আমার চাইতেও ভালো?

তোর চাইতে ভালো কিনা কইতে পারি না। তবে ময়নার মতো মাইয়া আর একটাও দেখি নাই।

বিমল চোখ বুজলেই দেখতে পায় ময়নাকে। ময়না যেন দাঁড়িয়ে আছে। অনেক বড় হয়ে গেছে ময়না। পরনে শাড়ি। চোখে সলজ্জ দৃষ্টি। বিমলকে দেখে বলছে, বিমল না? তুমি কোথায় ছিলা এতদিন? তোমারে কত খুঁজছি আমি।

কোথায় খুঁজছ।

কোথায় আবার। যেখানেই যাই সেখানেই তোমায় খুঁজি।

আমি তো আন্দামানে আছি। ডিগলিপুর। তুমি আসবা ডিগলিপুরে। ডিগলিপুরে আছে পাহাড়, নদী, বন, গাছ গাছালি, বিজলির মতো ছুটে চলা হরিণ, কত পাখি, কত ঘাস ফড়িং, প্রজাপতি। তুমি আসবা?

না, বিমল, আমি এই কলকেতাতেই থাকব। আমার আর কোথাও যাওয়ার উপায় নাই। কলকাতায় যে একবার আসে পড়ে সে আর কোথাও যেতে পারে না। তার চেয়ে তুমি আসো কলকেতায়।

এই নদী সমুদ্দুর, পাহাড়, বন সব ছাড়ে?

সব ছাড়ে। আমার জন্য সব ছাড়তে পারবা না?

পারব।

এমন সময় চোখ খুলতেই বিমল সম্বিৎ ফিরে পায়। কোথায় ময়না। পাশে দাঁড়িয়ে শ্যামা কথা বলছে।

শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত হল মনতোষের বাড়িতে যাবে শুধু বাচ্চারা। ভবেশ তাদের নিয়ে যাবে। রমেশ বলল, দাদা আমার মাঠে একটু কাজ আছে। তুমি বাচ্চাদের নে যাও।

ভবেশ বলল, বাচ্চারা কি অতদূর হাঁটতে পারবে?

শ্যামা পারবে না। আর সবাই পারবে।

শ্যামা তো ফ্যাসাদ বাঁধয়েছে। বায়না ধরেছে আমি যাব। ওরে না নিয়ে কেউ যেতে পারবে না।

ঠিক আছে দাদা। ছেলেমানুষ। বাড়ির বার হয়নি তো কখনও। সমুদ্দুরের ধারে বাস, অথচ সমুদ্দুর দ্যাহে নাই কখনও। তুমি ওরে কান্ধে করে নে যাও। পারবা না?

ভবেশ একটু ভেবে বলল পারব। জিরায়ে জিরায়ে যাব। এক রাত থাকতে হবে, কাল সকালে হাঁটা দিয়ে তারপর আসব। তুই একটু দেখিস বউদিকে।

সে তোমার বলা লাগবে না।

আগের দিন রাতে উত্তেজনায় ছেলেমেয়েদের কারও ঘুম হল না। খুব ভোর না হতেই দুর্গা দুর্গা বলে ওরা বেরিয়ে পড়ল।

কেরলপুরমে এসে নারায়ণনের বাড়িতে বিশ্রাম নিল ওরা। কেরলপুরমকে এখন দেখলে চেনা যায় না। অনেক ছিমছাম বাড়ি তৈরি হয়েছে সেখানে। ওরা তৈরি করে নিয়েছে ক্যাথলিক গির্জা।

নারায়ণন এখন বেশ বাংলা শিখে গেছে।

নারায়ণন বলে, আজ বিকেলের জাহাজে মোষ এসে পৌঁছিচ্ছে তুমি শোননি?

ভবেশ বলে, তাই নাকি? একদম জানতাম না। গত ক'দিন ধরে খেতের কাজে ভীষণ ব্যস্ত ছিলাম।

নারায়ণন বলে, আমিও জানতাম না। আমায় কাল রঞ্জু দাদা এসে জানিয়ে গেল।

তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল রঞ্জুর?

হ্যাঁ। কাল এরিয়েল বে-তে এসেছিল রঞ্জুদাদা। অনেকক্ষণ ধরে কথা হল। কো-অপারেটিভ থেকে পরশু রেজিগনেশন দিয়েছেন উনি।

কেন কী হয়েছে?

নারায়ণনের বউ ইতিমধ্যে শশা কেটে নিয়ে ঢোকে। সে বলে, শশা ছাড়া এই সময় তো কিছু দিতে পারছি না বাচ্চাদের। ওদের তো চা দিতে পারি না। তোমাদের জন্য চা করি?

ভবেশ বলে, করো।

নারায়ণনের বউ বলে দুধ দিতে পারব না। দুধ নেই দোকানে। আমরা এখন র-চা খাচ্ছি।

ভবেশ বলল, আমাদের অভ্যেস আছে। তারপর নারায়ণনকে, বলল, ভালো কথা, তোমার ছেলেকে দেখছি না তো।

নারায়ণন বলল, ছেলের চার বছর বয়স হল। আমরা স্কুল করেছি। ওখানেই যাচ্ছে আপাতত। ছেলেটাকে একটু ভালো লেখাপড়া শেখাবার ইচ্ছে আছে।

তোমার ছেলের নাম কি দিয়েছ?

তুলসীদাস।

বাঃ বেশ ভাল নাম—তুলসীদাস নামে একজন কবি ছিলেন না?

হ্যাঁ, যিনি হিন্দিতে রামায়ণ লিখেছিলেন।

তোমার ছেলে বেঁচে বর্তে থাক।

তারপর প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে ভবেশ বলল, রঞ্জু কাল এরিয়েল বে-তে এসেছিল কেন?

মোষ নামার তদারক করতে। এক জাহাজ মোষ। সোজা কথা তো নয়। এল সি ডিতে করে নামবে।

রঞ্জু কো-অপারেটিভ থেকে কি দিয়েছে বললে?

রেজিগনেশন।

মানে?

মানে পদত্যাগ করেছে। আর সেক্রেটারি নেই।

কেন?

আমাকে বলল, ডিগলিপুরে থাকতে পারছে না পোর্টব্লেয়ার চলে যাচ্ছে তাই। কিন্তু ভেতরে ভেতরে শুনলাম অন্য খবর—

কী খবর?

এই তোমাদের বাঙালিদের যা হয়। এ ওকে দেখতে পারে না। পরস্পরের মধ্যে খেয়োখেয়ি। আমাদের মালয়ালিদের মধ্যে এসব নেই। আমরা মিলেমিশে থাকি।

ভবেশের ভালো লাগছিল না এই বাঙালি নিন্দা।

সে বলল, আসল কথাটা বলো না।

নারায়ণন বলল, রঞ্জুর বিরুদ্ধে নানা করাপশান চার্জ উঠেছিল।

তার মানে?

তার মানে দুর্নীতি।

অসম্ভব এ হতেই পারে না।

আমাদেরও তাই বক্তব্য, কোনো চার্জই প্রমাণ হয়নি। কিন্তু রঞ্জুদাদা আর ডিগলিপুরে থাকবে না। সে পোর্টব্লেয়ার গিয়ে কংগ্রেসের কাজ করবে। তারপর তার আরও প্ল্যান আছে। সে মেনল্যান্ডে যাবে। লেখাপড়া শিখবে। উকিল হবে।

ভবেশ বলল, এটা তো ভালোই। রঞ্জু যদি লেখাপড়া শ্যাষ কইরা ফিরে আসে তাহলে এর চেয়ে ভালো আর কী হইতে পারে।

কিন্তু তাকে তো বদনাম দেওয়া হল।

কারা দিয়েছে জানি। তাদের কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। তবে রঞ্জু যদি লেখাপড়া করার লাইগা চলে যায় তাহলে এটা তার শাপে বর হইব।

তারপর ভবেশ জিজ্ঞাসা করল, কবে যাবে বলতে পারো?

শুনেছি গোরুর জাহাজেই ফিরে যাবে। কাল দুপুরে জাহাজ আসছে। পরশু বিকেলে ছাড়বে।

আবার যাত্রা শুরু করল ভবেশ দলবল নিয়ে। যাবার সময় ভাবছিল রঞ্জুর বিরুদ্ধে এত ষড়যন্ত্র চলছিল, সে কিন্তু ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি। ফসল ফলাবার নেশায় সে এত ব্যস্ত ছিল যে অনেকদিন সুভাষগ্রামে এসে রঞ্জুর সঙ্গে কথা বলতে পারেনি। রঞ্জু যদি চলে যায় তাহলে দুর্ভাগ্য ডিগলিপুরের।

ভবেশ ঠিক করল পরশু বিকেলে জাহাজ ছাড়ার আগে সে জাহাজঘাটে আসবে রঞ্জুকে বিদায় জানাবার জন্য। কিন্তু তার মনটা বেশ খারাপ হয়ে গেল খবরটা শুনে।

কালীপুরে মনতোষদের বাড়ি ভবেশরা যখন পৌঁছোল তখন বেলা এগারোটা।

ধানি জমির একপাশে বাড়ি করেছে মনতোষ। সামনে দিয়ে রাস্তা। একদিন হয়তো বাসও যাবে এই রাস্তা দিয়ে। রাস্তা চলে গেছে আরও দূরের গ্রাম শিবপুরে।

মনতোষদের জমির আশেপাশে কোনও বাড়ি নেই। চারিদিকে ঘন জঙ্গল।

এরিয়েল বে থেকে এই পথে আসার সময় বাঁ দিকে সমুদ্র পড়ে। ডানদিকে বড় বড় টিলা। জঙ্গল। আবার সমভূমি। তবে সমুদ্রের বেলাভূমি এখানে নেই। ব্যাকওয়াটার এসে মিলেছে তীরের সঙ্গে। মনতোষের বাড়ি থেকে সমুদ্র বেশি দূর নয়।

মনতোষ তার বাড়ির সামনে অপেক্ষা করছিল। ভবেশকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল, আরে আসেন আসেন। আপনাদের জন্য অপেক্ষা করতাছি। কখন বার হইছেন?

ভবেশ বলল, সকাল ছয়টায়। কেরালাপুরমে কিছুক্ষণ জিরায়ে নিচ্ছিলাম।

মনতোষ ছেলেমেয়েদের ডাকল ভেতরে। আসো, আসো, তোমাদের হাঁটে আসতে কষ্ট হয় নাই তো?

বিমল বলল, না।

মনতোষ তার দুই ছেলে কানাই ও বলাইকে ডাকল। কানাইর বয়স বারো। বলাই-র আট। মনতোষ বলল, আমার দুই ছেলে। কানাই আর বলাই। কানাই, এরা হইল তোমার কাকা ভবেশ আর রমেশবাবুর ছেলে-মেয়ে। নাও সাবা দাও।

কানাই আর বলাই ভবেশ ও রমেশকে প্রণাম করতেই ভবেশ বাধা দিল। থাক থাক।

মনতোষ বলল : না না থাকবে ক্যান। আমি ছেলেরে শেখাই তোমরা বাঙালির পোলা, ভুলবা না।

মনতোষ শ্যামার দিকে তাকিয়ে বলল, এইটা আপনার মাইয়া? যার হওনের সময় আপনার স্ত্রী অসুস্থ হইয়া পড়ছিল?

ভবেশ বলল, হ্যাঁ।

কী নাম তোমার?

শ্যামা লজ্জা পেয়ে চুপ করে থাকে।

ভবেশ বলে, নাম বলো। লজ্জা পাও ক্যান।

শ্যামা বলল, শ্যামা।

তা কত বয়স হইল মাইয়ার?

পাঁচ বছরে পড়ছে।

বেশ টক্ক হইছে তো। এতখানি পথ হাঁটে এল।

মাঝে মাঝে কোলে উঠছে।

শ্যামা লজ্জা পেল।

বিমল বলল, বাবা আমরা একটু ঘুরে আসি।

ভবেশ ধমক দিয়ে বলল, কোথায় যাবা? বোস চুপ করিয়া।

মনতোষ বলল, আহা ছেলেমানষে কি আর আমাদের মতো এক জায়গায় বসে থাকতে পারে। কানাই ওদের নিয়া বাগানটাগান দ্যাখাও। রাতের বেলা হরিণ দ্যাখতে পাইবা। শয়ে শয়ে হরিণ আসে। সে কি অত্যাচার তাদের। আপনাদের হরিণের অত্যাচার আছে?

ছিল, এখন কমছে।

আমাদের কমে নাই। বেড়া দিয়ে রাখছি। বেড়া ভাইঙ্গা ঢোকে এক এক সময়। একটা বাচ্চা পালছি হরিণের। বলাই বাচ্চাটারে দেখাস তো।

বলাই ওদের নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতেই মনতোষ বলল, বেশি দূর যাইও না। তোমাদের জন্য মুড়ি ভাজছে তোমাদের মাসিমা।

একটু পরে মনতোষের বউ ঢুকল ঘরে। এতক্ষণ রান্না করছিল। এসে ভবেশকে বলল, আপনার কথা অনেক শুনছি। রোজই শুনি আসপেন আসপেন। আপনার স্ত্রী আইলেন না?

ওর তো শরীল ভালো নয়।

কেন কী হইছে?

ওই মাইয়াডা যখন প্যাটে তখন থেকা নানা বেগতিক দেচ্ছে শরীল। এহানে ডাক্তার নাই বদ্যি নাই।

মনতোষ বলল, আপনারে এক গুনিনের কছে নে যাব। সে ভালো জলপড়া জানে। দ্যাখবেন সব সারে গেছে।

ঠিক আছে। যা বলবেন করব।

মনতোষের বউ বলল, আপনি চা খান তো?

চা? তা খাইতে পারি। আপনার অসুবিধে হবে না তো?

অসুবিধা কি। তবে চিনি পাই নাই, গুড় দিচ্ছি কিন্তু।

আমরাও গুড়-চা খাই অনেক সময়।

দ্যাশে বইয়া কেউ চা খাই নাই। ক্যাম্পে খাওয়া অভ্যাস করছি।

আমরাও ঠিক তাই। আমি পেরথম চা খাই বনগেঁ ইস্টিশনে।

মনতোষ বলল, বিড়ি চলে তো?

ভবেশ বলল, তা চলে।

কলকেতের ইয়াসিনের বিড়ি। সাদা সুতো।

মনতোষ একটা বিড়ি ধরিয়ে নিজে নিল। আর একটা বিড়ি ভবেশকে দিল ও রমেশকে।

ভবেশ মনতোষের ঘরটা দেখছিল। বেশ নিকানো গোছানো, পরিপাটি করে সাজানো। একটি মৃতদেহের ছবি রয়েছে। ছবির পাশে মনতোষের পরিবার দাঁড়িয়ে। ভবেশ আন্দাজে বুঝল মনতোষের বাবা। ক্যাম্পে থাকার সময় তার মৃত্যু হয়। আর একটি সেলাইয়ের কাজ বাঁধানো। তলায় বাংলায় লেখা—মা।

ভবেশ বসে বসে ভাবতে লাগল মানুষ একদিকে যেমন হারায় অন্য দিকে তেমন কত তাড়াতাড়ি সব কিছু গড়ে তোলার চেষ্টা করে। তার যেন এক এক সময় মনে হয় তার কিছুই হারায়নি, সবই আছে। সে যেন কোনওদিন ডিগলিপুরের বাইরে ছিল না। এখানেই তার জন্ম। এই গাছগাছালি, লতাগুল্ম, পশুপাখির সঙ্গে যেন তার কত দিনের পরিচয়। তার এক এক সময় বেশ ভালো লেগে যায় এদের। নিজেকে এদেরই অংশ মনে করে তৃপ্তি পায়।

আপনার চা। গুড় কম হলে বলবেন।

ভবেশ সম্বিৎ ফিরে পেয়ে দেখল মনতোষের বউ চা নিয়ে এসেছে।

মনতোষের বউ যথেষ্ট স্বাস্থ্যবতী, সপ্রতিভ। কালোর ওপর মুখের গড়নও মন্দ নয়। গৌরীর মুখ মনে পড়ল, গৌরীর চুলে পাক ধরেছে। রোগা হয়ে গেছে বেচারি।

বিমল বাইরে বেরিয়ে বলল, ওদিকটায় তো সমুদ্দুর।

বলাই বলল, হ্যাঁ।

শ্যামা বায়না ধরল, দাদা আমি সমুন্দুর দ্যাখব।

বিমল বলল, অনেক দূর এখান থেকে। তুই আর হাঁটতে পারবি না।

হ্যাঁ। পারব। শ্যামা কাঁদতে শুরু করে দিল।

শ্যামার দেখাদেখি বলাইও বলল, আম্মো সমুন্দুরে যাবো।

কানাই বলল, সমুন্দুরে যাও যদি চলো না। বেশিদূর নয়। বনের মধ্য দিয়ে পথ আছে।

বলাই বলল, দাদা আমি ভেলায় চড়ব কিন্তু।

কানাই বলল, বাবায় যদি বকে।

বলাই বলল, না বকবে না। আমি তো সেদিন বাবার সঙ্গে উঠছিলাম।

বিমল জিজ্ঞাসা করল, ভেলা কি রে?

বলাই বলল, গাছের গুঁড়ি জলে ভাসায়ে থোয়। আমরা তার ওপর চাপি।

ওহানে কুমির নাই? বিমল জিজ্ঞাসা করল।

কনাই বলল, না। ব্যাক ওয়াটারে কুমির থাকে না। কুমির আছে পচ্চিম পাড়ে। যেহানে নালা আসে পড়ছে। আমি দেখছি বড় বড় কুমির। ঘুমায়ে থাকে। তুমি দ্যাখছ কুমির।

বিমল ঘাড় নাড়ল।

বিমল তার ভাইবোনদের নিয়ে এগিয়ে চলেছে। জঙ্গলের মধ্যে কত পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ খশ খশ করে পাশ দিয়ে কি একটা বেরিয়ে গেল।

বিমল বলল, হরিণ।

বলাই বলল, না, হরিণ এই সময় বার হয় না। ওটা মনে হয় কোনও শুয়োর টুয়োর হবে।

বিমলের বেশ ভালো লাগে বনের মধ্যে এমন করে হারিয়ে যাওয়া। একটি ঝোপের ওপর বসে আছে কী সুন্দর বিচিত্রবরণ প্রজাপতি। তার গায়ে হাত দিতে গেলেই প্রজাপতিটা উড়ে গেল। বিমল প্রজাপতিটাকে ধরার জন্য এগিয়ে যায়। উড়ে যায় প্রজাপতিটা। কিন্তু আবার একটু দুরে গিয়ে গাছের ওপর বসে। বিমলের বেশ মজা লেগে যায়।

শ্যামা সবার হাত ছাড়িয়ে এগিয়ে যায়। একটু দূরে উঁচু একটি জায়গায় গিয়ে শ্যামা চিৎকার করে—দাদা, সমুন্দুর, সমুন্দুর।

ঘণ্টা দুয়েক পরে মনতোষের বউ এসে জিজ্ঞেসা করল। আমার তো রান্নাবান্না সারা, কিন্তু বাচ্চারা তো এখনও ফিরল না।

মনতোষের খেয়াল ছিল না এতক্ষণ। গল্প করতে করতে সে সব কিছু ভুলে গিয়েছিল। দুজনের স্বপ্নের কথা শোনাচ্ছিল পরস্পরকে।

ভবেশের এখন স্বপ্ন তার সমস্ত জমিকে চাষের আওতার মধ্যে আনা। ব্যবসা করার ইচ্ছে তার নেই। সে চাষি হয়েই কাটাতে চায়। সুযোগ পেলে সে দেখিয়ে দিতে পারে ফসল ফলানো কাকে বলে।

সে চায় তার দুই ছেলে লেখাপড়া শিখুক। কিন্তু তারা যেন চাষ না ছাড়ে। চাষ হল লক্ষ্মী। চাষির ছেলে হাল ছেড়ে দিলে লক্ষ্মীও ছেড়ে যাবে। তাই সে যেভাবেই হোক জমিকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়।

মনতোষ চায় তার বড় ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে। বড় ছেলেকে সে মাস্টার করবে। ছোটটার মাথা ভালো নয়। তাকেই দেবে জমি জায়গায় দায়িত্ব।

ভবেশ বলল, বউডার শরীলটা যদি এভাবে ভেঙে না পড়ত তাহলে আমার এত অসুবিধে হত না। এত ধকল গেছে, বউ সব সামাল দেছে এতদিন। এখন ছেলের বে দিয়া বউ আনতে কি কম দিন লাগব—

মনতোষ বলল, আপনারে যা বললাম তাই করেন, গুনিনরে দেখান একদিন।

মনতোষের বউ এসে আবার তাড়া দেয়, ওগো শোনছ। একবার দ্যাখো না, ওরা আসতিছে না এহনও। কী হইল?

কনে গ্যাছে?

সমুন্দুরের দিকে যেতে দ্যাখলাম।

দ্যাখগে যাও খেলতিছে ওদিকে—

তুমি ডাকে আনো। বেলা যেতে বসল। আমার রান্না তো জুড়োয়ে যাচ্ছে। ঠাকুরপো আপনি চান করবেন?

ভবেশ বলল, আমি সারে আইছি।

মনতোষের বউ স্বামীকে বলল, তাহলে তুমি গিয়ে চট করে দ্যাখে আসো।

ভবেশ বলল, চলেন আমিও যাই।

রাস্তা পেরিয়ে আর একটু এগুলেই জঙ্গল। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পায়ে চলা রাস্তা চলে গেছে সমুদ্রের ব্যাক ওয়াটারের দিকে।

ওই রাস্তা ধরে কিছুদূর এগুতেই ভবেশ আর মনতোষ দেখল ভিজে জামা প্যান্ট পরে ক্লান্ত বিধ্বস্ত দেহে এগিয়ে আসছে বিমল, শ্যামল, শ্যামা, রমেশের দুই মেয়ে, মনতোষের ছেলে কানাই।

ওদের দেখে সব কটা ছেলেমেয়েই ডুকরে কেঁদে উঠল।

চমকে উঠে মনতোষ জিজ্ঞাসা করল, কী হয়েছে! কী ব্যাপার? বলাই কোথায়? চুপ ক্যান? বলাই কোথায়?

কানাই বলল, বলাই ভাইস্যা গেছে।

তার মানে?

আমরা সমুন্দুরে ভেলায় ভাসতিছিলাম। হঠাৎ বলাই ভেলা থেকে পড়ে যায়। তারপর কারেন্টে তারে লইয়া গেছে। আমরা খোঁজলাম, তারে পালাম না—ডাক

ছেড়ে ডুকরে কেঁদে উঠল কানাই।

ঘটনার যেটুকু জানা গেল তা হল এই, জঙ্গলের মধ্যে খেলতে খেলতে ওদের খেয়াল হয় ব্যাক ওয়াটারে ওরা ভেলায় করে ভাসবে। সারি সারি গাছের গুঁড়ি কেটে কেটে ব্যাক ওয়াটারে ভাসিয়ে রাখা হয়েছিল। টো করে বেঁধে জাহাজে তোলা হবে একসময়। ওখানে হাঁটু জল। ওরা মাঝে মাঝেই গুঁড়ির ওপর চড়ে জলে ভাসে। সেদিনও চড়েছিল গুঁড়ির ওপর। কিন্তু কীভাবে জলে পড়ে যায় বলাই। আর পড়ে গিয়েই একেবারে তলিয়ে যায়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আশেপাশের গ্রামের লোকেরা ভেঙে পড়ল। জেলেরা জাল ফেলে, ডুঙ্গি করে অনেক দূর গিয়ে লগি ঠেলে ঠেলে খুঁজে বার করার চেষ্টা করল বলাইয়ের লাশ।

অবশেষে পাওয়া গেল মাইল দুয়েক দূরে। সমুদ্র কিছু নেয় না। সবই ফিরিয়ে দেয়। মৃত বলাইকেও ফিরিয়ে দিল।

ডিগলিপুরের উপকথার মধ্যে এমনি কত মৃত্যুর ইতিহাস আছে। সেই শোক দুদিনের জন্য আলোড়ন তুলে আবার কোথায় চিরদিনের জন্য হারিয়ে যায়। গ্রামের মানুষেরা মনতোষের শোকস্তব্ধ পরিবারকে সান্ত্বনা দিয়ে যে যার মতো ঘরে ফিরে গেল।

সে রাতে ভবেশরা কেউ ফিরতে পারল না।

সারারাত একরকম জেগেই বসে রইল শোকাহত পরিবারটির পাশে। বলাইয়ের দেহ কবর দিয়ে আসা হয়েছে। অপঘাতে মৃত্যু হলে ওরা দাহ করে না।

পরদিন সকালবেলা ওরা বিদায় নিল। বিদায় নেবার সময় ভবেশ চোখের জল চাপতে পারল না।

ফেরার সময় সারাটা পথ পরিবারের কেউ কোনও কথা বলেনি। তারা হাঁটছিল পথশ্রান্ত অবসন্ন চারণিকদের মতো।

বিমল যেতে যেতে ভাবছিল, মানুষ হঠাৎ হঠাৎ এমন করে হারিয়ে যায় কেন? কাল সমুদ্রে সেও তো এমন করে হারিয়ে যেতে পারত। যদি সে ডুবে যেত তাহলে সে কোথায় যেত? মৃত্যুর পর মানুষ নাকি স্বর্গে যায়? কোথায় সেই স্বর্গ? কোন্ ঊর্ধ্ব আকাশে গগনচারীরা সবার অলক্ষ্যে বসে মর্ত্যচারীদের আয় আয় বলে ডাক দেয়। আর তাদের প্রলোভনে ধরা দেয় মর্ত্যের মানুষ। আর সে ফেরে না।

বিমল শিউরে ওঠে। যদি সে ফিরে না আসতে পারে তাহলে আর তো কখনও দেখা হবে না তার বাবার সঙ্গে, মায়ের সঙ্গে, শ্যামলের সঙ্গে শ্যামার সঙ্গে। দেখা হবে না ডিগলিপুরের আকাশ-বন-নদী-পাহাড়ের ওপর ঘনঘন মেঘের রং বদল। দেখা হবে না সমুদ্রের রং কেমন পালটায় ঋতুতে ঋতুতে। নীল ঢেউ, সাদা ফেনা। ফিকে নীল—আকাশের নীল আর সাগরের নীল মাঝে মাঝে একাকার হয়ে যায়। কোথায় যে আকাশের শুরু আর সমুদ্রের শেষ তা বোঝা যায় না।

বলাইয়ের মুখ তার বার বার মনে পড়ে। ছেলেটি সবচেয়ে উজ্জ্বল ছিল। প্রাণবন্ত ছিল। সবার আগে আগে যাচ্ছিল। আর সেই-ই তাদের প্রস্তাব দিয়েছিল চল আমরা ভেলায় ভাসি। ভেলাটা দিব্যি ভেসে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ একটা ঢেউ এসে কাত হয়ে পড়ল একটা দিক। বলাই একদম ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। মুহূর্তের মধ্যে সে পড়ে গেল জলে। আর উঠল না। ভেলায় ভাসতে চেয়েছিল বলাই।

সেই বলাই নিজেই কোথায় ভেসে গেল। মুহূর্তের মধ্যে তলিয়ে গেল চোরা স্রোতে। মৃত্যু যেন সাপের মতো ফণা ধরেই আছে এই ডিগলিপুরে। সব সময় তাড়া করে ফিরছে তাদের। কিন্তু তাদের পালাবার পথ বন্ধ।

এরিয়েল বে-র কাছে আসতেই হঠাৎ লক্ষ্য করল বিমল, শত শত মোষ নেমেছে জাহাজ থেকে রাস্তায়। তাদের পায়ের খুরে খুরে ধুলো উড়ছে। সেই ধুলোয় ধুলোয় অন্ধকার হয়ে উঠেছে পথ।

সমস্ত শোক দুঃখ ভুলে ভবেশ চিৎকার করে উঠল, রমেশ—গোরু, গোরু, আমাদের হালের গোরু আসছে। আমাদের হালের গোরু আসছে।

ভবেশ ও রমেশ ছুটতে লাগল পাগলের মতো। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে গরু ও মোষগুলি। দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রার পর এই সবুজ দ্বীপে এসে গোরু ও মোষগুলি যেন পাগল হয়ে গেছে। তারা মুখ দিচ্ছে সবুজ ঘাসে। বহুদিন পর লকলকে জিভে ঠেকাচ্ছে সবুজ ঘাসের স্পর্শ।

বিমল তার ভাইবোনদের নিয়ে এগোচ্ছিল। কিন্তু বেশিদূর যেতে পারল না। তাদের পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে মোষগুলি। শ্যামা এই প্রথম মোষ দেখছে তার জীবনে।

এই দ্বীপে এ পর্যন্ত মুরগি ছাড়া আর কোনও গৃহপালিত জন্তু ছিল না এতদিন। এই প্রথম গৃহপালিত জন্তুর আগমনে ডিগলিপুরের জীবন পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। শ্যামা অবাক হয়ে দেখছে আর বলছে, আমি ওই মোষটা নেব দাদা।

কমল বলছে, আমি ওই মহিষডারে নেব।

শ্যামা বলছে, আমি ওই বাঁকা শিংওয়ালা মহিষডারে নেব।

বিমল কতক্ষণ ধরে যে আত্মনিমগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল তা সে জানে না। হঠাৎ সে দেখল রঞ্জুদা আসছে।

রঞ্জুদা।

রঞ্জু এগিয়ে এল বিমলের দিকে। বলল, তোকে খুঁজছি কাল থেকে; কোথায় ছিলি তুই?

শিবপুরে মনতোষ কাকুর বাড়ি। তুমি শোনছ কিছু?

কী হয়েছে?

কাল আমরা কাঠের গুঁড়ির উপর ভেলা ভেলা খেলছিলাম। সেই সময় মনোতোষ কাকুর ছোট ছেলে জলে ডুইব্যা মারা যায়।

রঞ্জু খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, আমি শুনিনি। কাল সারা রাত ধরে গোরু-মোষ কীভাবে বন্টন করা হবে তা নিয়ে মিটিং করেছি।

তুমি এখন কোথায় যাও রঞ্জুদা?

পোর্টব্লেয়ার যাচ্ছিরে বিমল। এক্ষুনি আমাদের জাহাজ ছাড়বে।

পোর্টব্লেয়ার কেন?

এখন থেকে পোর্টব্লেয়ারেই থাকব। ওখানে কংগ্রেস অফিসের দায়িত্ব নিতে হবে। তবে আমার ইচ্ছে পোর্টব্লেয়ার থেকে কলকাতায় যাওয়া। কলকাতায় গিয়ে সেখানে থাকতে হবে অনেকদিন।

কেন?

পড়াশোনার জন্য। আমি আবার পড়াশোনা করব।

তুমি বিদ্বান হইয়া তবে ফেরবা।

হ্যাঁ। বিমল। লেখাপড়া শিখে ক্ষমতা না বাড়ালে অনেকেই মানবে না। কো-অপারেটিভ করতে গিয়ে আলু পচার জন্য আমাকে কী নাস্তানাবুদই করল মিটিঙে।

তার জন্য তুমি চলে যাইবা?

চলে যাচ্ছি কোথায়? আবার তো আসব। আমার মা থাকল। বাড়ি থাকল, ডিগলিপুর থাকল। তোদের ছেড়ে কি আমি বেশিদিন থাকতে পারি?

জাহাজে ভোঁ দিল। সাদা হাফপ্যান্ট পরা একজন জাহাজ কর্মচারী এসে রঞ্জুকে বলল, রঞ্জনবাবু উঠুন, আপনারা জন্য জাহাজ ছাড়তে পারছে না।

সব প্যাসেঞ্জার উঠে গেছে?

হ্যাঁ, অনেকক্ষণ।

বিমলের হাতটা ধরে রঞ্জন বলল, চলি কেমন। শ্যামল ও শ্যামার গাল টিপে একটু আদর করল রঞ্জন। বলল, বেশ বোনটা হয়েছে তোর।

ছোট্ট ডুঙ্গিটা রঞ্জনকে নিয়ে জল কাটতে কাটতে এগিয়ে গেল দূরে নোঙর করা জাহাজের দিকে।

সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল বিমল।

আশ্চর্য এত কান্না তার কোথায় জমা ছিল সে নিজেও জানত না। গতকাল যখন তার সামনে বলাই জলে পড়ে যায়, তারপর যখন তার মৃতদেহ পাওয়া যায় তখনও সে বিচলিত হয়নি, কাঁদেনি। চোখের সামনে যেন বিস্ময়কর কোনো ঘটনা নিমেষের মধ্যে ঘটে গেলে মানুষ শুধু বিহ্বল হয়ে পড়ে ঠিক তেমনি ঘটে গেল ব্যাপারটা।

কিন্তু রঞ্জুদার হঠাৎ এইভাবে চলে যাওয়াটায় তার মনে হল সব কিছু যেন ফাঁকা হয়ে গেল আজ।

ভবেশ ফিরে এল। তার মুখে একদিকে আনন্দ, আর একদিকে উদ্বেগ।

আনন্দ এতদিন পরে গোরু মোষ এসেছে বলে। উদ্বেগ পাছে ভালো ভালো গোরু মোষগুলি যদি ভাগবাঁটোয়ারা করে অন্যরা নিয়ে নেয়।

বিমল বলল, বাবা রঞ্জুদা পোর্টব্লেয়ার চলে গেল।

ভবেশ বলল, আমার সঙ্গে একটু দেখা হইছে। এই সময়ডা চলে গেল। আমারে যদি বুড়ো মোষ দে ঠকায়ে দেয়। রাহাবাবুরে বললাম, তা তিনি কথা কানেই তোলেন না। মাতব্বর দেখতিছি সব অন্য লোকেরা। কী যে হবে—যদি গোরু মোষ জুত মতো না হয়, তাহলে সবডাই মাটি। তোরা রমেশের সঙ্গে বাড়ি চলে যা। আমি গোরু মোষের ভাগবাঁটোয়ারা না দেখে যাব না। দরকার হলে সারা দিন এহানে বইয়া রইব।

ভবেশ এক নতুন স্বপ্নে বুঁদ হয়ে রয়েছে। তার কাছে তখন ছেলে মেয়ে জগৎ সংসারে সব মিথ্যে।

বিমল তাকিয়ে রয়েছে সমুদ্রে দিকে। একটি বিন্দুর মতো হয়ে গেছে ডুঙ্গিটা। অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে জাহাজের কাছে গিয়ে থেমেছে। রঞ্জুদা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠছে। জাহাজ ছাড়বে এইবার।

পিঠে একটা হাতের স্পর্শে চমকে ফিরে তাকাল ভবেশ। তাকিয়ে দেখল মনতোষ। তুমি এহানে?

শুনলাম গোরু মহিষ আইছে। তাই চলে এলাম। বউডা তখনও অজ্ঞান হইয়া আছে। মুখে একফোটা জলও দেয় নাই। আমি কী করি বলতে পারো? বড় ছেলেটাও আর কথা বলে না। এক রাতের মধ্যে সব কিছু ওলট-পালট হইয়া গেল ভবেশ। সমুন্দুর আমার ছাওয়ালটাকে গেরাস করল। আমাকে খাইল না-কেন? আমি কেন বেঁচে আছি। হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল মনতোষ। কিন্তু অসংখ্য মানুষের উল্লাসের শব্দে সেই সন্তানহারার আর্তনাদ চাপা পড়ে গেল।

সবাই ছুটছে বিডিও অফিসের দিকে। তাড়াতাড়ি না পৌঁছোতে পারলে প্রথম অ্যালটমেন্টের গরুমহিষ তারা পাবে না।

ডিগলিপুরের মানুষের এখন পিছনে ফিরে তাকাবার সময় নেই। সবাই ছুটছে। ভবেশ মনতোষ হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিল।

বলল, পা চালাও মনতোষ। ছুট লাগাও। আমার হাত ধরো। বিমল তুই বাড়ির দিকে হাঁটা দে।

ছোটো মনতোষ। আরও জোরে।

খুব শিগ্‌গিরই ওরা দুজন ছুটন্ত মানুষের ভিড়ে হারিয়ে গেল।

দ্বিতীয় পর্ব

ডিগলিপুরের এই কাহিনির দৃশ্যপট উঠছে আবার ৩১ বছর পরে। এই ৩১ বছরে ডিগলিপুরের পরিবর্তনের খবর মূল ভূখণ্ডের মানুষ রাখে না। এমনকী তারা কেউ এই তিনদশক ধরে জানেও না যে ভারতবর্ষে ডিগলিপুর বলে একটি ভূখণ্ড আছে। যেখানে এখন জনসংখ্যা বেড়ে হয়েছে চল্লিশহাজার। যেখানে এখনও ষাট শতাংশ মানুষ কথা বলে বাংলা ভাষায়। ভারতবর্ষের মানুষ খোঁজও রাখে না যে আন্দামানের এই ছোট্ট দ্বীপটি জুড়ে দুর্বার প্রাণশক্তি কীভাবে সহস্র বাধা বিপত্তি চূর্ণ করে নিজেকে পরিব্যাপ্ত করেছে। এ ডিগলিপুর আর সেই ১৯৫৪ সালের ডিগলিপুরের মধ্যে এখন আকাশ-পাতাল তফাত। এখন সারা ডিগলিপুরের সবুজ অরণ্য চিরে পাকা পিচের রাস্তা অজগর সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে। স্পর্শ করেছে চারপাশের সমুদ্রকে। রাস্তার কাজ থেমে নেই। পথ চলতে চলতে দেখা যায় বর্ডার রোডস-এর কর্মীদের অস্থায়ী ব্যারাকগুলো। আরও রাস্তা হবে। ডিগলিপুরের সঙ্গে মায়াবন্দরকে যুক্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। সকালে মায়াবন্দর থেকে বাস সার্ভিস আছে পোর্ট ব্লেয়ার পর্যন্ত। মায়াবন্দর থেকে সোজা বাস চলে যাবে কদমতলা। সেখানে ফেরিতে পার হয়ে আবার বাসে উঠলে বিকেলে পোর্ট ব্লেয়ার। ডিগলিপুর-মায়াবন্দর রাস্তা হয়ে গেলে ভোর রাতে ডিগলিপুর ছাড়লে বিকেলের মধ্যে পোর্ট ব্লেয়ার পৌঁছে যাবে এখানকার মানুষ। এখনকার মতো জাহাজের জন্য তীর্থের কাকের মতো অপেক্ষা করতে হবে না। আগের মতো এখন আর পায়ে হেঁটে চলাফেরা করতে হয় না ডিগলিপুরের মানুষজনকে। সুভাষবাজার বাসস্ট্যান্ড থেকে এখন দ্বীপের সর্বত্র বাস ছাড়ে। পুব দিকে ১১ কিলোমিটার গেলে দুর্গাপুর, আর এক কিলোমিটার দূরে শিবপুর। বাস যায় ১৪ কিলোমিটার কালীপুর পর্যন্ত। উত্তরে সাগরদ্বীপ ২০ কিলোমিটার ও পশ্চিমে ৩০ কিলোমিটার পশ্চিমসাগর পর্যন্তও বাসে যাওয়া যায়।

৮৮৪ বর্গ কিলোমিটার ডিগলিপুর জুড়ে এখন গড়ে উঠেছে ৩৫টি গ্রাম। গ্রামের নামগুলির মধ্যেও বাংলার সোঁদামাটির গন্ধ। যেমন মধুপুর, কৃষ্ণপুর, রবীন্দ্রপল্লী, সীতানগর, ক্ষুদিরামপুর, সুভাষগ্রাম, রামকৃষ্ণগ্রাম, দেশবন্ধুগ্রাম, দুর্গাপুর, শিবপুর, কালীপুর, সাগরদ্বীপ—প্রতিটি গ্রামে গেলে মনে হবে বুঝি ইউরোপের কোনো গ্রামে এসেছি। চারদিকে প্রাচুর্যের ছাপ। মাটির দাওয়া, কোথাও ইঁটের বাড়ি, মাথায় টালি কিংবা টিনের ছাউনি। বাড়ির সঙ্গে লাগোয়া ধানের খেত। বাড়ির সামনে ফুলের বাগান। গোয়ালে বাঁধা গোরু। বাড়িতে ধানের মরাই। হাঁস-মুরগি, ছাগল চরছে উঠোনে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে টেপা কল। পানীয় জল সরবরাহের ঢালাও ব্যবস্থা

আছে ডিগলিপুরে। আছে বিদ্যুৎ। ১৯৬৪ সালে শুধু একটিমাত্র প্রাইমারি স্কুল ছিল ডিগলিপুরে। এখন গ্রামে গ্রামে প্রাইমারি স্কুল। ইউনিফর্ম পরা ছেলেমেয়েরা সাইকেল চালিয়ে স্কুলে যায়। সুভাষগ্রামে তৈরি হয়েছে হাইস্কুল। পাবলিক লাইব্রেরি, হাসপাতাল, ডিগলিপুর স্কুল থেকে পাশ করে ছেলেমেয়েরা পোর্টব্লেয়ার কলেজে পড়ে। সেখান থেকে উচ্চশিক্ষার জন্য গেছে কলকাতা, মাদ্রাজ, পণ্ডিচেরী, দিল্লি। তাদের মধ্যে ডাক্তার, উকিল, শিক্ষক হয়ে ফিরে এসেছে অনেকে। তারা কেউ কাজ করছে হাসপাতালে, কেউ প্র্যাকটিস করছে মায়াবন্দর কিংবা পোর্ট ব্লেয়ার কোর্টে। আবার মূল ভূখণ্ড থেকে চাকরি করতে এসে আন্দামানের প্রেমে পড়ে গেছে অনেক মানুষ। এখানেই জমি কিনে সেটল করেছে। তাদের ছেলেমেয়েরা চাকরি করছে প্রশাসনে। কেউ পুলিশে, কেউ ওয়ারলেস স্টেশনে, কেউ কেউ ব্যাঙ্কে। তারাও আন্দামানের মানুষ হয়ে গেছে।

মূল ভূখণ্ডের মানুষ অতশত খোঁজ রাখে না। আন্দামান বলতে তারা বোঝে শুধু পোর্টব্লেয়ার। যারা সঙ্গতিসম্পন্ন তাঁরা বেড়িয়ে যান ছুটিতে। পোর্টব্লেয়ার ও আশেপাশের ছোট খাটো দু-একটা দ্বীপ দেখে মুগ্ধ হন। আন্দামানের সমুদ্রের জল দেখে মনে হয় কে যেন রাশি রাশি নীল গুলে রেখেছে জলে। আর সমুদ্র হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েছে শহরের মধ্যে। যেমন করে বন্যার জল ঢোকে। কাজেই ভগ্ন তটরেখার মধ্যে ঢুকে পড়ে উত্তাল সমুদ্র নিমেষে বন্দি হয়ে গিয়ে যেন হ্রদের আকার ধারণ করে। গভীর, অতলান্ত কিন্তু নিস্তরঙ্গ, আর তার বুকে নিশ্চিন্তে নোঙর বাঁধা শত শত ট্রলার, ফেরিবোট, ছোট জাহাজ, রাতের বেলা ঝিকিমিকি জ্বলে। মনে হয় আকাশের তারারা বুঝি বেড়াতে এল মর্তলোকে।

এই পোর্টব্লেয়ার দেখেই তারা ফিরে যায় এক দারুচিনি দ্বীপের স্বপ্ন বুকে নিয়ে। গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে সমুদ্রের এই মনোহারিণী রূপ আর কোথাও নেই। পোর্টব্লেয়ারের তুলনায় কোভালমকেও মনে হয় অনন্তযৌবনা নারীর পাশে কোনও বিগতযৌবনা নারী। কিন্তু পর্যটকেরা কেউই জানে না. এই উত্তর আন্দামানেই রয়েছে ডিগলিপুর। পোর্টব্লেয়ার থেকে বিকেলে যাত্রীবাহী জাহাজে চড়লে স্টুয়ার্ট আইল্যান্ড, অর্কিড আইল্যান্ড. কারনিউ আইল্যান্ড, স্মিথ ব্রাস আইল্যান্ড, মায়াবন্দর হয়ে ডিগলিপুর। যার আর এক নাম এরিয়াল বে। এ যেন আন্দামানের মাঝে এক চেরাপুঞ্জি, শিলংয়ের মত টিলা আর সমভূমি হাত ধরাধরি করে অগ্রসর হয়েছে। প্যাডক পাহাড়ের সবুজ রেঞ্জ ঢেকে দেয় সমুদ্রকে। আছে পাহাড়ের চূড়া বেয়ে নামা মিষ্টি জলের স্রোতস্বিনী কালপং নদী। আর অসংখ্য সমুদ্রের খাঁড়ি। ঘন ম্যাংগ্রোভের জঙ্গলে ঢাকা যেন আর এক সুন্দরবন।

মূল ভূখণ্ডের মানুষ ভারতের মানচিত্রে ডিগলিপুরের নাম খুঁজে পায়নি কোনও দিনও। ডিগলিপুরের নাম শুনলে বলে, সে আবার কোথায়? কিন্তু মূল ভূখণ্ডের কিছু মানুষ ডিগলিপুরের সন্ধান যারা একবার পেয়েছে তারা এখানে এখনও দলে

দলে ছুটে আসে জীবিকার আশায়। এদের নিয়েই সমস্যা দেখা দিয়েছে। আর সে সমস্যায় প্রাণান্ত হতে হচ্ছে ডিগলিপুর থানার ও. সি. তপন দাসকে।

ডিগলিপুরের সন্ধান পেয়ে এখন রোজই বাইরের মানুষ আসছে। এদের মধ্যে একদল পশ্চিমবঙ্গের বেকার তরুণ। তারা প্রতি জাহাজেই আসছে—নানারকম সওদা নিয়ে। তার মধ্যে অধিকাংশই কাপড়। তবে মনোহারি জিনিসপত্রও আছে। তারা এসে সুভাষবাজারে দোকান খুলে বসছে। দিন পনেরো থাকছে। মালপত্র বিক্রি করে আবার চলে যাচ্ছে ফিরতি জাহাজে। এদের মধ্যে কেউ কেউ সেটল করছে ডিগলিপুরে।

সুভাষবাজারেই এখন তিন চারটে দোকান হয়েছে। যারা প্রথম দিকে আসা উদ্বাস্তু নয়। তারা এসেছে গত সাত আট বছরের মধ্যে। এসেছে ব্যবসা করতে। মানুষের হাতে কাঁচা পয়সা, অথচ সে তুলনায় ভালো দোকানপাট হয়নি তখনও। তারা দোকান খুলে বসেছে। এদেরই একজন নিতাই বিশ্বাস। তার বাড়ি ছিল মছলন্দপুরে। গোবরডাঙা কলেজে পড়ত। কিন্তু আই. এ. পরীক্ষা দেয়নি। তার আগেই একদিন এক ঘটনায় দেশছাড়া হয়েছিল সে। সে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পড়াশোনার জন্য চলে এসেছিল। থাকত দাদা-বউদির সংসারে। দেশে বাবা-মা রয়ে গিয়েছিল। দাদা-বউদির কাছে থেকে সে কলেজে পড়ত। একদিন বউদির একটা গহনা পাওয়া গেল না। বউদি নানাভাবে ইঙ্গিত দিয়ে নিতাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলেছিল, বাড়িতে আর তো কেউ নেই। বাড়ির কেউ না সরালে গহনাটা যাবে কোথায়? ব্যস, মাথা গরম হয়ে উঠেছিল নিতাইয়ের। সে সেই রাত্তিরেই বাড়ি ছেড়েছিল। তারপর কলকাতায়। কলকাতায় এদিকে ওদিকে ঘুরতে ঘুরতে শিপিং কর্পোরেশনের অফিসের সামনে এসে সে থমকে গিয়েছিল। এত ভিড় কেন? শুনেছিল আন্দামানের জাহাজ ছাড়ছে কাল। টিকিটের জন্য ভিড়। সে লাইনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। তারপর ওই জাহাজেই আলাপ হয়েছিল ডিগলিপুরের একজন লোকের সঙ্গে। নাম তার বিমল মণ্ডল। সে ১৯৬৪ সালের কথা। বিমল এসেছিল কলকাতায় তার মেয়েকে লেখাপড়ার জন্য হোস্টেলে রেখে যেতে। তার মেয়ের বয়স কুড়ি বছর। সে পোর্টব্লেয়ার স্কুল থেকে বারো ক্লাস পড়েছিল। পড়াশোনায় ভালো মেয়েটি। ভাল ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছে। তফশিলি সম্প্রদায়ের মেয়ে। তার ওপর আন্দামান সরকারের বৃত্তি রয়েছে। হস্টেল খরচ, টিউশান ফিজ সবই তার মেয়ে ইরা পাবে। শুধু ভরতি করে দেওয়া। এ ব্যাপারে রঞ্জুদার উৎসাহ ছিল বেশি। রঞ্জুদা এখন এম পি.। অধিকাংশ সময় দিল্লি থাকে। কলকাতায় বাসা করে রঞ্জুদা তার বউ ছেলেমেয়েকে রেখেছে। রঞ্জুদার বউ সুতপা বউদি ইরার লোক্যাল গার্জেন হয়েছে।

বিমল নিতাই-কে বলেছিল, আপনি কোথায় যাবেন?

নিতাই বলেছিল, পোর্টব্লেয়ার।

বেড়াতে?

চাকরিবাকরি যদি পাই। তারপর সব খুলে বলেছিল নিতাই।

বিমল বলেছিল, চাকরি করবেন ক্যান। ইয়ংম্যান আপনে। ব্যবসা করেন।

ব্যবসা?

হ্যাঁ। ডিগলিপুর চলেন। আমরা যেহানে থাকি। নাম শোনছেন ডিগলিপুরের?

না। নিতাই ঘাড় নাড়ে। ডিগলিপুরের নাম সে প্রথম শুনল জীবনে।

আপনি কতদিন আছেন ডিগলিপুরে?

এবার বিমল হেসে বলল : আমরা আইল্যান্ডের ফার্স্ট সেটলার! ৫৪ সানে আইছি। তখন আমার বয়স তেরো বৎসর। প্রথম যেদিন জাহাজ থিকা ডিগলিপুরে নামলাম সেদিন তো অনেকে কাইন্দা ফেলাইছিল। এ কোথায় আসলাম। জঙ্গল আর জঙ্গল। তার মধ্যে জোঁক, সাপ। এখন দ্যাখলে চিনতে পারবেন না।

আপনার বাবা-মা আছেন?

বাবা গত সালে মারা গেছেন। মা আছেন।

আপনারও কি ব্যবসা নাকি?

না, আমি প্রাইমারি ইস্কুলের টিচার। জমিজমা দেখি। বাবা যখন ছেলেন তখন দুভাই এক সঙ্গে ছেলাম। এখন আমরা দুভাই আলাদা আলাদা। জমিও ভাগ হয়ে গেছে। শুধু জমির আয়ে আর চলে না।

আপনার ভাই কিছু করেন?

না। লেখাপড়াও তেমন শিখল না। আমাদের সময় ডিগলিপুরে হাইস্কুল ছিল না। রঞ্জুদা মানে সুধীরঞ্জন দাসের নাম শোনছেন, আমাদের এম পি?

নিতাই বলল, প্রায়ই পেপারে দেয়।

হ্যাঁ। উনি তো ইন্দিরা গান্ধির ডান হাত। রঞ্জুদা আমাদের সঙ্গে এক জাহাজে আসে। আমারে ওঁর ছোট ভাই বলতে পারেন। এক সঙ্গে চলাফেরা। তা রঞ্জুদার বকানিতে বাবা আমারে পোর্টব্লেয়ার ইস্কুলে পাঠান। সেখান থিকা ম্যাট্রিক পাশ করে ফিরে আসি। চাকরি পেয়ে গেলাম। আর পড়াশোনায় মন বসল না।

আপনারা কয় ভাই বোন?

দুভাই এক বোন। বোনডা এহানেই জন্মেছে। ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়ে ফেল করল। আর পড়ল না।

বিয়ে হয়েছে?

সে আর বলবেন না। দুঃখের কথা কী কই। এক রাঁচিরে বিয়া করছে।

রাঁচি? একটু অবাক হল নিতাই।

রাঁচি আছে না, বিহারে। সেখানে থেকে দলে দলে লেবর আসে কাজ করতে ডিগলিপুরে। তারা আসে আর ফেরে না। জবরদখল করে খাশ জমিতে বসে পড়ে। তারে আমরা উইদাউট মানুষ বলি। তার মানে জমির কোনও কাগজপত্তর নাই। এই রাঁচিরা অনেক বাঙালি বিয়া করছে। আমার বোনটাও এমন এক রাঁচির পাল্লায়

পড়ে ঘর থেকে বার হয়ে গেছে। বাবা তখন বেঁচে। তিনি কোনও কথা বলেন না। আমি আর কী করব। কালীঘাট লঞ্চঘাটার কাছে থাকে। আমার সঙ্গে সচরাচর দেখাশোনা হয় না।

বিমলের কাছে ডিগলিপুরের কথা শুনে নিতাই আর পোর্টব্লেয়ার যায়নি। মায়াবন্দরে নেমে গিয়েছিল বিমলের সঙ্গে। তারপর মায়াবন্দর থেকে স্টিমার ধরে ডিগলিপুর এসেছিল। সেও দেখতে দেখতে তিনবছর হয়ে গেল। এই তিনবছরে নিতাই-এর ব্যাবসা বেশ জমে উঠেছে। একবছরের মধ্যে সে বিয়ে করেছে এখানে। বউয়ের নাম লক্ষ্মী।

বিমল যাদের উইদাউট মানুষ বলছিল সেই মানুষগুলোর জন্য উদ্বেগের সীমা নেই ও. সি. তাপন দাসের। ডিগলিপুরের গভীর জঙ্গলের মধ্যে ঘর বেঁধে রাতারাতি বসে পড়ছে তারা। এক আধজন নয় অন্তত হাজার দুয়েক পরিবার আছে যারা উইদাউট মানুষ। প্রতিদিনই তাদের সংখ্যা বাড়ছে। সংঘবদ্ধ এই সব মানুষগুলোর ঘরবাড়ি ভেঙে দিতে গেলে বিরাট ফোর্সের দরকার। বুলডোজার কিংবা হাতি দরকার। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট—যাদের জমিতে এরা বসছে তারা কিন্তু নির্বিকার। তবে তপনের এত মাথাব্যথা কীসের? তার মাথাব্যথা এই কারণে যে ডিগলিপুরের স্থিতিশীল জীবনে আলোড়ন তুলছে এই উইদাউট মানুষেরা। ওরা রাস্তা তৈরির জন্য ঠিকাদারের কাজ করে। বর্ডার রোডস-এর হয়ে কাজ করে। সেটলারদের খেত জমিতেও দিনমজুরের কাজ করে। কিছু না করতে পারলেও ওরা জাল নিয়ে খাঁড়িতে মাছ ধরতে নেমে পড়ে। এমন কি বার্মা থেকে যে সব চোরাই ট্রলার আসে চিংড়ি মাছ ধরতে তাদের সঙ্গে যোগসাজশও করে কেউ কেউ। ওদের জন্য ডিগলিপুরে চোলাই মদের হারও বেড়ে যাচ্ছে। ব্যাপকভাবে বাঙালি মেয়েদের বিয়ে করার অভিযোগ আসছে। এক কথায় উইদাউট মানুষরা আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা সৃষ্টি করছে। আগে চুরি হত না ডিগলিপুরে—এখন চুরিও হচ্ছে।

১৯৬৪ সালের ফেব্রুয়ারি। ডিগলিপুর আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য তৈরি হচ্ছে। এপ্রিলে নির্বাচন। কিন্তু এখন থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে তৎপরতা শুরু হয়েছে। আজ রবিবার ইস্কুল ছিল না। বিমল তার ছেলেকে নিয়ে ধানখেতে ঘুরতে গিয়েছিল। তাদের বাড়ির সংলগ্ন জমিটাই এখন বিমল নিজের দখলে রেখেছে। দুক্রোশ দূরে ধানিজমি তার ভাই শ্যামলকে দিয়ে দিয়েছে। দিয়ে দিয়েছে মানে শ্যামল একরকম জোর করেই নিয়ে নিয়েছে। ধানিজমিতেই আলাদা বাড়ি করে আছে শ্যামল। যদিও খাতায় কলমে কোনও জমি হস্তান্তর হয়নি তবু বিমল ওই জমিতে আর যেতে পারে না। দুই ভাইয়ে মুখ দেখাদেখি বন্ধ।

ভবেশের বউ গৌরীর অবশ্য আপত্তি ছিল অত সহজে জমি হস্তান্তর করতে। মৃত্যুর আগে বিমলের বাবা ভবেশ বলেছিল, বাবা বিমল, কীভাবে এই জমিরে

আপন সন্তানের মতো পালছি তা তুই জানস। এই জমিটুকুর জন্য সব থুয়ে এই কালাপানি পার হয়ে আসা। তুমি দেখবা এই জমি যেন হাতছাড়া না হয়। পারলে জমি আরও বাড়াবা। কিন্তু এক ছটাক জমিও বেচবা না। তুমি আমার শিক্ষিত বিচক্ষণ ছেলে। শ্যামলটা তো মানুষের মতো মানুষ হল না। তার হাতে যেন জমি না পড়ে। প্রয়োজনে তারে টাকা দিবা সেও ভালো, কিন্তু জমি নয়।

কিন্তু বাবার নির্দেশ পালন করতে পারেনি বিমল। বাবা চোখ বুজতে না বুজতে শ্যামল জমির ভাগের জন্য ঝগড়াঝাঁটি শুরু করে দিয়েছে। এক বাড়িতেই ছিল ওরা। শ্যামল যত না বলত তার বউ তার চেয়েও বেশি ঝগড়া করত। ভীষণ মুখরা, দজ্জাল প্রকৃতির মেয়ে শ্যামলের বউ রত্না। বিয়ের বছর দুয়েকের মধ্যে তার নিজ মূর্তি বেরিয়ে পড়েছিল। সে বিমলকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলত, মাস্টারি বুদ্ধির প্যাঁচ পয়জার তোমার মতো ক্যাবলা বোঝবে না। বিয়ের আগে খুব যে কয়েছিলে, বাপের সম্পত্তিতে তোমারও আধা আধা ভাগ। এখন তো দেহি তোমার দাদা কানাকড়িও ঠেকায় না। শ্যামল চোলাই খেয়ে টং হয়ে বাড়ি ফিরত। আর মদের ঝোঁকেই বলত : সব শালাকে খুন করব। সবাইকে চেনা আছে আমার। বাবার কানে মন্ত্র পড়ছে। ভাবছে আমারে মুখ্যু পাইয়া ফাঁকি দিবা। সে আমি হতে দেব না।

বিমল একদিন বলেছিল, শ্যামল, ছোটলোকের মতো চিল্লাবি না। ছেলেপুলে বড় হচ্ছে। সম্পত্তির ভাগ চাস? নে। কিন্তু ভদ্রভাবে চলতে হবে। ন্যায্য ভাগ যেটুকু হয় সেটুকু পাবা। রঞ্জুদা এবার আসলে তার সামনেই ভাগ হবে।

শ্যামল চোখ গরম করে বলেছিল : রঞ্জুদা? কিডা রঞ্জুদা? আমাদের মধ্যে বাইরের লোক থাকবে ক্যান?

রঞ্জুদা বাইরের লোক নয়, শ্যামল। তুই জানস, সে আমাদের আপন দাদার মতো। ছোটবেলা থেকে আপদে বিপদে তার কাছেই তো গেছি।

যে যখন গ্যাছো তখন গ্যাছো। আমি তারে মানি না। আমি তার পার্টি করি না। আমি কাস্তে-হাতুড়ি পার্টি করি। এবারে সে দাঁড়াক না আন্দামান থেকে। তার জামানত জব্দ কর্যা ছাড়ব আমি।

এটা আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার শ্যামল। এর লগে রাজনীতির কী সম্পর্ক? তুমি রাজনীতির লোকরে এর মধ্যে টানছ ক্যান?

রাজনীতির লোক হিসাবে টানি নাই। উনি আমার দাদার মতো তাই টানছি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত, পরিস্থিতি এমন আয়ত্তের বাইরে চলে গেল যে বিমল সকালে উঠে আর না বলে পারল না যে ঠিক আছে, তোর যে জমি যতটুকু ইচ্ছা তুই নিয়া নে।

শ্যামল বলেছিল, তাহলে পাহাড়ি জমির পুরোটা চাই।

পাহাড়ি জমি বলতে মাইলখানেকের মধ্যে ২০ বিঘার মতো ধানি জমি।

পাটোয়ারির সঙ্গে খাতির করে রঞ্জুদা তাকে পাহাড়ি জমির নামে সবচেয়ে ভালো জমিটা পাইয়ে দিয়েছিল। একটু উঁচুনিচু হলেও সে জমিতে এখন আর পাথরের চিহ্নমাত্র নেই। দারুণ উর্বরা। ওই জমি থেকে বিঘে প্রতি ২০ মণ করে ধান তুলেছে। সেই জমি চাইছে শ্যামল। এ যেন দেহের অর্ধেক দান করা।

বিমল কী বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু বিমলের বউ এসে বলল, যে জমিই যাক, তুমি নিজা থেকে কিছু করবা না। কাল সকালে কাকাবাবুরে ডেকে মারে ডেকে তাঁদের সামনে যা সাব্যস্ত হয় তাই হবে।

কাকাবাবু অর্থে রমেশ। বিমলদের পাশের বাড়ি। তবে মাঝখানে ধানের জমি পড়ে বলে রাস্তা দিয়ে একটু ঘুরে যেতে হয়। মা অর্থে বিমলের মা।

কিন্তু কারও সঙ্গে পরামর্শ করার আগে শ্যামল রাতে তার বউ-এর সঙ্গে পরামর্শ করল। তারপর কাকভোরে উঠে বউ ও দুটো বাচ্চাকে নিয়ে বাক্স-প্যাঁটরা মাথায় করে বেরিয়ে গেল। বিমল তখন ঘুম থেকে ওঠেনি। ঘুম থেকে উঠে শুনল শ্যামলরা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। ওদের পাওয়া গেল শ্যামলের শ্বশুরবাড়িতে। কিন্তু বিমলের বহু অনুরোধ সত্ত্বেও কেউ ফিরে এল না। ক-দিন পরে সে দেখল তাদের পাহাড়ি জমিতে ঘর তুলছে শ্যামল। ঘর তুলে গোটা জমিটাকেই সে এখন কব্জা করে নিয়েছে।

ডিগলিপুরে খুব বেশি একটা শীত পড়ে না। তবু ফেব্রুয়ারির সকালে বেশ শির শির করা ঠান্ডা বইছিল। বিমলের ছেলের নাম নির্মল। তার প্রথম মেয়ের সঙ্গে এই ছেলের বয়সের তফাত প্রায় বারো বছর। মেয়ে ইরা এখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। সে বি. এ. পাশ করেছে। জুয়োলজিতে অনার্স ছিল। প্রতি বছর গরমের ছুটিতে সে একবার করে আসে।

ছেলে নির্মলের বয়স এখন ১১। ক্লাস সিক্সে পড়ে। কিন্তু ওই বয়স থেকে সে কেমন যেন ছাড়া ছাড়া। বিমল তো ওই বয়সেই ডিগলিপুর এসেছিল। তখন সে যেমন আপন করে নিতে পেরেছিল ডিগলিপুরের প্রকৃতিকে নির্মল যেন প্রকৃতির মাঝে কিছুতেই আত্মস্থ হতে পারেনি। তার মন ভীষণ ভাবে বাইর্মুখী। খেলাধুলা, টি ভি এসবেতেই তার উৎসাহ বেশি। টি. ভি. দেখে দেখে হিন্দি সিনেমার নায়ক-নায়িকাদের নাম, বিজ্ঞাপনের মডেলদের নাম সে রপ্ত করেছে। টি ভি-র বিজ্ঞাপন সে খুব উৎসাহ নিয়ে দেখে। টি ভি-র কল্যাণে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে তার পরিচয় হয়ে গেছে।

বিমল হাতে একটি নিড়ানি নিয়ে বেরিয়েছিল। এবার ধান কাটা হয়ে গেলে সে অড়হর লাগিয়েছে। গাছে অড়হর ফুল ধরেছে। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে পাখিদের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে। গাঙ শালিক, চড়াই, কাঠঠোকরা, বাবুই কত কি পাখি। বিমলের মনে পড়ে ছোটবেলায় কত রকমের পাখি আসত ডিগলিপুরে। এখন সেসব পাখি আর দেখা যায় না। রাহাবাবু বলতেন, বার্মা থেকেও অনেক পাখি নাকি আসত এক এক মরশুমে। বিমলের মনে পড়ল, বাবার সঙ্গে সেও সকালবেলা

মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াত। ভবেশ তো মাঠে নেমেই এক টুকরো মাটি তুলে কপালে ঠেকাত। বিমলকে বলত, মাটি রে মাথা দাও খোকা। এই মাটির টানেই আমরা আইছি এতদূর। এই মাটির টানেই বেঁচে থাকা। এই মাটির বুকেই একদিন শ্যাষ হইয়া যামু। মুসলমানদের গোর দেওয়ার পদ্ধতিটা আমার খুব ভালো লাগে। জীবন্ত বেলায় যে মাটিরে কামড়াইয়া পড়ে থাকি, মৃত্যুর পরে সেই মাটিতেই আমার চিরশয়ান।

বিমলও বাবার দেখাদেখি যখন মাঠে আসে মাটি মাথায় ঠেকায়। কিন্তু এই মাটি তার হাত থেকে নিয়ে নিল তার ভাই শ্যামল। অথচ শ্যামলকে যতদূর জানে, এই জমিতে সে ফসল ফলাবে না। হয়তো আর একজন কাউকে লিজ দেবে।

অড়হর খেতের মধ্য দিয়ে পায়ে চলা পথ। শিশির ভেজা মাটির ওপর দিয়ে খালি পায়ে চলছিল ওরা। পায়ের তলায় হিমশীতল মাটির স্পর্শ। পা শিরশির করে ওঠে। ওদের সঙ্গে সঙ্গে উড়ে চলেছে এক প্রজাপতি। বিমল সামনে একটা গাছ দেখিয়ে ছেলেকে বলল : ওটা কী গাছ কও তো? নির্মলের ভাষায় বরিশালের টান খুব বেশি নেই। ডিগলিপুরে যেসব ছেলেমেয়ে স্কুলে পড়ে তারা পশ্চিবঙ্গের ভাষা বলারই চেষ্টা করে। যে ভাষা তারা ক্রমাগত রেডিয়োতে শুনেছে। স্কুলের অর্ধেকের বেশি শিক্ষকই মেইনল্যান্ড থেকে আসা। তারাও পূর্ববঙ্গের লোক। কিন্তু পশ্চিবঙ্গে বেশ কিছুকাল সেটল করার পর তারা এসেছে। অনেকের জন্ম পশ্চিমবঙ্গে। এছাড়াও ডিগলিপুরে পূর্ব পাকিস্তানের সব জেলার লোকই কিছু কিছু আসায় সব জেলার ডায়ালেক্ট নিয়ে একটি খিচুড়ি ডায়ালেক্ট তৈরি হয়েছে। নির্মল উত্তর দিল : শাল।

উঁহু হল না। জারুল গাছ। তোমারে আগে কতবার কয়ে দিছি। এই দ্যাখো জংলি কাঠাল। ওইটা চুই। জানো, এই সব গাছে ভর্তি ছিল ডিগলিপুর। কত যে সাপ আর কুমির ছেল।

চলতে চলতে নির্মল জিজ্ঞাসা করল, বাবা, কাকা চলে গেল কেন?

বিমল কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না। ছোটো ভাইকে সে এতখানি বয়স পর্যন্ত আগলে আগলে রেখেছিল। কিন্তু সামান্য জমির লোভে সে যে বাড়ি থেকে এভাবে বেরিয়ে যাবে বুঝতে পারেনি। বিমলকে চুপ করে থাকতে দেখে নির্মল বলল, বাপি আজ দুদিন ইস্কুলে আসছে না। ওর ক্লাসের একটা ছেলে বলল, ওদের নাকি বাড়িতে খাবার নেই। তাই ইস্কুলে আসেনি।

বিমলের মনে হল কে যেন সপাং করে তাকে চাবুক মারল। বাপি মানে শ্যামলের ছেলে। একটাই ছেলে শ্যামলের। ক্লাস থ্রি-তে পড়ে। বিমলের ছেলে নির্মলের সঙ্গে শ্যামলের ছেলে বাপির খুব ভাব ছিল। কাকারা হঠাৎ চলে যাওয়ায় নির্মল মনে মনে আঘাত পেয়েছে।

বিমল বলল, তোর কাকা নিজেই চলে গেল। আমি তো তারে তাড়াই নাই।

নির্মল বলল, বাবা, চলো না একবার কাকাদের বাড়ি যাই। গিয়া দেখি না ওরা

ফেরত আসে কিনা।

বিমল যেন একটা ছুতো খুঁজছিল। সে এক পায়ে খাড়া। বলল, হ্যাঁ তাই চল। তবে তোর মারে জানাস না।

বিমল ছেলেকে নিয়ে ফিরে চলল তার বাড়িতে। এই ভোরবেলা বিমলের মা উঠে উঠোন ঝাঁট দিতে লেগেছে। প্রায় পঁয়ষট্টি বছর বয়স হতে চলল গৌরীর। এমন কিছু বয়স নয়। কিন্তু তার স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে গেছে। খুব রোগা হয়ে গেছে। চুলও পেকে গেছে। বুকের মধ্যে সব সময় ধড়ফড়ানি অনুভব করে। ভবেশ অনেক চিকিৎসা করিয়েছে। হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে দেখিয়েছিল। কেরলপুরমের ছেলে ডা. সদাশিবম্ তাকে দেখেন। তখন কেরলপুরমে চারজন ছেলে ডাক্তার হয়েছে। ডা. সদাশিবমের বাবা নরায়ণমের সঙ্গে বিমলের বাবা ভবেশের বন্ধুত্ব ছিল। সে বন্ধুত্ব ভবেশের মৃত্যু পর্যন্ত অটুট ছিল। সদাশিবম ডাক্তার হবার পর ভবেশ তো আনন্দে ওদের গোটা পরিবারকে নেমন্তন্ন করেছিল। সেই অনুষ্ঠানে শ্যামলের বউ বাংলা গান শুনিয়েছিল ওদের। আশ্চর্য, ওই লক্ষ্মীমন্ত মেয়ের পরবর্তীকালে এই দশা হতে পারে তা কোনোদিন ভাবেনি বিমল। বাবা যতদিন বেঁচেছিলেন পরিবারটাকে ধরে রেখেছিলেন। মায়ের শরীরটাও যেন বাবার মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করছিল। বাবার মৃত্যুর পর কেমন যেন শুকিয়ে যেতে লাগল গৌরী। সদাশিবম বলেছিল, অনেকের মধ্যে বার্ধক্য নানা কারণে এগিয়ে আসে। গৌরী এখন চুপচাপ হয়ে গেছে। তবে বাড়ির কাজকর্ম করে। শুয়ে বসে কাটায় না। বরং বিমলের বউ নিশি একটু সুখী মানুষ। সে দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে। তারপর তার মেজাজটিও বেশ কড়া। বিমলকে উঠতে বসতে খিটখিট করে। এই এটা করলে না কেন? ওটা করলে কেন? টেবিলের ওপর হারিকেন রাখতে গিয়ে যদি একটু শব্দ হয় সে বেশ ঝাঁঝালো গলায় বলে ওঠে : আস্তে, আস্তে। নিশি কখনও বিমলকে সমীহ করে কথা বলে না। লেখাপড়া জানে। ডিগলিপুর হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেছিল। তাছাড়া তার গায়ের রঙও একটু ফরসার দিকে—যা নমশূদ্র সমাজে সচরাচর দেখা যায় না। সেজন্য গর্বে মাটিতে পা পড়ে না। তাছাড়া তার বাবা কুঞ্জবিহারী এখন ডিগলিপুরের গণ্যমান্য মানুষ। সে পঞ্চায়েত প্রধান। রঞ্জুই তাকে পঞ্চায়েত প্রধান করেছিল এক সময়। কুঞ্জবিহারীর বাজারে আলুর গুদাম। এখন কাঠের ব্যবসায়ে সে অনেক টাকা করেছে। বনবিভাগের কাছ থেকে ঠিকা নিয়ে সে কাঠ কেটে বিক্রি করে জ্বালানির জন্য। ডিগলিপুরে কয়েক বছর হল গ্যাস এসেছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ কাঠের জ্বালানিই ব্যবহার করে। দুর্জনেরা বলে কাঠের চোরাই চালান চক্রের সঙ্গে জড়িত আছে কুঞ্জবিহারী দাস।

কুঞ্জ দাসের মেয়ে নিশি বিমলের দু ক্লাস নীচে পড়ত। স্কুলে পড়তে পড়তেই আলাপ। মেয়েটিকে ভালো লাগত তার। তার বিয়ের কথা যখন উঠল তখন বিমল রঞ্জুদাকেই বলেছিল। রঞ্জু তখন খুবই ব্যস্ত মানুষ। এম পি বলে কথা। ডিগলিপুর

এলে গেস্টহাউসে ওঠে। বড়জোর তিন-চারদিন থাকে। সকাল থেকে গিজগিজ করছে লোক। তাঁকে একা পাওয়াই যায় না। অনেক রাতে একটু ফুরসত পেয়ে বিমল বলেছিল, রঞ্জুদা, বাড়ি থেকে তো বিয়ের জন্য চাপ আসছে।

রঞ্জু বলেছিল, তোর কত বয়স হল বিমল?

আমার? পঁচিশ।

তোর পঁচিশ বছর বয়স হয়ে গেল দেখতে দেখতে। এই তো সেদিন আমরা এলাম। তোর তখন বারো বছর বয়স। জলের মতো সময় কেটে যাচ্ছে।

তুমিও তো কত বড় হয়ে গেছ রঞ্জুদা। মেনল্যান্ডে গিয়া আইন পাশ দেছ। তারপর এম পি দাঁড়াইছ। এখন তুমি এম পি। এরপর মন্ত্রী হবা।

রঞ্জু হেসে বলল, মন্ত্রী আমি হতে চাইনে বিমল। মিসেস গান্ধি বলেন, আমারে তিনি সংগঠনের কাজে চান। মন্ত্রী করে ঠান্ডা ঘরে ফেলে রাখতে চান না। যাক সেকথা। তুই কিছু বলবি মনে হয়।

হ্যাঁ। ওই বিয়ার কথা—

বিয়ে? ঠিক হয়ে গেছে নাকি? কবে?

বিমল সলজ্জভাবে হেসে বলেছিল, তুমি যদি একটু চেষ্টা করো তাহলে হয়ে যায় রঞ্জুদা।

আমি কী চেষ্টা করব?

তুমি যদি কুঞ্জ জ্যাঠাকে একটু বলো—

কুঞ্জকে আমি কী বলব—তারপর হঠাৎ রঞ্জুর মনে পড়ে গিয়েছিল কুঞ্জর মেয়ে নিশির কথা। তারপর বলেছিল—ও নিশির সঙ্গে তোর বুঝি তলে তলে?

বিমল বলেছিল, ধ্যাৎ কী যে কও। ওসব কিছু না। নিশিরে আমার ভালো লাগে। আমাদের স্বজাতি। কুঞ্জ জ্যাঠা তোমার কথা শোনে। তুমি বললে হয়ে যায়।

তোর বাবাকে বলেছিস?

নাঃ। বাবা যাবে কুঞ্জ জ্যাঠার কাছে? তাহলেই হয়েছে। বাবা বলে কুঞ্জ জ্যাঠা হল পঞ্চায়েতের লিডার। এত টাকার মালিক। বড়লোকদের থেকে দূরে দূরে থাকাই ভালো। হতে পারে কুঞ্জ জ্যাঠারা বড়লোক। পাত্র হিসেবে আমিও বা কি ফ্যালনা। ম্যাট্রিক পাশ। চাকরি করি। দেড় হাজার টাকা বেতন পাই। জমি জমা আছে। তারপর আমার ল্যাখালেখির বাতিক আছে। পদ্য টদ্য লিখি—

এটা কিন্তু সত্যিই জানতাম না। তুই পদ্য আবার কবে থেকে লিখতে শুরু করলি?

বছর দুয়েক। কোথাও পাঠাই না। খাতায় লিখে রাখি। একদিন তোমারে শোনাব।

আমাকে নয়। তোর নিশিকে শোনাস।

ধুত। তুমি যদি শোনতে চাও, শোনাতে পারি। তা আমার কী করবা কও। ও রঞ্জুদা—

এমন সময় দু-তিনজন লোক হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ায় আর কথা এগোতে পারল না।

তবে রঞ্জুদা কথা রেখেছিল। সেই রাত্তিরেই ডেকে পাঠিয়েছিল কুঞ্জবিহারীকে। পরদিন ভবেশ আর কুঞ্জবিহারী দুজনে মিলে বিয়ে পাকা করেছিল। বিয়ের পর নতুন বউ নিশি বলেছিল, তোমার তো সাহস কম নয়। তুমি আমারে এক কথায় বিয়া করা ফেললে। আমার মতামত নাই বুঝি কিছু?

বিমল নতুন বউ নিশির দিকে চেয়েছিল। এতদিন ফ্রক পরা দেখেছে তাকে। আজ শাড়ি পরে হঠাৎ যৌবনবতি দেখাচ্ছে তাকে। বয়সের তুলনায় নিশির শরীর একটু স্বাস্থ্যবতীর দিকে। তাতে তাকে বেশ বড়সড় দেখায়। মনে হচ্ছে যেন পাকা গিন্নি।

বিমল বলল : খুব যে কথা দেখছি মুখে। কেন আমাদের তোমার পছন্দ নয় বুঝি?

আমার জন্য মেনল্যান্ডে পাত্র ঠিক করে রাখছিল আমার বাবা। বেহালার ছেলে। বি.এ. পাশ। রঞ্জুকাকা আইস্যা এমন জোর জবরদস্তি করল যে বাবা আর কী করবে। আসলে রঞ্জুদা বাবার পার্টির নেতা। রঞ্জুদা উঠতে বললে উঠবে, বসতে বললে বসবে।

বিমল প্রথমটা ভেবেছিল নিশি ঠাট্টা করছে। কিন্তু তার মুখ দেখে মন হল না এটা ঠাট্টা। বরং বিমল যখন তার মুখ নতুন বউয়ের মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে চুমু খেতে গেল তখন মুখটাকে প্রবল হাত দিয়ে সরিয়ে দিল নিশি। সেই মুহূর্তে সে ভাবছিল ময়নার কথা। পাকিস্তান থেকে চলে আসার সময় খুলনা থেকে শিয়ালদা পর্যন্ত যে মেয়েটির সঙ্গে এসেছিল। দুজনে কত ছোট ছিল তখন। কিন্তু সেদিন ময়নার জন্য তার মনটা হু হু করে উঠেছিল, তখন কেন কিসের জন্য এই মানসিক যন্ত্রণা তা সে বুঝতে পারেনি। কিন্তু এখন সে বুঝতে পারে। তার নামই ভালবাসা। এই ভালোবাসার কোনও বয়স নেই। শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য সমস্ত বয়সেই ভালবেসে যেতে পারে মানুষ। কুঁড়ির মধ্যেও তো পরিপূর্ণ ফুলের সমস্ত ধর্ম লুকনো থাকে। শুধু কুঁড়ি বুঝতে পারে না আপন হৃদয়ের মধ্যে ভবিষ্যতের কোন পুষ্প-শোভিত মহীরুহকে সে বহন করে চলেছে।

ময়নাকে সে কখনও ভুলতে পারেনি। কিন্তু সে এতদিন মিথ্যাই ভেবে এসেছিল, একটি ভালোবাসা নারীকে অন্য যে কোনও নারী দিয়ে ভুলে থাকা যায়। কিন্তু এখানে যেন তার বিধিলিপি এক অদৃশ্য ইঙ্গিতে তাকে ভুলে থাকতে দেবে না ঠিক করেছিল। তা নাইলে জীবনে এই পরম লগনের সময় তার কেন মনে পড়বে ময়নাকে?

বিমল নিশিকে ভালোবাসার চেষ্টা করেছিল। তার কর্তব্যবোধ ও ভালোবাসার টানে নিশি ভেসে গিয়েছিল। কিন্তু ভালোবাসা যে শুধু নেবার জিনিস নয়, তা ফিরিয়ে

দেবারও জিনিস—এই জীবনবোধ নিশির মধ্যে ছিল না। সে এক প্রবল অহমিকা ও কর্তৃত্বপ্রিয়তার আবরণে নিজেকে ঢেকে রেখে দিয়েছে। তার মধ্য থেকে তার ভেতরের চিন্তন নারী মাঝে মাঝে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য। ভোরের আলো ফুটবার সঙ্গে সঙ্গে রাতের সুখস্বপ্ন যেমন মিলিয়ে যায় তেমনি মিলিয়ে গেছে।

গৌরী বিমলকে দেখে বলল : চা করবো নাকি? তোর তো স্কুল নাই আজ। একটু পরে যদি খাস। আমি ছাগলডার লগে দুটো পাতা লয়ে আসি।

বিমল বলল : মা তোমাকে কইছিনা, বেশি হাঁটাচলা করবানা। পাতা আনতে যাবা কোথায়? সেতো ওই রাস্তার ওপারে। এই সময় সকালের বাস আসে। ভাল করে চক্ষে দ্যাখোনা, মরবে চাপা পড়ে। তুমি ব্যস্ত হয়ো না। ঘরে গিয়ে লুঙ্গিটা পাল্টে এল বিমল। পাজামা আর পাঞ্জাবি পরে নিয়েছে। নির্মলও প্যান্ট শার্ট পরে নিয়েছে।

অঃ বিমল যাও কই? গৌরী জিজ্ঞাসা করল। চা খাবা না?

একটু ঘুরে আসি। আধাঘন্টার মধ্যে আসছি।

নির্মলডারে কোথায় নে যাও? ও বাপ, একটা সোয়েটার পরে নাও গে। ঠান্ডা লাগবেনে। নির্মলের সোয়েটার পরার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু গৌরীর কথা মান্য করার জন্য বিমলই বলল, যাও ঝটপট পরে এসো।

নির্মল এসে বলল : বাবা সাইকেল নেবানা?

না। আধক্রোশ পথ হাঁটতে পারব না? সাইকেল বার করলে তোমার মায়ের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটবে।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা এসে পৌঁছল ওদের পাহাড়ি জমির সামনে। এবারও এ জমিতে প্রচুর ধান ফলেছে। তবে রবি লাগানো হয়নি। বিমল হিসেব করে দেখেছে এই কাঁকুরে জমিতে লাঙল লাগাতে যা খরচ তাতে রবি তুলে খুব বেশি লাভ হয় না। গতবছর কপি আর টম্যাটো করেছিল। বাজারে খুব একটা দাম পায়নি। শেষ পর্যন্ত ফসল বিলিয়ে দিতে হয়েছে। জমির কাছে গিয়ে অবাক হয়ে গেল বিমল। নারকেল গাছের পাতা আর বাঁশ দিয়ে ওই জমির ধারে বাড়ি তুলে ফেলেছে শ্যামল। চাটাই-এর বেড়া দেওয়া দেওয়াল। কিন্তু এই সাত সকালে তিন চারজন লোকের সঙ্গে কথা বলছে শ্যামল। লোকগুলিকে সবাই চেনে। এদের একজন সীতানাথ। সীতানাথের বয়স প্রায় সত্তর। পাকানো চেহারা। কিন্তু মাথার চুল তখনও পাকেনি। সে এখন সি পি আই (এম) দলে যোগ দিয়েছে। ডিগলিপুরে সি পি আই (এম)-এর সংগঠন ক্রমশ মজবুত হচ্ছে। কেরালাপুরমে বেশ কিছু তরুণ এই দলে যোগ দিয়েছে। হাত-পা নেড়ে শ্যামলকে কী বোঝাচ্ছিল সীতানাথ। বিমলকে দেখে কথা থামিয়ে বলল : তাহলে ওই কথা থাকলে শ্যামল। রাতের বেলা পার্টি অফিসে যেও।

শ্যামল কি তাহলে সি পি আই (এম)-এ যোগ দিয়েছে। রঞ্জুর এক নম্বর চেলা হলেও বিমল কখনও সক্রিয় রাজনীতি করেনি। শ্যামলও তো কোনও রাজনীতিতে ছিল না। এখন বুঝতে পেরেছে বিমল। শ্যামল ভেতরে ভেতরে এত শক্তি সঞ্চয়

করেছে কোথা থেকে। সীতানাথ তার দলবল নিয়ে চলে গেল।

এবার দাদাকে দেখে অবাক হয়ে গেল শ্যামল। প্রথমটা কী কথা বলবে ভেবে পেল না। তারপর বলল, দাদা তুমি?

শ্যামলের বউ বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে। এসে একটা পিঁড়ি দিয়ে গেছে। বলেছে, চা খাবেন?

না-না বউমা, এহনই চলে যাব। তোমরা কেমন আছ দ্যাখতে আলাম। বাচ্চারা কই?

শ্যামল বলল : ঘুমায়। এই বাচ্চাদের ডাকো তো।

বিমল বলল : না-না থাক। আসলে নির্মল ওদের কথা কইছিল। এক সঙ্গে মানুষ হইছে ছোটকাল থেকে—কী যে হয়ে গেল সব। শ্যামল, তুই জমি চাস, আমারে বললেই পারতি। আমি আমার অংশ কওলা করে দেতাম।

শ্যামল বলল : ওকথা থাক দাদা। যা হবার তা হয়ে গেছে। তুমি তো মাস্টারি করো। নিজের হাতে জমি চাষ করো না। আমি কিন্তু নিজে হাতে চাষ করি। লাঙল দেই। জমি তাই আমার মতো মানষের। যারা নিজের হাতে চাষ করে। উইদাউট মানুষগুলোর কথা ভাবো তো একবার?

তাগোর নিজের জমি নাই। পরের জমিতে মজুর খেটে খায়। আমাদের আন্দোলন এই সব ভূমিহীনরা যাতে জমি পায়।

এত জমি ডিগলিপুরে কোথায়? সবারে জমি দিবি। কত মানুষ এমন উইদাউট আসছে জানো?

আমাদের বাবাও উইদাউট আসছিল। জমির মালিকানা হাতে করিয়া আসে নাই। এহানে এসে জমি পেয়েছে। তেমনি রাঁচিরাও জমির সন্ধানে আসছে। তারাও মানুষ। যা জমি আছে তার মালিকানা নতুনভাবে ঠিক হওয়া দরকার। স্বীকার করি, আমাদের বাপ কাকারা বহু কষ্ট করে জমি ডেভলপ করছে। ফসল ফলাইছে। কিন্তু তাদের ছেলেরা কি সেই কষ্ট করে? তারা তো অনেকেই জমিদার বনে গেছে। তারা মজুর খাটায়। অন্যের শ্রমে খায়। এসব চলবে না। ডিগলিপুর আর সে ডিগলিপুর নাই যে রঞ্জুদার কথায় ওঠবে বসবে। রঞ্জুদারে আমরা শ্রদ্ধা করি। তার মতো মানুষ হয় না। কিন্তু তিনি কি আর ডিগলিপুরে আসেন? ন-মাসে ছ-মাসে—

তোর কথা মোটেই ঠিক নয়। বছরে অন্তত তিন-চার বার আসে রঞ্জুদা। সে এখন দিল্লিতে আমাগোর প্রতিনিধি এটা বোঝো না ক্যান? ডিগলিপুরে বইয়া আলু ব্যাচলে তার চলবে? একটা মানষের মতো কথা কও।

শ্যামল বলে চলে, কিন্তু তার সাঙ্গোপাঙ্গগুলো কী রকম? সবাই তাদের চরিত্র জানে। কী আর কব দাদা। থুথু ওপরে ছুঁড়লে নিজের গায়ে এসে পড়ে। তোমার শ্বশুর—পঞ্চায়েত প্রধান, কুঞ্জ দাসের মতো লোকরে সারা ডিগলিপুর চেনে। চুরি, রাহাজানি, রাণ্ডিবাজি—কিনা করে সে।

বিমল হঠাৎ চিৎকার করে ইংরাজিতে বলে উঠল : স্টপ ইট। তুমি উৎসন্নে গ্যাছ শ্যামল। আপন-পর জ্ঞান নাই।

কোনও দুর্নীতিপরায়ণ লোক আমার আপনজন হতে পারে না। এবারের পঞ্চায়েত ইলেকশনে দ্যাখা যাবে রঞ্জুদা আর কতদিন কুঞ্জ দাসেরে ঠেকো দিয়া রাখতে পারে।

কী বলতে এসেছিল, কী হয়ে গেল। নির্মলও অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

শ্যামলের কথা গায়ে মাখল না বিমল। সে তৈরি হয়েই ছিল। পকেট থেকে গুনে গুনে দশ টাকার কুড়িটা নোট বার করল। তারপর টাকাটা শ্যামলের হাতে তুলে দেবার ভঙ্গিতে বলল : তোর হয়তো কিছু লাগতে পারে। যদি এমনিতে কিছু মনে করো তাহলে না হয় ধার বলে রাখো টাকা কটা।

শ্যামলের মুখে মুহূর্তে ভাবান্তর দেখা দিল। সে বলল : টাকা দিয়া আমার মুখ বন্ধ করতে পারবা না দাদা। কুঞ্জ দাসের জাল-জুয়াচুরি আমি জানি। তোমারে সাতসকালে পাঠাইছে সেডা কি আমি জানি না। টাকা তুমি নিয়া যাও দাদা। এ বড় কঠিন ঠাঁই।

একটা আহত পাখির মতো তাড়াতাড়ি ওখান থেকে ছটফট করতে করতে সরে এল বিমল। নির্মলের মুখেও কথা নেই। ওরা হাঁটছিল রাস্তা ধরে। অনেকক্ষণ পরে নির্মলই কথা বলল : বাবা, কাকা আর কি আসবে না?

বিমল বলল : না। না আসে, না আসবে। আমার কাজ আমি করছি। তেনার কাজ তিনি করবেন।

বিমলের কথা শেষ হতে না হতেই দেখা গেল অনেক দূর থেকে একটি জিপ আসছে। পুলিশের জিপ। একটু পরেই জিপটা সামনে এসে পড়ল। জিপ থেকে নামল ও. সি. তপন দাস। বিমলের সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেছে তপন দাসের। ছেলেটি বিমলের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। লম্বা। শক্ত পেটানো চেহারা। তপন কিন্তু উদ্বাস্তু নয়। যদিও তাদের বাড়ি একদা ছিল পূর্ববঙ্গে। কিন্তু তপনের বাবা আন্দামানে চাকরি নিয়ে ডেপুটি ডাইরেক্টর হয়ে রিটায়ার করেন। কিন্তু বাবা রিটায়ার করে মেনল্যান্ডে চলে গেছেন। বেহালার কাছে জমি কিনে বাড়িও করেছেন। দুই মেয়ের বিয়ে হয়েছে মেনল্যান্ডে। কিন্তু একমাত্র ছেলে তপন আন্দামান পুলিশে চাকরি নিয়ে আন্দামানেই রয়ে গেছে। তপন এর আগে মায়াবন্দর থানার ও. সি. ছিল। সেই সময় থেকেই বিমলের সঙ্গে আলাপ। মায়াবন্দর মহকুমা শহর। বিমলকে প্রায়ই যেতে হয়। সে আবার প্রাইমারি স্কুল অ্যাসোসিয়েশনের সহ সভাপতি। অ্যাসোসিয়েশনের অফিস মায়াবন্দরে। তপন ডিগলিপুরে পোস্টেড হয়ে খুব খাটছে। তার বউ স্টেট ব্যাংকে চাকরি করে। মায়াবন্দরে পোস্টেড। সেজন্য বেচারার মন প্রাণ মায়াবন্দরে পড়ে আছে। প্রায় প্রতি রবিবারেই মায়াবন্দরে ছোটে। ডিগলিপুর থেকে মায়াবন্দরের জাহাজ সপ্তাহে মাত্র একদিন আসে যায়। তাও অনিয়মিত। কিন্তু অনেকেই কালীঘাট থেকে মায়াবন্দরের লঞ্চ ধরে। দিনে একবার করে লঞ্চ আসে।

খাঁড়ির মধ্য দিয়ে লঞ্চ গিয়ে সমুদ্রের মধ্যে পড়ে। প্রায় চার পাঁচ ঘণ্টার জার্নি। কিন্তু এইভাবে যাওয়া ছাড়া তাড়াতাড়ি মায়াবন্দর পৌঁছোনো সম্ভব নয়। শনিবার বিকেলের লঞ্চে গিয়ে সোমবার সকালের লঞ্চে ফিরে আসে তপন। বিমলকে দেখে তপন বলল : আপনি এখানে?

বিমল বলল : আমি আসছিলাম শ্যামলের কাছে! শোনছ বোধহয় সে আলাদা হয়ে গ্যাছে গিয়া—

শুনেছি। আপনার ভাই কিন্তু পার্টিতে যোগ দিয়েছে বিমলদা।

তাইতো মনে হয়। আমার শ্বশুরেরে হঠাতে চায়। ওরে আগে তোরা তার নখের যুগ্যি হ।

তপন বলল · কুঞ্জবাবুর কিন্তু বড্ড বদনাম ছড়াচ্ছে বিমলদা। হাজার হোক, আপনি তার জামাই। আপনি মানী লোক। মাস্টার মানুষ। তাঁর গায়ে কাদা ছিটলে আপনার গায়েও তো কিছুটা এসে পড়তে পারে।

বিমল বলল : মানছি, শ্বশুরমশাই রগচটা মানুষ। কিন্তু তিনি তো মানষের উপকার ছাড়া ক্ষতি করেন না। ঘরশত্রু বিভীষণ হওয়ার কি কিছু দরকার আছিল।

তপন বলল : না আমি সে কথা বলছি না বিমলদা। কিন্তু আপনাকে বলি কথাটা। আর কাউকে বলবেন না বলুন।

না-না, আর বলুম কারে?

কুঞ্জ দাস মশাই-এর বিরুদ্ধে মদচোলাই-এর ব্যবসা করার অভিযোগ আসছে।

তুমি তো জানো—এসব শ্বশুরবাড়ির শত্রুপক্ষের রটনা।

এবার তপনের মুখ কঠিন হয়ে গেল। তার হাতের পেশির শিরাগুলো ফুটে উঠল। সে বলল—আমি ভালো করে কোনও খবর না নিয়ে অভিযোগ করি না। খবর পেয়ে আজ রমেন হালদারের বাড়ি গিয়েছিলাম। রমেন ওই চোলাই-এর মধ্যে আছে। ওর পিছনে আছে আপনার শ্বশুর কুঞ্জ দাস। রমেন অস্বীকার করতে পারেনি। আমি ওকে ওয়ার্নিং দিয়ে এসেছি। এই চোলাই কীভাবে ডিগলিপুরের মানুষের ক্ষতি করছে বলুন তো। কী শান্তির জায়গা ছিল ডিগলিপুর। এখন বাইরের লোকরা যত আসছে মেনল্যান্ডের পাপও তো এগিয়ে আসছে। কোনদিন ড্রাগও হয়তো এসে দেখা দেবে।

এ তুমি কও কী? বিমল যেন আর্তনাদ করে উঠল।

তপন বলল, যা বলছি ঠিক বলছি। আমি পুলিশের কথা তুলছি না। কিন্তু লোকজনের মুখ চাপা দেবেন কী করে? কুঞ্জবাবুকে আপনি একটু বলুন যে পঞ্চায়েত ইলেকশনে তিনি যাতে নমিনেশন না পান তার জন্য তাঁর দলেরই একটা গ্রুপ কাজ করছে।

আমার পক্ষে বলার অনেক অসুবিধা আছে। তুমি রঞ্জুদারে একবার বলো না।

আমি পোর্টব্লেয়ার গেলে বলতে পারতাম। রঞ্জুদা তো পঞ্চায়েত ইলেকশনের আগে ডিগলিপুর আসবেন না। আমি বলব কী করে.

তাহলে আপনি যা ভাল বোঝেন, তাই করেন।

নতুন এস পি এসে অ্যান্টি ক্রাইম ড্রাইভের ওপর খুব জোর দিচ্ছেন। আন্দামানে কোনও ক্রাইম হত না। এই ডিগলিপুরের কথাই ধরুন না কেন। আমি তো আর আগে কোনওদিন আসিনি। তবে মায়াবন্দরেও যখন ছিলাম, তখনও পর্যন্ত ডিগলিপুরের ও. সি. বলত খুব আরামের চাকরি ডিগলিপুরে। কোনও ক্রাইম নেই।

আমরাও দেখছি। চুরিচামারি-খুনজখম কিছুই ছেল না এখানে।

কিন্তু এখন। আমি এসেছি মাত্র একবছর। পনেরোটা পঞ্চায়েত ডিগলিপুরে। এর মধ্যে দশটা পঞ্চায়েতেই চোলাই তৈরি হচ্ছে। রাঁচিদের জন্যই এই ব্যাবসা ফুলে ফেঁপে উঠছে। দশটা সুইসাইড হয়ে গেছে এক বছরে। রাঁচিদের মধ্যে মারামারি লেগেই আছে। গত আটমাসে চল্লিশটা চুরি হয়েছে। পুলিশ বলতে তো সবসুদ্ধ জন বিশেক লোক আছি আমরা। পঞ্চায়েত ইলেকশন বলে কিছু রিজার্ভ ফোর্স আসবে। কিন্তু তাদের নিয়ে আবার নতুন সমসা। অত লোককে রাখব কোথায়? খাওয়াব কী? এস পি সাহেব নেক্সট জাহাজে আসছেন। ডি এস পি সাহেবও আসছেন। ডি এস পি ইলেকশন পর্যন্ত থাকবেন। এই সময়টা যদি চোলাই বন্ধ না থাকে তাহলে হয়তো আমাকে অ্যারেস্ট করতে হতে পারে। আপনার সঙ্গে যখন দেখা হল তখন আগেই বলে রাখলাম কথাটা। আমার চাকরিটা তো বাঁচাতে হবে। আচ্ছা আসি বিমলদা—গর্জন তুলে মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল জিপটা।

আজ সকালটা খারাপ গেল বিমলের। একের পর এক অপমান। ডিগলিপুরে তার নিজস্ব পরিচিতি আছে। সে শিক্ষক অ্যাসোসিয়েশন করে। সভাসমিতিতে দাঁড়িয়ে দু-চার কথা বলতে পারে। ডিগলিপুর লাইব্রেরির এগজিকিউটিভ কমিটিতে সে আছে। সে অনেক বই পড়েছে। দেশ পত্রিকা বাড়িতে রাখে। মোটামুটি প্রগতিশীল চিন্তাধারার মানুষ বলে তার পরিচিতি আছে। কিন্তু কুঞ্জ দাসের মেয়েকে বিয়ে করেছে বলে তাকেও কুঞ্জ দাসের বদনামের ভাগী হতে হয়। লোকে তাকে কুঞ্জ দাসের সঙ্গে ব্র্যাকেট করে ফেলে। কুঞ্জ দাস এখন রঞ্জুর ডানহাত। লোকে কুঞ্জ দাস, বিমল দাস—রঞ্জুর অশুভ যোগসাজশ নিয়ে কথাবার্তা বলে। এসবই কানে আসে বিমলের। কিন্তু বিমল জানে যে সে ভেতরে ভেতরে কতখানি খাঁটি। বিয়ের পর শ্বশুর কুঞ্জ দাস চেয়েছিল জামাই তার ব্যবসা দেখুক। কাঠের ব্যবসা, রাস্তার ঠিকাদারি থেকে আরও কয়েকটি মালের ডিলারশিপ আছে কুঞ্জ দাসের। দুই শালা ব্যবসা দেখে। শালারাও লোচ্চা। বেশি লেখাপড়া শেখেনি। বিমল বার বার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। এ নিয়ে নিশির সঙ্গে তার বহুবার মতান্তর হয়েছে। নিশি মনে করে তার বাবার এত টাকা, দাদারা সে টাকায় নবাবি করছে আর বিমল সুযোগ পেয়েও নিজের অবস্থা ফেরাবার চেষ্টা করছে না। শ্বশুরের পয়সা আজকাল সব জামাই-ই নিয়ে থাকে। সে একটি বাংলা সিনেমায় দেখেছিল, একজন নামকরা ইঞ্জিনিয়ার বড়লোকের একমাত্র মেয়েকে বিয়ে করেছিল। বিয়ে নিয়ে মেয়ের বাবার আপত্তি ছিল। কিন্তু

বাড়ি থেকে পালিয়ে তারা বিয়ে করে। কিন্তু সেই শ্বশুরই আবার জামাইকে চাকরি ছাড়িয়ে নিজের হোটেল ব্যবসায়ে লাগিয়ে দেন। কয়েক বছরের মধ্যে বিরাট হোটেল হয়ে যায়। বিমল লেখাপড়া শিখেছে। সচ্চরিত্র, বুদ্ধিমান, কিন্তু সে কি পারত না শ্বশুরের একটা ব্যাবসা হাতে নিয়ে তাকে বড় করতে।

জমিজমা নিয়ে গ্রামের এক কোণে পড়ে থাকা নিশির ভালো লাগে না। এতখানি বয়স হল তার অথচ সে এখনও মেনল্যান্ডেই যায়নি। এই জন্যই সে তার বড় মেয়েকে এক রকম জোর করেই কলকাতায় রেখে লেখাপড়া শেখাচ্ছে। তার ইচ্ছে কলকাতার মধ্যেই সে তার মেয়ে ইরার বিয়ে দেয়। আজকাল তাদের জাতের কত ছেলে ভালো ভালো চাকরি করছে।

কিন্তু বিমলের মনে কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগে না। সে ছোটবেলা থেকে ডিগলিপুরকে ভালোবেসেছে। তার চোখের সামনে অরণ্যের বুক চিরে তৈরি হয়েছে ডিগলিপুর। ডিগলিপুরকে ছেড়ে যেতে তার ইচ্ছে নেই। এমনকী ডিগলিপুর ছেড়ে মেয়েকে দেখবার জন্য সে যখন দুবার কলকাতা গিয়েছিল দুবারই সে হাঁফিয়ে উঠেছিল।

কিন্তু ডিগলিপুর যেন ক্রমশ পালটে যাচ্ছে। মানুষে মানুষে সন্দেহটা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। ভাই ভাইকে বিশ্বাস করছে না।

এমন কী করে হল। এমন তো হওয়ার কথা ছিল না। আপন মনে পথ চলতে চলতে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে বিমলের।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে দলের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছে। এর মধ্যে তিনদিনের জন্য পোর্টব্লেয়ার গিয়েছিল বিমল। রঞ্জুদার সঙ্গে দেখা করে এসেছে। রঞ্জুদার অফিস একদম এবার্ডিন বাজারের ওপর। সকাল থেকে ভিড় লেগে রয়েছে। সকালে বিমল একবার এসে মুখ দেখিয়ে গেছে। রঞ্জুদা বলেছে, রাতে আসিস। তুই কোথায় এসেছিলি?

টিচার্স অ্যাসেসিয়েশনের পক্ষ থেকে একটা ডেপুটেশন দিতে এসেছি লে. গভর্নরের কাছে। দিন দুয়েক আছি।

রাত এগারোটা নাগাদ রঞ্জুদাকে একা পাওয়া গেল। রঞ্জু বলল—চল, আমার জিপে ওঠ। তোকে নিয়ে একটু ঘোরা যাক।

পোর্টব্লেয়ারের মসৃণ উঁচুনিচু রাস্তা দিয়ে ওদের জিপ চলল মেরিন পার্কের দিকে। জিমখানা ময়দান ও মেরিন পার্ক এক চক্কর ঘুরে কারবাইনস কোভে এসে জিপ থামাতে

বলল রঞ্জু। তারপর দুজনে গিয়ে বসল এক নারকেল গাছের নীচে। সামনে সমুদ্র। অসংখ্য তারা ঝিকমিক করে জ্বলছ সমুদ্রের ওপর। ওগুলো তারা নয়; নানা ধরনের স্টিমার, জাহাজ ও বোটের আলো। রাত এগারোটা বাজে। চারিদিক নিস্তব্ধ।

রঞ্জুদা নিশাচর। তার চোখেমুখে কোনও ক্লান্তি নেই। মনে হচ্ছে এইমাত্র যেন সে বিশ্রাম করে নিয়েছে।

রঞ্জু বলল : বল, ডিগলিপুরের খবর বল।

তুমি তো আজ আট মাস ডিগলিপুর যাও না রঞ্জুদা। পঞ্চায়েত ইলেকশনের আগে সকলে কিন্তু আশা করছিল তুমি আসবা।

রঞ্জু হেসে বলল : ইলেকশনের পর যাব। এখন ইলেকশনের আগে গেলে আমায় একটা সাইড নিতে হবে। লোক্যাল পলিটিক্সে আমি অংশ নিতে চাই না।

কিন্তু সবাই যে কয় কুঞ্জ দাস তোমার ক্যান্ডিডেট।

ভুল ধারণা। কুঞ্জ তো তোর শ্বশুর। তুই তাকে জিজ্ঞাসা করলেই তো পারিস! কুঞ্জ দাসের অনেক বদনাম জানি। কিন্তু আবার পার্টি চালাবার জন্য টাকা চাই। সময় অসময় ওর কাছ থেকেই টাকা নিতে হয়। এই যে এতবড় পঞ্চায়েত নির্বাচন হবে। পার্টি তো আর টাকা দেবে না। কুঞ্জ টাকা দেবে বলেছে। তাছাড়া এখন পলিটিক্সই এমন হয়ে গেছে। টাকা খরচ না করলে ভোট হয় না। অথচ ভালো লোকদের হাতে টাকা নেই। যাইহোক, আমি কিন্তু ডিগলিপুরে কোনো গ্রুপকেই সাহায্য করছি না। এটা আমার স্ট্র্যাটেজি।

কিন্তু কুঞ্জ দাস তো তোমার লোক?

আমার লোক তো সবাইকে নিয়েই। কুঞ্জর রাইভ্যাল শুভঙ্কর হালদারও আমার লোক। এই তো শুভঙ্কর দুদিন আগে এসেছিল। আমি তাকে বুদ্ধি পরামর্শ দিয়েছি।

ও. সি. তপন দাস গত কদিন আগে আমায় কী বলে গেল জানো? রঞ্জুদা, তুমি এখন অনেক বড় হয়ে গেছ জানি। ডিগলিপুরে তোমাকে আর ধরে না। কিন্তু তুমি কি অস্বীকার করতে পারো ডিগলিপুর তোমাকে কম দেয় নাই।

রঞ্জু একটু অপ্রতিভ হল। কিন্তু রাগ করল না। সে বলল—

আমি অস্বীকার করি সে কথা তোকে কে বলল বিমল? তুই তো আর আগের মতো ছোট নস। তুই বড় হয়েছিস। ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেছে। একটু বোঝার চেষ্টা কর। জন্মের পর থেকেই ধাই মা শিশুর নাড়ি কেটে দেয়। মায়ের সঙ্গে তার বন্ধন সঙ্গে সঙ্গে ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু শিশুর বাঁচার জন্যই এই আলাদা হয়ে যাওয়াটা দরকার। আমরা কেউই আমাদের মাকে অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আমরা সাবালক হবার চেষ্টা করব না। মায়ের ভালোবাসা পাবার জন্যই এই বন্ধনটুকু কেটে দেওয়া দরকার।

কিন্তু আমার মনে হয় রঞ্জুদা, তুমি মনে করো, ডিগলিপুরের আর তোমাকে কিছু দেবার নাই?

রঞ্জু সস্নেহে বিমলকে কাছে নিয়ে এসে বলল, আরে পাগল। ডিগলিপুরের যা ভাণ্ডার তা শেষ হতে এখনও কয়েক জন্ম কেটে যাবে। ডিগলিপুরের যা দেবার আছে তা অফুরন্ত।

কী আছে বলোতো ডিগলিপুরে—যাকে তুমি অফুরন্ত ভাণ্ডার বলো? বিমল পালটা প্রশ্ন করল।

আমাদের সবার ফেলে আসা সেই গ্রামের স্মৃতি। আমাদের সংগ্রামের সাক্ষী। ডিগলিপুর আমাদের আত্ম আবিষ্কার। আমরা যে নতুন জীবন গড়তে পারি ডিগলিপুর তারই সাক্ষী। কাজেই সে আমাদের প্রাণে অফুরন্ত উৎসাহ জুগিয়ে চলেছে। আমি যখন মাঝে মাঝে ফুরিয়ে যাই, নিঃশেষ হয়ে যাই, তখন ডিগলিপুরে এসে আবার বাঁচার রসদ সংগ্রহ করি।

কিন্তু আর একটু বেশি সময় কি তুমি দিতে পারো না?

এর চেয়ে বেশি সময় দিলে সেটা তোদেরই ক্ষতি।

ক্যান, আমাদের ক্ষতি ক্যান? বিমল বেশ উৎসুক হয়েই জিজ্ঞাসা করল।

রঞ্জু সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কভাবে বলল, তোরা অনেক ভুল করেছিস বিমল। অনেক অপূর্ণতা আছে তোদের মধ্যে। সেইজন্যই তোরা এখন আমার ওপর সব দোষ চাপাতে পারিস। কিন্তু আমি যদি তোদের মধ্যে থাকতাম, তাহলে আর সেটা পারতিস নে। এখন হয়তো তোরা আমার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলতে পারিস, এই লোকটার জন্যই আমাদের কিছু হল না। কিন্তু আমার আত্মতৃপ্তিটা কোথায় জানিস—আমি মানুষের লড়াকু মনটাকে কাজে লাগাতে পেরেছি। একটা স্পিরিট ভেতরে ভেতরে কাজ না করলে ডিগলিপুর হত না। মনে রাখবি ডিগলিপুর আর পশ্চিমবাংলার ডেভেলেপমেন্ট কিন্তু এক নয়। তুই তখন খুব ছোট। তবু তোর বোধহয় মনে আছে যেদিন আমাদের জাহাজ ডিগলিপুরে এসে পৌঁছেছিল সেদিনকার কথা। সেদিন প্রত্যেকের মুখের দিকে যদি তাকাতিস—একদিকে আশাভঙ্গের বেদনা, আর একদিকে চোখমুখে চাপা রাগ, ক্ষোভ, ঘৃণা। সেদিন যদি আমাকে, রাহাবাবুকে ওরা মেরে ফেলত, কিছুই করার ছিল না। কারণ ওরা কখনও ভাবেনি এক সাপ আর কুমিরে ঘেরা গহন অরণ্যের মধ্যে পুনর্বাসনের নামে সত্যি সত্যি আমরা তাদের নির্বাসন দেব। কিন্তু সেই মানুষগুলোই তো তারপর আজকের ডিগলিপুর গড়ে তুলল। প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের অদম্য ইচ্ছাশক্তিরই তো জয় হল শেষ পর্যন্ত। পশ্চিমবঙ্গে কত উদ্বাস্তু পরিবার ভিখারি হয়ে গেছে। আজও তাদের সেকেন্ড জেনারেশন বেশ্যাবৃত্তি করছে তা তুই জানিস।

বিমল যেন আজ নতুন করে রঞ্জুকে আবিষ্কার করল। রঞ্জু ও বিমল দুজনেই তাদের যৌবনকে পিছনে ফেলে এসেছে। ফেলে এসেছে তাদের স্বপ্নময় কৈশোরকে। বিমল ছোটবেলায় ভাবপ্রবণ ছিল। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে কাঠিন্য এসেছে। কিন্তু রঞ্জু বরাবরই ইস্পাতের মতো শক্ত কিন্তু ঋজু। সে কখনই ভাবপ্রবণতা

দেখায়নি। কিন্তু রাস্তার আলো ঠিকরে এসে রঞ্জুর চোখে পড়েছিল। বিমল দেখল রঞ্জুর চোখের কোণ ভিজে উঠেছে। রঞ্জু উত্তেজিত, অথচ তার কণ্ঠে উষ্ণতা নেই। এটি রঞ্জুর স্বভাব। সে রেগে গেলেও মুখে প্রকাশ করতে পারে না। তার চোখমুখে সেটা প্রকাশ পায়। কিন্তু কণ্ঠস্বরে সেটি বোঝা যায় না।

রঞ্জু বলল—বাঙালিকে তার আত্মঘাতী নীতির জন্য একদিন চরম মূল্য দিতে হবে বিমল। আন্দামানে আসার আগে সেদিনে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থীরা আমাদের কম বাধা দিয়েছিল? তার ফলে কী হল। বছরের পর বছর একটা জেনারেশন ক্যাম্পে কাটিয়ে ভিখারি হয়ে গেল। যারা তাদের কথা না শুনে চলে এল, তাদের সন্তান সন্ততিরা এখন তাদের সেই দূরদৃষ্টির ফসল ঘরে তুলেছে। কিন্তু দুঃখ এই যে প্রথম প্রজন্মের মানুষের যে মায়া ছিল আন্দামানের প্রতি, পরের প্রজন্মের মধ্যে সে মায়া কিন্তু নেই।

বিমল বলল, এটা বোধহয় কোনো দেশেই থাকে না রঞ্জুদা। অস্ট্রেলিয়া কিংবা আমেরিকার কথা যদি ধরো সেদেশে কত প্রজন্ম কেটে গেছে কিন্তু সেই পিলগ্রিম ফাদারদের মতো তাদের মধ্যেও কি তেমন মাটির প্রতি ভালোবাসা আছে?

তাদের মধ্যে অন্তত দেশপ্রেম আছে। কিন্তু আমাদের দেশে প্রেমটাই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বিমল। ধ্বংসের কথা এতদিন বলে পরমুহূর্তেই গড়ার কথা বলা যায় না।

কিন্তু যারা নতুন করে কিছু সৃষ্টি করতে চায় ধ্বংসের মধ্য দিয়েই তাদের সৃষ্টি করতে হয় রঞ্জুদা।

ধ্বংস যে করতেই হবে তার কোনো মানে নেই। যৌবন কী শৈশবকে ধ্বংস করে আসে? তা আসে প্রাকৃতিক কারণে। যৌবন তো কৈশোরেরই পূর্ণতা। রূপান্তর প্রাকৃতিক নিয়ম। প্রকৃতিতে ধ্বংস বলে কিছু নেই। কোন কিছুই ধ্বংস হয় না। সবই পরিবর্তিত হয় মাত্র। বিজ্ঞানও এই কথা বলে। ম্যাটারের কোনও বিনাশ নেই। নতুনকে স্বীকার করি না করি, নতুন আসবেই। এর জন্যে পুরাতনকে গলা টিপে মেরে ফেলে নতুনের জন্য জায়গা করে দেবার কোনও দরকার নেই। কুঞ্জ দাসের মতো লোকেরা রাজনীতিতে কখনই বেশিদিন টিকে থাকবে না। ওটা একটা পাসিং ফেস। কিন্তু কুঞ্জ দাসেরা কেন এতদিন থাকল, যেহেতু তোদের মতো মুক্তমনা তরুণেরা এগিয়ে এল না। ভ্যাকুয়াম তো থাকতে পারে না।

রাজনীতি আমার ভালো লাগে না রঞ্জুদা। আমি তোমারে ভালোবাসি, তোমার জন্যই--তোমার রাজনীতির জন্য নয়।

তুমি আজ এম পি হইছ—লোকে তোমার নাগাল পায় না। কিন্তু এম পি আর মন্ত্রী এসব কিছুই বুঝি না। আমি বুঝি তুমি আমাদেরই লোক, সেদিন যেমন ছিলে আজও—কিন্তু তোমার রাজনীতিরে আমার ভয় যে রাজনীতি কুঞ্জ দাসের মতো লোকেরে সাপোর্ট করতে বলে। আমার শ্বশুর হোক আর যেই হোক—আই কল 'স্পেড এ স্পেড।' উত্তেজিত হয়ে ইংরাজি বলে ফেলল বিমল।

রঞ্জু বলল, আমার রাজনীতি কেন, সব দলের রাজনীতিতেই তুমি নানা ধরনের মানুষ পাবে। রাজনীতি একটা টিম ওয়ার্ক—কারও একা হ্যান্ডিওয়ার্ক নয়—এমনকী একা মিসেস গান্ধিরও নয়। লিডার কখনও ফলোয়ার তৈরি করে না। ফলোয়ারাই লিডার তৈরি করে। ছোটবেলায় স্কুলে একটা সংস্কৃত শ্লোকে পড়েছিলাম, যে দেশের লোক যেমন অন্নপান করে সেদেশে মানুষের কোয়ালিটিও তেমন হয়। প্রদীপ অন্ধকার খায়, তাই কাজল প্রসব করে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে মানুষ তৈরি হয়নি, হচ্ছে না। নেতারাও তো এই মানুষের মধ্যে থেকেই আসবে।

তাহলে তোমাদের কিছুই করার নেই বলো—

খুব বেসিক চেঞ্জ মানে আমূল পরিবর্তন কোনওদিনই চট করে সম্ভব নয়। পরিবর্তন আসবে ধীরে ধীরে। প্রদীপ যেমন জ্বলে। আমাদের কাজ হল মাঝে মাঝে উসকে দেওয়ার। প্রদীপ মশাল নয়, তবু প্রদীপের আলোর অনেক উপকারিতা আছে। ঘন অন্ধকারের মধ্যে কিছুটা অন্তত সে আলোকিত করে। আমরা ওই প্রদীপের শলাকার মতো। মাঝে মাঝে উসকে দেওয়াই আমাদের কাজ। কিন্তু আমি আগেই বলেছি, যতক্ষণ পর্যন্ত না দেশের মানুষ পরিবর্তনের জন্য উন্মুখ হবে ততক্ষণ আমাদের কিছুই করার নেই।

বিমলের মুখে কোনও কথা যোগাল না। রঞ্জু পরদিন কলকাতা চলে যাবে। সেখানে দুদিন থেকে সে যাবে দিল্লি। বিমলকে ফিরতে হবে। কিন্তু ফেরার আগে পর্যন্ত তাকে আরও কতগুলি কাজ সারতে হবে। তাদের পাড়ার অনেকেই এটা ওটা জিনিস আনতে দিয়েছে। বাজারেই কেটে যাবে পুরো একদিন। আরও দুটো দিন কাটল। তৃতীয় দিন বিকেলে জাহাজ ছাড়ল ডিগলিপুরের। প্রায় একমাস জাহাজ ছিল না। আন্দামানে জাহাজ কবে আসবে স্থিরতা নেই। অথচ পোর্টব্লেয়ার ডিগলিপুর প্রতি সপ্তাহে জাহাজ ছাড়ার কথা। কিন্তু আন্দামান প্রশাসনের জাহাজ বেশি নেই। একটি দুটি জাহাজই কুমিরের মতোই ঘোরে এ-দ্বীপ সে-দ্বীপ। জাহাজ না পাওয়া গেলে বাসেই ফিরত বিমল। কিন্তু কী ভাগ্যি এরই মধ্যে সেলিং ডেট পাওয়া গেল।

জাহাজঘাটায় বিমলের সঙ্গে আলাপ হল কলকাতার কয়েকটি যুবকের সঙ্গে। তারা নিকোবর বেড়াতে যাবে বলে জাহাজের খোঁজখবর নিচ্ছে। বিমলকে জিজ্ঞাসা করল কোথায় থাকেন? বিমল বলল—ডিগলিপুর। ওরা চিনতে পারল না। বিমলও অপ্রস্তুতে পড়ল। সত্যিই তো মূল ভূখণ্ডের কোনও মানুষ জানেই না যে, আন্দামানে ডিগলিপুর বলে একটা দ্বীপ আছে।

জাহাজে ফেরার এই একটা সুবিধা যে ক্যাপটেন থেকে জাহাজের যাত্রী সবাই পুরোনো, চেনা মুখ। অনেকের সঙ্গে আলাপও হয়ে গেছে।

সারাদিন ধরে রোদ্দুরের তাপ ছিল। কিন্তু জাহাজে উঠতেই দুপুরের সেই উত্তাপ কোথায় হারিয়ে গেল। মাথার ওপর জলভরা মেঘের জটলা। পাহাড়ের ওপর মেঘেরা উড়ে আসছে। হয়তো বৃষ্টি নামবে। জাহাজের নাম সেন্টিনেল। বিমলের

মনে আছে ১৯৬৪ সালে সেন্টিনেল যখন প্রথম ডিগলিপুরে ভেড়ে তখন দেখতে গিয়েছিল বিমল। শুনেছিল বেশ বড় জাহাজ দিচ্ছে তাদের লাইনে। ১২৫৪ মেট্রিক টনের জাহাজ। ২৭৪ ফুট লম্বা। ৩.৯ মিটার ড্রাফট। ২৯০ টন পানীয় জল বহন করে জাহাজটি। ২৪ ঘণ্টায় ডিজেল খায় ২.৫ টনের মতো। অন্য দুটি জাহাজ চৌরা ও অহীর চেয়ে নিঃসন্দেহে সেন্টিনেল বড়।

কে বিমলবাবু না? আপনি বুঝি পোর্টব্লেয়ার আজকাল কম আসেন?' বিমল তাকিয়ে দেখল কথাটা বলছেন জাহাজের ক্যাপটেন—ক্যাপটেন দত্ত। তার সঙ্গে আগে থেকে আলাপ বিমলের।

হ্যাঁ। এই একবছর পরে আসলাম। বিমল জবাব দিল। তারপর বলল— কেমন আছেন? বাড়ির খবর সব ভালো?

হ্যাঁ। আপনি ভালো? তারপর সঙ্গে সঙ্গেই ক্যাপটেন দত্ত বললেন, আপনার শ্বশুরমশাই তো দাঁড়াচ্ছেন, তাই না?

আমি খবর রাখি না। নিস্পৃহ গলায় জবাব দিল বিমল।

কিন্তু আমরা খবর রাখি। মায়াবন্দর আর ডিগলিপুরের হাঁড়ির খবর বলে দেব। আমরাই তো পারাপার করাই সবাইকে।

বিমল একটু কৌতুক অনুভব করে বলল, আচ্ছা বলুন তো দেখি, ডিগলিপুরের লেটেস্ট খবর কী?

ক্যাপটেন দত্ত একটু হেসে বললেন, পরীক্ষা করছেন? বেশ পরীক্ষা দেব। শুনুন, আপনাদের ওখানে ল অ্যান্ড সিচুয়েশন বেশ খারাপ হয়ে আসছে। স্যুইসাইড বাড়ছে। চোলাই মদ বাড়ছে। জঙ্গল কেটে সাবাড় হচ্ছে। জ্যাকসন ক্রিকে কদিন আগে কুমির মারতে এসে চারজন বার্মিজ ধরা পড়েছে। পঞ্চায়েতের ইলেকশনে এবার সি পি এম-এর অবস্থা খুব ভালো। আপনার শ্বশুরমশাই হয়তো পারবেন না। কেরল আর উইদাউটরা একসঙ্গে সি পি এম-কে সাপোর্ট করবে।

বিমল মনে মনে শঙ্কিত হল। তার শ্বশুরের প্রসঙ্গ মানেই চোলাইমদের প্রসঙ্গ। গাছ কাটার প্রসঙ্গ এসে পড়লে সে খুব বিব্রত বোধ করে। তার যেন মনে হয় তার শ্বশুরের কথা সবাই জানে। প্রসঙ্গ ঘোরাবার জন্য বিমল বলল—আপনি সবই জানেন যখন আমায় আর জিজ্ঞাসা করছেন কেন? আচ্ছা আপনি মাঝখানে চৌরা জাহাজে ছিলেন না?

ক্যাপটেন দত্ত বললেন, চৌরাতে চার মাস আর ওঙ্গিতে চার মাস ছিলাম। তবে আপনাদের সেন্টিনেল, জাড়োয়া কিংবা রামানুজমে কাজ করার চেয়ে চৌরি আর ওঙ্গিতে কাজ করা অনেক ভালো। বেশি লোড নেই। ঝামেলা নেই। বড় জাহাজ চালানো কি সোজা কথা। ১১০ টন ডিজেল ভর্তি করে তবে জাহাজ ছাড়তে হয়। তেলের ক্রাইসিসে মাঝে মাঝেই তেল পাই না। জাহাজ শিডিউল হতে পারে না। ডিউটিতে এসে চুপচাপ বসে থাকতে হয়। আগে একটা কার্গো ছিল। এখন কার্গো

তুলে দেওয়ায়, আমাকেই মাল টানতে হচ্ছে। নীচেটা একবার দেখে আসুন। মাল আর মানুষে ঠ্যাসাঠেসি। একটা অ্যাকসিডেন্ট হলে তখন আমাদেরই তো সবাই দুষবে।

ক্যাপটেন দত্ত-র সঙ্গে আগে যখন দেখা হয়েছিল তখন বাড়ি করছিলেন বলছিলেন। বিমল বলল, আপনার বাড়ি কমপ্লিট?

হ্যাঁ, এই ডিসেম্বরে গৃহপ্রবেশ করলাম।

কোথায় যেন, সোদপুর তাই না?

না, সোদপুরের কাছেই পানিহাটিতে। ওইখানে আমরা ভাড়া ছিলাম। তা গঙ্গার ধারে একটা পুরোনো বাড়ি পেয়ে গেলাম। ওটাকে ভেঙে নতুন করে তৈরি করেছি। আমি করেছি বলব না। আমার মিসেসই সব করেছে। আমি শুধু চেক কেটেছি আর গিয়ে গৃহপ্রবেশ করেছি।

সেই মুহূর্তে ক্যাপটেন দত্ত-কে বিষয়সুখে সুখী এক সফল মানুষ বলে মনে হচ্ছিল। একের পর বলে চলছিলেন, তাঁর জীবন কাহিনি। বছরে দুমাস ছুটি পান। ওই দুমাসই তাঁর গার্হস্থ্য জীবন। বাকি সময়টা এই ভেসে ভেসে চলা। তবে জাহাজের চাকরির একটা নেশা আছে। সমুদ্রের এক মনোমোহিনী হাতছানি আছে। ওই প্রচণ্ড নেশার আবেশে দিনগুলি যেন চিরকালই সোনার খাঁচায় থেকে যায়।

বিমলেরও ঠিক এমন দ্বৈত সত্তা আছে। ডিগলিপুর তার ছাড়তে ইচ্ছে করে না একথা সত্যি কিন্তু তেমনি সত্যি তার ইচ্ছে করে জাহাজে কাজ নিয়ে দূর দূর দেশে পাড়ি দিতে।

সমুদ্রের মধ্যে যেন সুদূরের আহ্বান লুকিয়ে থাকে। ঢেউয়ের দোলায় দুলতে দুলতে যখন অন্তহীন সমুদ্রের মাঝখানে চলে আসে জাহাজটি তখন যেন মনে হয় এই অনির্দেশ যাত্রাপথের যেন শেষ না হয় কোনদিনও। শুধু ভেসে বেড়ানোতেই আনন্দ। তখন যেন মনে হয় থিতু হয়ে কোথাও বসে পড়ার নামই মৃত্যু। অতএব ঢেউয়ের তালে তালে পাক খেতে খেতে এগিয়ে চলো। চরৈবেতি চরৈবেতি।

ক্যাপটেন দত্তর সঙ্গে গল্প করে ঘণ্টা দুয়েক কেটে গেল। খাবার ঘণ্টা পড়ে যাওয়াতে নিচে ক্যানটিনে খেতে গেল বিমল।

আর ক্যানটিনে গিয়ে দেখা হয়ে গেল নিতাই দাসের সঙ্গে। নিতাই একা নয়, তার সঙ্গে একটি বিবাহিতা ভদ্রমহিলা। ফরসা রং। বছর ছাব্বিশ সাতাশ বয়স, পরনে তাঁতে ছাপা শাড়ি। সিঁদুরের টিপ। সিঁথিতে সিঁদুর।

নিতাই মাসখানেক আগে মছলন্দপুর দেশে গিয়েছিল বিমল শুনেছিল। দেশ থেকে চার বছর আগে ডিগলিপুর আসার পর নিতাই বার-তিনেক দেশে গিয়েছিল। প্রতিবার সে দেশে যাবার সময় কলকাতা ঘুরে প্রচুর মালপত্র নিয়ে আসে। একদম নিঃস্ব অবস্থায় এসেছিল নিতাই। বিমলই তাকে শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে কিছু টাকা ধার পাইয়ে দেয়। উদ্যমী ছেলে। বছরখানেকের মধ্যে দাঁড়িয়ে যায়। দুবছরের

মধ্যে বিয়ে করে সে। পাত্রী ডিগলিপুরেরই মেয়ে। মাস চারেক হল তার একটি ছেলেও হয়েছে। কিন্তু এই মেয়েটি তো নিতাইয়ের বউ নয়। তাছাড়া নিতাইয়ের বউ তো ছেলেপুলে হবার জন্য বাপের বাড়ি গিয়েছিল। নিতাই চলে যাবার পর বউ বাপের বাড়ি থেকে এসে দোকান সামলাচ্ছে।

একদম সামনা সামনি পড়ে যেতেই নিতাই বলল—দাদা আপনে?

পোর্টব্লেয়ার আইছিলাম। ফেরত যাচ্ছি। তুমি কি মেনল্যান্ড থেকে আসছ?

হ্যাঁ, দাদা, জাহাজের কোনো খবর নাই। তাই প্লেনেই আসলাম। তাও দ্যাখেন না তিনদিন পোর্টব্লেয়ারে থাকতে হল। মালপত্র কিছু আনতে পারলাম না।

বিমল ভদ্রমহিলাকে দেখিয়ে বলল—ওনার পরিচয়টা?

নিতাই অম্লান বদনে বলল, আমার পরিবার মানদা।

বিমল সেই মুহূর্তে প্রচণ্ড অবাক হয়ে গেল। নিতাই আবার বিয়ে করেছে নাকি?

সেই মুহূর্তে একটি চব্বিশ পঁচিশ বছরের ছেলে—দেখে মনে হয় খুব ফুর্তিবাজ এসে নিতাইকে বলল, নিতাইদা, আমি ডেকে আছি। আপনি আসবেন নাকি খাওয়া সেরে?

নিতাই ছেলেটিকে ডেকে বলল, বিমলদা, এর নাম সনৎ। আমার সম্বন্ধী। পোর্টব্লেয়ারে যদি কিছু সুবিধা হয় নিয়ে যাচ্ছি। বি. এ. ফেল করে পাঁচ বছর বাড়ি বসে আছে।

বিমল স্তম্ভিত হয়ে গেল। সে একটু দূরে নিতাইকে ডেকে বলল, নিতাই, তুমি আবার বিয়া করলা? তোমার না পরিবার আছে?

নিতাই বিন্দুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে বলল, আমার পেরথম বউরে আমি ত্যাগ করবোনানে। সেও থাকবে। এও থাকবে। তবে দুজনরে এক বাড়িতে রাখব না। আপনারে সত্য কথাডা বলি। এই মেয়ের সঙ্গে আমার লাভ ছেল কলেজের সময় থেকে। গোবরডাঙা কলেজে পড়ত। আমার অনেক জুনিয়র। দক্ষিণ কাতরায় বাড়ি। আমার পাশের গেরাম। ও বাংলাদেশ থেকে এয়েছে বছর পাঁচেক আগে। আমার সঙ্গে মছলন্দপুর ইষ্টিশানে লাভ হয়। তা আমি আন্দামানে যাবার আগে ওর সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। এক বছর পরে যখন ফেরত গ্যালাম তখন ওর কী কান্না। আমারে কয়, আমারে ফেলে থুয়ে গেলে। আমারে এবার নে যাও। আমি বললাম, তুমি তো আমারে আগে কও নাই, এত ভালোবাসো। আমি যে বিয়া কইরা ফেলছি। ও বলে তা করছ ঠিক আছে। ও বউও থাকবো আমিও থাকবো। আমি সেবার তো চলে গেলাম। তারপর তিন বছর ধরে চিঠি লেখালেখি। এবার যেতেই আবার ধরল। বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে। বিয়ে-থা করেনি। আমার জন্য অপেক্ষায় আছে। আমিও দ্যাখলাম, দোকানটা বাড়ছে এবার। একজন শিক্ষিত মাইয়া থাকলে ভালো হয়। আমার পরিবারকে তো জানেন। লেখাপড়া জানে না। তবে ঘরের কাজকর্মে দড়। আমি জমিজমা কিনছি। ও ওটা দেখতে পারবে। আর মানদা দোকানটা দেখবে।

চলে আসছি। মানদার ভাই বলল, আমায় নে চলেন। ওখানে কাজ কারবার হয় কিনা দেখি। এদিকে তো কিছু হল না। পার্টির জন্য এত খাটলাম। কিন্তু চাকরি বাকরি তো কিছু হল না। বর্ডার থেকে মাল আনলে ভালো পয়সা। কিন্তু পুলিশেরে দিয়ে থুয়ে কিছু থাকে না। খারাপ লাইন। খুনজখম লেগেই আছে। মানদা ধরল, ভাইরে নে যাও। ও এখানে থাকলে কবে ছোরা খেয়ে মরবে। তা ওরেও নিতে হল। প্লেন ভাড়া দিতেই অনেক টাকা বেরিয়ে গেল।

ডিগলিপুরে বহুবিবাহ এই নতুন নয়। নতুন প্রজন্মের অনেকেই দুটো বিয়ে করেছে। সেই সঙ্গে বেড়েছে বউ পালিয়ে যাওয়া। তার নিজের বোন এক বিহারী শ্রমিককে বিয়ে করেছে স্বেচ্ছায়। কিন্তু অনেকের বিবাহিতা স্ত্রী স্বামীকে ছেড়ে রাঁচি শ্রমিকদের সঙ্গে বাস করছে। বিমল জানে, নিতাই দাসের এই দ্বিতীয় বিবাহ ডিগলিপুরের সমাজে ক্ষণিকের আলোড়ন তুলে আবার বুদ্‌বুদের মতো মিলিয়ে যাবে। নিতাইয়ের প্রথম বউ মানদাকে দেখে প্রথমে কাঁদবে। হয়তো দুদিন খাবে না। স্বামীর সঙ্গে কথা বলবে না। তারপর মেনে নেবে। সত্যি মেয়েরা বড় অসহায় এ দ্বীপে। পুরুষের এই অত্যাচার আনাচারকে নির্বিবাদে মেনে নেওয়া ছাড়া তাদের উপায়ই বা কি আজ। বড় জোর কোন রাঁচি শ্রমিকের কাছে পালিয়ে গিয়ে তার রক্ষিতা হয়ে থাকা।

রাতে ঘুম এল না বিমলের। জাহাজ ভীষণ দুলছিল। অনেকদিন পর জাহাজে চড়া। সি সিকনেসের মত হচ্ছিল। একটা বমি-বমি ভাব। তার ওপর বার বার নিতাই দাসের বউয়ের মুখটি চোখের সামনে ভাসছিল।

ডিগলিপুর জাহাজঘাটে ও.সি. তপন দাস এসেছিল। সবার আগে বিমল নামল।

তপন বলল— আরে বিমলদা কোথায় গিয়েছিলেন?

বিমল বলল, পোর্টব্লেয়ার।

রঞ্জুদার সঙ্গে দেখা হল?

হ্যাঁ। পরশু রাতে দেখা হয়েছিল। কাল সকালে উনি কলকাতায় গেলেন।

তাহলে আর ডিগলিপুরে আসছেন না।

না। ভোটের আগে আসবেন না। তুমি এখানে কার জন্য অপেক্ষা করছ তপন?

আমাদের ডি এস পি আন্নাদুরাইসাহেব আসবেন।

জাহাজে? ও হ্যাঁ, একজন পুলিশ অফিসারকে দেখছিলাম। মায়াবন্দর থেকে উঠলেন। তা আমি তো ডি এস পি সাহেবকে চিনি না। আগের ডি এস পি ট্যান্ডনকে চিনতাম।

ইনি প্রথম আসছেন ডিগলিপুর। পঞ্চায়েত ইলেকশন নিয়ে আলোচনা হবে। গেস্টহাউসে উঠছেন। আপনি আসবেন আলাপ করিয়ে দেব।

এদিকের খবর ভালো?

মোটামুটি। এদিকে এক মজার কাণ্ড ঘটেছে, গত পরশুদিন হর্ষবর্ধন জাহাজে কলকাতা থেকে এসেছে এক ভদ্রমহিলা। তা বছর চল্লিশেক বয়স হবে। সঙ্গে মেয়ে। বয়স দশ বারো হবে। ভদ্রমহিলার স্বামী নেভিতে কাজ করতেন। রিটায়ার করে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। দুবছর খোঁজাখুঁজির পর ভদ্রমহিলা জানতে পারেন, তার স্বামী ডিগলিপুরে বাস করছেন। উনি খবর পেয়ে ছেলেমেয়েকে নিয়ে স্বামীর কাছে গিয়েছিলেন। কিন্তু স্বামী তাঁকে তাড়িয়ে দেন। কাল ভদ্রমহিলা আমার কাছে এসেছিলেন। কিন্তু আমি কী করতে পারি। আমাদের হাতে এসব ব্যাপারে কোনও আইন নেই। এটা ম্যাট্রিমনিয়াল কেস। আদালতে মামলা রুজু করতে হবে।

বিমল একটু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, সেই মহিলা এখন কোথায়?

সীতানাথ মণ্ডলের বউ ছায়া মণ্ডল তাদের রেখে দিয়েছে। আপনার শ্বশুর-মশাইয়ের কাছে আজ যাবে। পঞ্চায়েত যদি ব্যাপারটার একটা ফয়সালা করতে পারে। একটু পরে দেখা গেল একজন পুলিশ অফিসার নামছেন। তপন তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে একটা বিরাট স্যালুট দিল।

বাড়ি পৌঁছোতেই বিমল দেখল ওর ছেলে নির্মল বাড়ির সামনে অপেক্ষা করছে। বিমল আসতেই নির্মল জড়িয়ে ধরল তাকে। নির্মল বলল. তুমি আজ আসবা আমি জেনেছিলাম।

ডিগলিপুরের বর্তমান প্রজন্মের ভাষা প্রায় কলকাতা-ঘেঁষাই হয়ে এসেছে। বিমলদের বয়সি লোকেরা দুরকম ভাষাই ব্যবহার করে। অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে বাঙাল ভাষা। বরিশাল আর খুলনার ভাষার জগাখিচুড়ি। বাইরের লোকদের সঙ্গে শুধু কলকাতার ভাষাতেই কথা বলে। কিন্তু টি ভি-র কল্যাণে এই প্রজন্মের ছেলেরা কলকাতার ভাষাতেই কথা বলে। তাদের জামাকাপড়, চালচলন শহরঘেঁষা আধুনিক হয়ে উঠেছে। অনেকের বাড়িতেই ভিসিআব, ভিসিপি এসেছে। নির্মলেব মামার বাড়িতেই ভিসিপি আছে। মামার বাড়ি গিয়ে প্রায়ই ভিসিপি-তে ছবি দেখে নির্মল।

তুমি জানলা কী করে?

সুশান্ত জেঠু খবর দিয়ে গেছেন।

সুশান্ত জেঠু অর্থে সুশান্ত ঘোষ রায়চৌধুরী তার স্কুলের সহকর্মী। সুশান্তবাবু আছেন ১৯৬৩ সাল থেকে। ওঁর স্ত্রীও একই স্কুলে পড়ান। বাড়ি ছিল ফরিদপুর। কিন্তু সুশান্তবাবু পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় জেলায় ছাত্রজীবন কাটিয়েছেন। বাবা দারোগা ছিলেন। সেই সূত্রেই ঘুরতে হয়েছে তাঁকে। বি. এ. পাশ করে সুশান্তবাবু চাকরির জন্য দরখাস্ত করেন। সেসময় আন্দামান প্রশাসন স্কুল শিক্ষক নিচ্ছিল। হাজার হাজার বাঙালি তরুণ চাকরি নিয়ে চলে আসে আন্দামানের বিভিন্ন দ্বীপে। সুশান্তবাবু তাদেরই একজন। কিন্তু আন্দামানের প্রেমে পড়ে গিয়ে তিন আর মূল ভূখণ্ডে ফিরে যাবার কথা ভাবেন না। বড় ছেলে যাদবপুর থেকে প্রিন্টিং টেকনোলজি পাশ করে আজকাল পত্রিকায় চাকরি করছে। মেজ ছেলে মায়াবন্দরে ঠিকাদারি করে। প্রচুর

পয়সার মালিক সে। বড় মেয়ে কলকাতার যোগমায়াদেবী কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেছে। এখনও বিয়ে হয়নি। কলকাতায় বড় ছেলের বাসায় থাকে।

সুশান্তদা আসছিলেন নাকি?

হ্যাঁ কাল আসছিল।

তোরা সব ভালো?

হ্যাঁ।

বিমল বাড়ির ভেতর ঢুকল। বাড়ির দরজা থেকে বাগান পেরিয়ে তাদের বাড়িতে ঢুকতে কিছুটা হাঁটতে হয়। দুপাশে ফুলের গাছ। ফলের গাছ। পেয়ারা, আম, কাঁঠাল। এপ্রিল মাস। বেশ গরম। তবে ডিগলিপুরে মেনল্যান্ডের মতো গরম পড়ে না। বিমলের মনে আছে ছোটবেলায় যখন তারা প্রথম এল ডিগলিপুরে তখন গরমকালে খুব বেশি গরম পড়ত না। তবে বেশ বৃষ্টি হত। এখন গাছগাছালি কেটে ফেলায় বৃষ্টিও কমে গেছে। গরমও বেড়েছে।

এই এপ্রিল মাসে আমগাছে গুটি ধরেছে। কাঁঠালগাছে ইঁচড় ফলেছে। এক পাশে কলাগাছের ঝাড়। তাদের একতলা বাড়ি। গ্রামের বাড়ির মতো মাটির বাড়ি। মাথায় টালির ছাদ। বিমল ঠিক করে রেখেছিল অনেকের মত পাকা বাড়ি তুলবে। ভগবানের কৃপায় তার কোনও অভাব নেই। স্কুল থেকে দুহাজার টাকার মতো বেতন পায়। ধানচাল তরিতরকারি কিছুই কিনতে হয় না। বরং তরি-তরকারি চাল বিক্রি করে বছরে পাঁচ ছ'হজার টাকা ঘরে আসে। বিমল স্টেট ব্যাংকে প্রায় এক লাখ টাকা জমিয়েছে। ম্যানেজার মি. লাহিড়ি একদিন বলেছিলেন, বিমলবাবু, অত টাকা সেভিংস অ্যাকাউন্টে ফেলে রেখে দিয়েছেন কেন? টাকাটা ছ-বছরের জন্য ফিক্সড করে রেখে দিন না। দু লাখ টাকা পাবেন। বিমল বলেছিল, অত তো ভেবে দেখিনি লাহিড়িবাবু। আপনি যা ভালো বোঝেন তাই করেন।

দেখবেন মেয়ের বিয়ের সময় যেন টাকাটা হাতে পাই।

মেয়ের বয়স কত?

এই তো এবার পোর্টব্লেয়ার স্কুল থেকে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করল।

দিস ইজ হাই টাইম।

বিমল বলল, মেয়েকে মেনল্যান্ডে পড়াতে পাঠাব। যতদূর পড়ে পড়ুক, মেনল্যান্ডে যদি বিয়ে হয় তাহলেই ভালো। তবে মেনল্যান্ডের পাত্রের খাঁই অনেক। আমাদের সমাজে আগে ছেলেদের কন্যাপণ দিতে হত। এখন লেখাপড়া শিখে সব উলটো হয়ে গেল।

আপনি ভাবছেন কেন? আপনার ছ-বছর পরে দু লাখ টাকা হয়ে যাবে। তবে আপনি তো আর জমিজমা কিছু কিনলেন না। আপনার শ্বশুরমশাইয়ের জমি কত জানেন?

ষাট সত্তর বিঘে হবে।

অন্তত একশো বিঘে। এই তো হালে বিশ বিঘে কিনে নিলেন। সুধীর ঘরামির জমি। সুধীর ঘরামি জমি বেচে এখন কুঞ্জবাবুর জমিতেই কাজ করছে।

আপনি তো জানেন লাহিড়িবাবু। আমি শ্বশুরবাড়িতে বেশি যাইও না। খবরও রাখি না।

খবর কি আর আমি রাখি। স্টেট ব্যাংকের ম্যানেজার হিসাবে খবর আমার কাছে এসে যায়।

কুঞ্জবাবু গত সপ্তাহে এসেছিলেন, ত্রিশহাজার টাকা তুললেন। আমি বললাম, কি দাসমশাই, এত নগদ টাকা দিয়ে কী করবেন? তখন উনি বললেন, শস্তায় জমি পাচ্ছি, কিনে রাখি। তা না হলে রাঁচিদের হাতে চলে যাবে। কী হবে বলুন তো, শতকরা ত্রিশভাগ জমি দেখছি ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছে। বাবা মারা গেলে জমি নিয়ে ভায়ে ভায়ে গণ্ডগোল। ভাইয়েরা জমি বেচে দিচ্ছে। কেউ চাষবাসে ইন্টারেস্টেড নয়, জমি বেচে ব্যবসা করছে। রাঁচিদের হাতেও জমি চলে যাচ্ছে। এই তো ব্যবসায়ী নিতাই দাস। সুভাষবাজারে ছোট একটা মনিহারি দোকান করেছে বছর চারেক হল। এর মধ্যেই বিঘে দশ জমি কিনে ফেলেছে।

দিন আসছে লাহিড়ী বাবু যেদিন আমরা, যারা ডিগলিপুরের আদি বসবাসী তারাই মাইনরিটি হয়ে যাবো। ঘরের ভেতর ঢোকার সময় নির্মল বলল—মা, মা, বাবা এসেছে।

ঘরের ভেতর থেকে টি ভি-র আওয়াজ আসছে। রবিবার সকালে কিছুক্ষণ আগে মহাভারত শেষ হয়েছে। টি ভি দেখছিল নিশি। বিমল আসছে শুনে খুব ভাবান্তর দেখা গেল না তার চোখে মুখে। গৌরী রান্নাঘরে ছিল। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল।

জাহাজ এখন আইল বুঝি?

হ। তোমাবা ভালো আছ?

আছি। একটু নিস্পৃহভাবে গৌরী জবাব দিল। এখন তার বয়স হয়েছে। বাতে মাঝে মাঝে পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকে। মাথার চুল সব সাদা হয়ে গেছে। একে তো রোগা চেহারা। তাকে আরও রোগা দেখায়।

চা খাবা তো?

বিমল হাতের জিনিসপত্র রেখে বলল—তুমি ব্যস্ত হয়ো না মা। তুমি বোসো। বউ করে দেবানে।

বিমল ঘরে ঢুকতেই টি ভি-র আওয়াজ একটু কমিয়ে দিয়ে নিশি উঠে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে নিশি বিমলের লুঙি আর গেঞ্জি নিয়ে এল।

বিমল নির্মলকে বলল— একটু জল গড়া তো।

খাবা?

হ্যাঁ, তেষ্টা লাগছে খুব। জাহাজের জলে কেমন যেন গন্ধ করে।

গৌরী শুনতে পেয়ে বলল, আমি এনে দিচ্ছি।

বিমল বলল, তোমার আর কলতলায় নামতে হবে না। নির্মল টিউবওয়েলের জল এনে দেচ্ছে।

নির্মল জল এনে দিতেই ঢক ঢক করে খেয়ে বিমল তৃপ্তির স্বরে বলল—আঃ। বাড়ির কলের জল না খাইলে হয় না। আমার বাপ বলত, বাড়ির জল আর গাছের ফলের মতো তৃপ্তি আর নাই। নিশি কোথায় গেলে শোনছ?

নিশি এসে দাঁড়াল। বলল — বলো।

রঞ্জুদার সঙ্গে দ্যাখা হল। আমারে নিয়ে কত কথা। রঞ্জুদা ছোটবেলা থেকেই বড় বড় কথা কয়তো। ঠিক যেন বক্তৃতা করছে। তবে কথার মধ্যে যুক্তি আছে। একটু থেমে বিমল বলল, লোকে রঞ্জুদারে ভুল বোঝে। বলে রঞ্জুদা ডিগলিপুরকে ভুলে গেছে। নিজের ধান্দা নিয়া আছে। কিন্তু আমার মতো ডিগলিপুরে পড়ে থাকলে সকলের চলবে? ডিগলিপুর যে ভারতের মধ্যে এটি জানাল কেডা? রাহাবাবু বলো, বিকাশবাবু বলো, সবাইতো সরকারি চাকরি করে, কে কোথায় চলে গেছেন। বিকাশবাবু দিল্লিতে চাকরি নে চলে গেছেন। রাহাবাবু তো আন্দামানের বাস উঠোয়ে এখন কলকাতা থাকেন। রঞ্জুদা তো আন্দামান ছাড়েনি।

নিশি বলল : এই শুরু হল ঘ্যান ঘ্যান। রঞ্জুদার কথা উঠলি আর থামতে চাও না। ও সব কথা রাখো। এদিকে অনেক বড় কথা আছে।

কী কথা কও দেখি? কী হল আবার?

আমাদের ডিগলিপুরের বাস এবার তুলতে হবে। তোমার ভাই পিছনে লাগছে। পার্টির লোকজন নিয়ে বাড়ির বাগানের সব ডাব পেড়ে নে গেছে।

তোমরা কিছু বললে না?

আমরা কী বলব। মেয়েমানুষ। ঘরে থাকার বলতে তো এক নাবালক আর এক বুড়ি। একবার ভাবলাম বাবারে খবর দিই। কিন্তু তোমার মা বারণ করল।

গৌরী শুনতে পেয়ে কিছুটা কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গিতে বলল— তা বারণ করব না ক্যান বাবা। ভায়ে ভায়ে ঝগড়া। এর মধ্যি বেয়াই মশাইরে টানলে তাঁরও ইজ্জৎ থাকে না। আমাদেরও ইজ্জৎ থাকে না। তাবাদে সঙ্গে পার্টির মাউলি ছেলেরা। ওদের সঙ্গে এঁটে উঠতে গেলি মারামারি করতি হয়। বেয়াইরে ডাকলে সে এক রগচটা লোক। তার ওপর কংগ্রেস করে। একটা রক্তগঙ্গা বয়ে যেত।

নিশি শাশুড়িকে এক ধমক দিয়ে বলল— এবারে আপনে থামেন। আপনার তো গায়ে লাগবই। নিজের প্যাটের ছেলে। কিন্তু এই আস্পদ্দা তো ভাঙা দরকার। এর একটা বিহিত করাও দরকার। হয় পঞ্চায়েতে খবর দেওয়া হোক, না হয় দু-পার্টির মধ্যে মীমেংসা হোক।

বিমল বলল, কবে পেড়েছে নারকেল?

নিশি বলল— গতকাল। নির্মলের মাথায় যে ফেলে নাই তাই যথেষ্ট। ওপর থেকে দুম দুম করে কান্দি ফেলছিল। কিছ ডাব ফাটছে। তবে ঝনো নারকেলই বেশি।

বিমল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—এতখানি উচ্ছন্নে যাবে ভাবিনি। আমি এর একটা বিহিত চাইব। ডি এস পি সাহেব আসছেন। আমি তাঁর কাছে যাব। কিন্তু খাওয়াদাওয়া সেরে মাথা ঠান্ডা করে বিমল ভেবে পেল না এ সমস্যার সমাধান করা যায় কিনা। অনেক ভেবে ঠিক করল, এর সমাধানের একমাত্র পথ হল সম্পত্তি ভাগ করে নেওয়া। সব শুদ্ধ তিন ভাগ হোক। গৌরী এক ভাগ পাবে। তারপর দু ভাগে ভাগ হয়ে যাবে। এক ভাগ তার। আর এক ভাগ ছোট ভাইয়ের।

ভাইয়ে ভাইয়ে সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ বহু জায়গাতেই হয়। তাদের স্কুলের অঙ্কের মাস্টারমশাই সুদেব চৌধুরী বলছিলেন, বাবা-মারা যাবার পর সম্পত্তি নিয়ে তাঁদের দু ভাইয়ের মধ্যেও এমন বিরোধ ঘটেছে। শ্রাদ্ধশান্তি চুকতে না চুকতেই ভাই আলাদা বাসা করেছে। শুধু তাই নয়, ওই বাসা থেকে ছোট ভাই একদিন এসে দাবি করেছে পৈত্রিক অস্থাবর সম্পত্তির চুলচেরা ভাগ করতে হবে। শেষমেশ ভালো সার কারখানা জলের দামে বেচে ওই টাকায় ঋণ শোধ করেছে। কিন্তু তবু ছোট ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাবে বলে রাতারাতি আন্দামানে চাকরি নিয়ে চলে এসেছিলেন সুদেববাবু।

বিমল বুঝতে পারছে এই গ্রামীণ সমাজ ধীরে ধীরে ভেঙে যাচ্ছে। গ্রাম কি শুধু প্রকৃতিকে নিয়ে? গ্রাম তো তার মানুষকে নিয়ে। যে মানুষ পরস্পর অনুরক্ত, এক গভীর প্রত্যয়ে বন্দি। সে প্রত্যয়টি হল, বেঁচে থাকার শর্তই হল পরস্পরকে ভালোবাসা। কিন্তু ভাইয়ে ভাইয়ে সম্পর্ক যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আর থাকতেই পারে না। সম্পর্কের শুরু তো পরিবার থেকেই।

নিশি খাওয়া দাওয়া সেরে এসে বলল, বাবা তোমারে আজ দেখা করতে বলেছে।

তুমি এসব কথা বাবারে কইছ নাকি?

আমি বলি নাই। বাবার লোক চারিদিকে। সে শোনছে কারও কাছ থেকে।

তোমাকে ডাকেননি?

খবর পাঠায়েছিল। বলেছি তুমি ফিরলে এক সঙ্গে যাব।

ছিঃ ছিঃ, এমন কোন, ব্যাপার নয় যে এ নিয়া তোমার বাবার কাছে যেতে হবে।

আমার বাবা তো তোমার শ্বশুর। তার কাছে গেলে তোমার মান যায়।

আমি তা বলিনি। তবে এটা নেহাতই পারিবারিক ব্যাপার।

কেন, আমার বাবা তোমার কেউ নয়—

বিমল বলল, এই দ্যাখো নিশি তুমি ঝগড়া লাগাও। আমি এমন কথা বলি নাই। ঠিক আছে। তুমি বলছ, আমি যাব।

শ্বশুর কুঞ্জ দাসের সঙ্গ বিমল এড়িয়ে চলে। কুঞ্জ দাসকে, তার কাজকর্মকে তার পছন্দ নয়। কুঞ্জ দাস সম্পর্কে বাজারে সুনামও নেই। কিন্তু তবু নিশির কথায় আজ যেতেই হয়। নিশি আর নির্মলকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি গেল বিমল। আজ প্রায় ছমাস

পরে শ্বশুরবাড়িতে ঢুকল। দোতলা বাড়ি। ওপরে করোগেটেড টিনের ছাউনি। দেওয়ালে ছাঁচের বেড়া। সিমেন্টের মেঝে। সিমেন্টের সিঁড়ি। বাড়ির সামনে অনেকখানি উঠোন। একপাশে কাঠ চেরাই হচ্ছে। কাঠের কাজের লাইসেন্স আছে কুঞ্জ দাসের। সে বনবিভাগ থেকে গাছ কিনে চেরাই করে কাঠ হিসাবে বিক্রি করে। এই বৈধ কাজের মধ্যেই অবৈধ কাজের মিশেল আছে।

বাড়ির সামনে বারান্দা। সেখানে বেঞ্চে বসে কয়েকজন লোক। এরা কর্মচারী না পার্টির লোক বোঝা গেল না। কিন্তু বিমলকে দেখে লোকগুলো উঠে দাঁড়িয়ে তাকে স্বাগত জানাল। নিশি নির্মলকে নিয়ে ঢুকে গেল বাড়ির ভেতর। নিশির মায়ের বয়স ষাটের কাছাকাছি। চুলে পাক ধরেছে। তারপর খুব মোটা হয়ে গেছেন। বেশি চলাফেরা করতে পারেন না। নিশি গিয়ে সোজা মায়ের ঘরে ঢুকল।

মা কেমন আছ?

কে নিশি, এতদিন পরে এলি।

ও তো ছিল না ওখানে। শাশুড়িরে কার কাছে থুয়ে আসি। একটা গোরু গাভিন হইছে। হালের বলদ দু-জোড়া। এখন তো দুজোড়াই বয়ে আছে। কাজকাম নাই, তো দ্যাখবার লাগে। কথা তো কর্তার কাছে শোনলাম। বিমলের ভাই অত্যাচার শুরু করেছে। উনি খুব রেগে গেছেন। বিমলের ভাইয়ের এত জোর হয় কী করে? খুঁটির জোরে মেড়া নড়ে।

বিমল বাইরের ঘরে বসতেই একজন বলল, দাসমশাই তো বাজারের দিকে গেলেন। ওখানে বোধহয় মিটিং আছে আজ। বিমল আর এক কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করল, কি বেন্দাবন, বড়কর্তা গেছেন কই?

বাজারে। মিটিং আছে। মাইক-টাইক গেল তো দেখলাম। আপনি বসেন জামাইবাবু, চা জলখাবার খান। এবেলাটা তো আছেন। উনি সন্ধের পর এসে পড়বেন।

বিমল যে ঘরটায় বসেছিল সেটি কুঞ্জ দাসের বসার ঘর। ঘরে অনেকগুলো ছবি টাঙানো। ইন্দিরা গান্ধি, রাজীব গান্ধি। একটি ফোটো ইন্দিরা গান্ধির সঙ্গে রঞ্জুদা কথা বলছেন। পাশে দাঁড়িয়ে কুঞ্জ দাস। সম্ভবত দিল্লিতে তোলা ছবিটা। এক জায়গায় একটি মানপত্র। রাধানগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা দিয়েছে। একটু পরে একজন এসে চা আর মুড়ি নারকেল কোরা দিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে একটি দাড়িওলা বুড়ো ঘরে ঢুকল। পরনে ধুতি, গায়ে তাঁতের একটি গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি। হাতে ছাতা। লোকটিকে কোথায় দেখেছে ঠিক মনে করতে পারল না বিমল। কিন্তু লোকটি তাকে চিনতে পারল।

হাতজোর করে নমস্কার করে বলল, আমায় চিনতে পারেন?

বিমল চিনতে পারল না।

আমার নাম গদাধরঠাকুর। দুর্গাপুরে বাড়ি। কর্তার কাছে আসছিলাম। তিনি নাই দেখে ফেরত যাই, এমন সময় শোনলাম জামাইবাবু আছেন। তাই আসলাম আপনার

লগে দ্যাখা করতে।

মনে পড়ছে আপনে না একবার বির্বেগি হয়ে চলে গেছলেন?

হ্যাঁ। সে এক কাহিনি। তখন পাগল হইয়া গেছলাম। জাহাজে চড়ে একদিন কলকাতায় গেলাম। তারপর নবদ্বীপ। নবদ্বীপ থিকা জলপাইগুড়িতে গেলাম ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্য। তাকে বললাম, আমার একটা ছেলে একটা মেয়ে আছে তাদের দেখতে, আমি তীর্থ করবারে যাই। সে বলল, আমি পারব না। আমি তারপর কামাখ্যায় গেলাম। বড় বড় সাধুর সঙ্গে দেখা করলাম। বললাম কৈলাস পাহাড়ে যাব। ভাত ছাড়ান দিয়া শুধু ফল খেয়ে থাকলাম। এরপর শুধু হাওয়া খেয়ে থাকলাম। পাহাড়ে রওয়ানা হয়ে গেলাম এই ভাবে। সেইখানে সাক্ষাৎ শিবের দর্শন পেলাম। শিব বললেন, ফিরে যা। তুই যখন যা চাইবি তখন তাই পাবি। আমি চলে আলাম। এসে রঞ্জুবাবুর সঙ্গে দেখা। দেখি বড় ছেলে আলাদা হয়ে গেছে। আর চার ছেলে এক সঙ্গে আছে। বাড়ির সামনে মন্দির বানালাম।

অসংলগ্ন কথা শুনতে শুনতে ক্লান্তি আসছিল বিমলের। তবে গদাধর ঠাকুররা প্রথম প্রজন্মের মানুষ। ছোটবেলায় এই সব মানুষদের দেখেছে বিমল। তাদের অনেকে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রচুর শক্তি ছিল তাদের বাহুতে।

এখন কেমন কাটছে ঠাকুর মশাই—

ভালোই আছি। একটা পুকুর কাটাইছি। চব্বিশ হাজার টাকা দিয়া। চার হাজার টাকায় একটা হাস্কিং মেশিন বসাইছি। মেয়ের বিয়া দিছি। জামাই খুঁড়ায়ে হাঁটে। ষাট বিঘা জমি তার। কর্তা মশাইয়ের কাছে আসছিলাম। জামাই একটা কলের লাঙল কিনতে চায়। ব্যাংকের লাহিড়িবাবুরে উনি যদি একটু লোনের জন্য বলে দেন।

তা এত খুব ভালো কথা। শ্বশুরমশাই ব্যস্ত মানুষ। এ নিয়া তারে ব্যস্ত করার কী আছে? আমি লাহিড়িবাবুকে বলে দেবো। তাছাড়া কারও বলাও লাগে না। নিজে গেলেই হবে।

গদাধরঠাকুর বলল—কর্তাবাবুর কাছে আর একদিন আইছিলাম। তা তিনি বললেন, দু-একশো টাকা খরচ লাগবে। তা আমি দিতে রাজি আছি।

বিমল বলল, না-না, কোনও খরচই লাগব না। লোন পাবেন। লোন দেওয়াই তো ব্যাঙ্কের কাজ।

গদাধর যেন বিশ্বাসই করতে পারল না। বিমল তাকে দেখা করতে বলল।

অনেকক্ষণ ধরে উশখুশ করে বিমল একজন ভৃত্যকে বলল—আমি বাজারে যাইতাছি। দেখি শ্বশুরমশাইরে পাই কিনা। বউদিকে থাকতে বল। আমি আবার আসব।

বিমল মিনিট দশেক হাঁটার পর ডিগলিপুর সুভাষবাজারে এসে পৌঁছল। সুভাষবাজার এখন বেশ ফুলে ফেঁপে উঠেছে। তবে অনেক দোকান এখন বাঙালির

হাতছাড়া হয়ে দক্ষিণ ভারতীয় আর মারোয়াড়িদের হাতে চলে যাচ্ছে। প্রতিটি দোকানের সঙ্গে বিমলের চেনা। যেমন মালায়লম এক ভদ্রলোকের রয়েছে স্টেশনারি দোকান—লক্ষ্মী স্টোর্স। তারপর দক্ষিণ ভারতীয় মুসলমান ভদ্রলোকের কাপড়ের সুতোর দোকান—পাকিজা। আবার কেরলবাসীর দরজির দোকান—স্টার টেলর। তামিল দোকান তাঙ্গামেলু। বাঙালি ছেলে নির্মল নাথের রেডিয়ো টি ভি-র দোকান। বাঙালির আর একটি দোকান টিপটপ টেলর। এম এল হালদারের লোহালক্কড়ের দোকানেই বিমলের বিকেলের আড্ডা বসে। কেরলবাসীর শরবতের দোকান। তার পাশে মুকুন্দ মণ্ডলের পান স্টেশনারির দোকান। আবার শুরু হয়ে গেল কেরলবাসীদের সেলুন, সাইকেল পার্টসের দোকান। চায়ের দোকান। এস এস কৃষ্ণনের মুদির দোকান, লক্ষ্মী হোটেল, রুটির দোকান মাণিকম, নায়ারের চায়ের দোকান। মাঝে মাঝে বাঙালির দোকান এখনও আছে, যেমন—পাল টেলর। বীরেন পালের কাপড়ের দোকান। তবে সবচেয়ে বড় দোকান কৃষ্ণনের। কাপড়ের দোকান এম এম মইদানির রয়েছে কাপড় ও স্টেশনারি। নরেন হালদারের কাপড় ও লোহার দোকানও বড়।

বাজারের মধ্যে বাসস্ট্যান্ড। এই বাসে করে আইল্যান্ডের যে কোনও গ্রামে যাওয়া যায়। কালিকাপুরম এর ১৫টি গ্রাম, কালিঘাটের ৭টি গ্রাম। এই বাইশটি গ্রামের একমাত্র বড় বাজার হল ডিগলিপুর সুভাষবাজার। বাসস্ট্যান্ডের পাশে মিটিং হচ্ছিল। পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস-কে ভোট দেবার জন্য সভা। বাজারে এলে বোঝা যায় ভোট জমে উঠেছে। তামিল, মালায়লম, বাংলা, হিন্দি ও উর্দুতে লেখা ফেস্টুন ঝুলছে। পোস্টার ঝুলছে। বি জে পি এবার ভোটে দাঁড়াচ্ছে। বিমল শুনেছিল, কুঞ্জ দাসের বিরোধী কংগ্রেসিরা বি জে পিকে সমর্থন করছে। কিন্তু যেটা উল্লেখযোগ্য সেটি হল সি পি এম-এর দিকে এবার কেরলপুরমের অধিকাংশ লোকই যোগ দিয়েছে। উইদাউটদের বৈধকরণের দাবিতেও একটি আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে। মিটিংয়ে গিয়ে বিমল দেখল, কুঞ্জ দাস বক্তৃতা করছে। বন্ধুগণ, আপনারা অতীত ইতিহাসকে ভুলে যাবেন না। এই যে আজকের ডিগলিপুর দেখতিছেন এর পিছনে কাদের অবদান আছে? সাপ কুমিরের উপদ্রব থেকে রক্ষা করে জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপনের পিছনে কাদের অবদান ছেল সেটা স্মরণে রাখবেন। আজ আপনাদের বাড়ি বাড়ি বিদ্যুৎ, ঘরের সামনে টিউবওয়েল, পিচের রাস্তা, বাসরুট, মনে আছে এই কালপং নদী বর্ষাকালে পার হওয়া যাইত না এমন স্রোত। খেয়াপার করতি হত। এই সবের পিছনে আমাদের দল, আমাদের ন্যাতার অবদানের কথা ভুলে যাবেন না। আমি আপনাদের সামনে আর একজন বক্তারে হাজির করব। ইনি আমাদের পার্টির ন্যাতা-রতন মাল। বক্তৃতা চলছিল। বিমল নায়ারের চায়ের দোকানে এসে বসে চায়ের অর্ডার দিল। বক্তৃতা বা জনসভা নিয়ে ডিগলিপুরের সাধারণ মানুষের যে খুব আগ্রহ আছে তা মনে হল না। সভাতে জন পঞ্চাশেক লোক। এছাড়া বাজারের কাজকর্ম, দোকানপাটের ভিড়, বাসস্ট্যান্ডে হই-হল্লা যেমন চলছিল তেমন চলছে।

বিমল চা খাচ্ছে। দোকানের অধিকাংশ খরিদ্দার মালয়মভাষী। তাদের ভাষায় নিজেদের মধ্যে আলোচনা চলছে। এমন সময় দোকানে ঢুকল সীতানাথ। সীতানাথের বয়স এখন ষাট ছাড়িয়ে গেছে। প্যান্ট আর বুশশার্ট পরা। পায়ে চটি। চোখে চশমা। মাথার সব চুলে পাক ধরেছে। চোখে মুখে অস্থিরতা। সীতানাথ এবার নির্দল প্রার্থী হিসাবে পঞ্চায়েতে দাঁড়িয়েছে। বামেরা নাকি তাকে সমর্থন করছে।

চায়ের দোকানে ঢুকে বিমলকে দেখতে পেয়ে সীতানাথ বলল, তুমি এখানে করো কী?

বিমল বলল, চা খাচ্ছি।

তুমি শ্বশুরমশাইয়ের মিটিংয়ে গেলে না?

বিমল বলল, আমায় কোনদিন কি দেখেছেন, শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে মিটিং করতে।

সীতানাথ বলল—কেমন মিথ্যে কথাগুলো বলছে দ্যাখো, তোমার শ্বশুর। উদ্বাস্তুদের সুখে দুঃখে আর নাকি কেউ ছিল না। তোমার গুরু রঞ্জুই যেন আন্দামানের উন্নতির সোল এজেন্সি নিয়েছে। রঞ্জু আজ আমাকে শত্রু ভাবে। কেন? না সে সোসাইটির জন্য আলু কিনছিল। নিম্নমানের আলু ছিল। তাড়াতাড়ি পচে গেল। আমি প্রতিবাদ করেছিলাম, এই আমার অপরাধ। আমি রঞ্জুকে ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি করছিলাম। কিন্তু ৬২ সালের ইলেকশনে আমিই নমিনেশন পেলাম না।

আপনি তো দাঁড়িয়েছিলেন।

দাঁড়ালে কী হবে। নির্দল প্রার্থী ছেলাম। উত্তর আন্দামান, মিডল আন্দামানে জিতে দশ হাজার ভোটে হারছি। হারতাম না যদি রঞ্জু আমার সঙ্গে থাকত। কিন্তু আমি হেরে ঘরে বসে থাকি নাই। ১৯৬৪ সালের সাইক্লোনে যখন ডিগলিপুরে বহু বাড়ি ঘর ধ্বংস হয়ে গেল, অনেক গোরু-মোষ মারা গেল তখন টিন ও মোষের দাবিতে কে অনশন করেছিল? তোমার বাপে এটা জানত। এই শর্মা কেরলপুরমের লোকেদের সঙ্গে সারাদিন অনশন করে সব আদায় করি। পুলিশ এসে বলেছিল, অনশন উঠোও। আমি বলেছিলাম, আমারে গুলি করে তবে অনশন উঠোতে হবে। তেজ দেখে তবে প্রশাসন ভয় পেল। এমনি এমনি সব কিছু হয় না। তারপর ধরো লোনের টাকা ফেরত দেওয়া নিয়ে আন্দোলন। ১৭৩০ টাকা করে সরকার লোন দিচ্ছিল। সেই টাকা ফেরত দেবার জন্য কি প্রেশার দিত। ওয়ারেন্ট সব অ্যাটাচ বার করে চালের গোলা, গোরু সব ধরে বেঁধে রাখতে লাগল। আমি তখন কি না করছি। কংগ্রেস নেতাদের দরজায় দরজায় ঘুরছি। এর একটা বিহিত করো। তা কংগ্রেস-এর নেতা ছিল শিবরাম না কিডা, সে বলল, মকুব হবে না। আমি কে, আর. গণেশের সামনে তেনারে বলেছিলাম, খুঁটি আনো তাঁবু আনো। যতদিন না ১৭৩০ টাকা মকুব হবে তাঁবু খাটাইয়া পড়ে থাকব পোর্ট ব্লেয়ারে। হেমন্ত সমাদ্দারে, মা শশধরকে বসাইয়া আমি কলকাতায় হরেকৃষ্ণ কোনারকে টেলিগ্রাম করলাম। রঙ্গত থেকে,

মায়াবন্দর থেকে ন-দশ হাজার বাঙালি এসে যোগ দিল। এদের খাবার ব্যবস্থা, বাইশ বস্তা চাউল, লবণ, এক টিন ডাল দিয়া রান্নাবান্না হল। মাঠে লোক ধরত না। রোজ বেলা দুইটায় প্রসেশন বাইর করতাম। পনেরো দিন পরে স্টে অর্ডার এল। আমি সতেরো দিনের দিন সবাইরে অর্ডার দিলাম লাঙল জমা দে দাও। সবাই জমা দিল। উনিশ দিনের দিন মিসেস গান্ধি টেলিগ্রাম দেলেন দিল্লিতে দেখা করো। আমার মহাজন নাগেশ্বর সিং-কে ফোন করে কলকাতা থেকে দিল্লির টিকিট কাটলাম। কলকাতায় সব্যসাচীবাবুর বাড়ি থেকে প্রমোদবাবু ও সৌম্যেন ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করলাম। জ্যোতিবাবু আমারে বললেন, নয় নম্বর পুষা রোডে যাও। ওই জায়গায় পার্টি অফিস। ওহানে স্নান খাওয়া করো। পরদিন পুষা রোড থিকা টেম্পো করে ওয়াই বি চ্যবনের কাছে গেলাম। চ্যবন আমার কথা শোনছে। আমি বললাম, পি এম-এর সঙ্গে দেখা করার লাগব। গোয়েল বলে একজন ছেল সে বলল, দেখা হবে না। আমি বললাম, দ্যাখা করিয়া তবে যাব। পি এম-এর সঙ্গে দেখা করে তবে ফিরছি। এসব কথা তোমার বাবায় জানে। তুমি সেদিনকার ছোকরা, কী জানবা? তোমার শ্বশুর কুঞ্জ সব জানে। জেনেশুনে না জানার ভান করে।

বিমল দেখল সীতানাথকে। ডিগলিপুরের জনজীবনে সারা জীবন ধরে গুরুত্ব পাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে সীতানাথ। ব্যর্থ লোকদের জীবনে চাপা দম্ভ থাকে। সফলের অহংকার হল কৃপণের ধনের মতো। সে অহংকারকে লুকিয়ে রাখতে জানে। কিন্তু ব্যর্থের অহংকার যেন চর্মরোগের মতো। সেটি ত্বক ভেদ করে ওপরে উঠে ক্রমশ প্রকাশ হয়। শুধু প্রকাশ্য হয়েই সে থেমে থাকে না। ক্রমাগত চুলকিয়ে তাকে চিহ্নিত ক্ষতের জায়গা করে ফেলে।

এমন সময় কে এসে খবর দিল বিমলদা আসুন—কুঞ্জজেঠার বক্তৃতা শেষ হয়ে গেছে। উনি বাড়ির দিকে গেলেন। আপনার কথা শুনে বললেন, বাড়িতে চলে আসতে।

বিমল আবার হাঁটতে হাঁটতে শ্বশুরবাড়ির দিকে এগোল। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ডিগলিপুরের সমস্ত বিজলি বাতিগুলো জ্বলে উঠেছে। প্রথম যখন তারা এখানে এসেছিল, সেই ভয়াবহ অন্ধকার রাতগুলির কথা মনে করতে তার এখনও আতঙ্ক হয়। ভয় ছিল বিছে আর সাপের আর রক্তচোষা জোঁকের। অন্ধকার হলেই ঝাঁকে ঝাঁকে সাপ আর মশা ছুটে আসত ভ্যামপায়ায়ের মতো। দক্ষিণ ভারতীয় মুরুগান মন্দিরকে ফেলে, ভেটারিনারি হাসপাতালের পাশে বাঁদিক দিয়ে সরকারি কোয়ার্টার্স নীচে নেমে গেছে। সার্ভিস সেন্টারের পাশে ওয়ারলেস স্টেশনের টাওয়ারের ওপর লাল আলো জ্বলছে অথই সমুদ্রের বুকে লাইট হাউসের মতো। বিমল আপন মনে হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌছল কুঞ্জ দাসের বাড়িতে।

বাইরের ঘরে জামা খুলে গেঞ্জি পরে বসেছিলেন কুঞ্জ দাস। আবলুশ কাঠের

মতো গায়ের রং। বছর পঞ্চাশ বয়স। গলায় তুলসির মালা। পরনে চেক লুঙি। ঘর ভর্তি লোক। মিটিংয়ের কথা হচ্ছে। বিমল ঢুকতেই কুঞ্জ বলল, তোমরা এখন যাও। কাল কথা হবে।

শ্বশুরের সঙ্গে প্রায় তিন-চার মাস পরে দেখা হল বিমলের।

কুঞ্জ বলল—তুমি মিটিঙে গেছিলা। শোনলাম।

হ্যাঁ, দেখলাম, আপনি বক্তৃতা করছেন।

কেমন বুঝতাছ?

ভোটের কথা বলছেন?

জিততে পারব তো? বেশি করে খাটাখাটনি লাগবে। উইদাউটরা যদি আমাদের বিট্রে করে তাহলে তাদের ডিগলিপুর ছাড়া করব। অনেকেই সি পি এম করে। ওদের মধ্যে ইউনিয়নও নাকি করছে। অথচ এতদিন আমরাই ওদের কাজকাম দিয়ে বাঁচায়ে রাখছি। শালার উইদাউট।

দাঁতে দাঁতে চেপে উচ্চারণ করল কুঞ্জ দাস। বি জে পি এসে আবার ভোটে ভাগ বসায়। আপন মনে বলল কুঞ্জ দাস। তোমারে শোনলাম সীতানাথ নাকি ধরছিল। ওই আর এক—যাক ওসব কথা, তোমার ভাই পার্টির লোকজন নিয়া জমি দখল করছে। কাল নাকি ডাব পেড়ে নে গেছে। আমায় এতদিন বলোনি কেন? আমি তো নিশির কাছে সব শুনে তাজ্জব।

বিমল বলল, আপনি এসব কথা ছাড়ান দেন। বাবার জমির অর্ধেক অংশ তো ওরই পাওনা। তবে আমাকে বললেই পারত। আমিই ওকে দিয়ে দিতাম। ঘরোয়া বিবাদের মধ্যে আমি রাজনীতি আনতে চাই না।

আমারও তাই কথা। তোমার ভাই বলে বলি না। যে কেউ এমন করলেই প্রতিবাদ করতাম। পিছনে পার্টির প্ররোচনা আছে। বাড়তে দিলে ক্রমশ বেড়ে উঠবে। আমারও কি লোকজন নাই নাকি ভাবছ? দেহি ওই জমিতে কীভাবে লাঙল দেয়।

আপনি এর মধ্যে যাবেন না। বিমল শঙ্কিত হয়ে বলল।

তোমার জন্য যাচ্ছি না। আমার মাইয়াডার ভবিষ্যৎ তো আমাকে ভাবতে হবে।

আপনার অনেক টাকা। ওই কুড়ি বিঘে পাথুরে জমিতে আপনার মেয়ের কী উপকার হবে? এতদিন ধান কিনে খাইতে হত না। এখন না হয় চাল কেনব?

তোমার মতো নরম মানষেরে তো সবাই বিরেলের মতো আঁচড়ায়। বেশ, তুমি যদি না চাও আমার কী গরজ! তবে ওদের পার্টির জুলুমবাজি আমারে বন্ধ করতেই হবে।

একটু থেমে কুঞ্জ দাস বলল : পোর্টব্লেয়ারে তোমার সঙ্গে রঞ্জুর দেখা হইছিল?

হ্যাঁ। অনেক কথাবার্তা হয়েছে।

আমার জন্য না খাটো, রঞ্জুর জন্য একটু খাটো। ইলেকশনের আর দেরি নাই। কেন্দ্রে এই সরকার বেশি দিন টিঁকবে বলে মনে হয় না।

জিততে গেলে আরও কিছু কাজ করতে হবে। ডিগলিপুরের জন্য এখনও অনেক কিছু করার আছে।

আর কী চায় ডিগলিপুরের মানুষ? কী না আছে এখানে? ইলেকট্রিক, পিচের রাস্তা, পাইপড ওয়াটার, পলিটেকনিক, ব্যাংক, লাইব্রেরি, স্কুল। আন্দামানে সরকার আমাদের জন্য যা করছে তা মেইনল্যান্ডের রিফিউজিরা কখনও ভাবতে পারবে।

মানুষ বৈষয়িক উন্নতি যেমন চায়, তেমন ভালোবাসাও চায়। রঞ্জুদাকে আমি বলেছিলাম, আপনাকে আসতে হবে, থাকতে হবে। ডিগলিপুরে আপনার স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন বাস্তব হয়েছে। আপনাকে ছড়িয়ে পড়ার নেশা ত্যাগ করতে হবে। বৈষয়িক যা কিছু পাওনা তা পাওয়া হয়ে গেছে ডিগলিপুরের। আর জেটির দরকার নেই, রাস্তার দরকার নেই, নিয়ন লাইটের দরকার নেই। এখন দরকার মানুষের মতো মানুষের। যে এসে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের ভোগ করতে শেখাবে। ত্যাগের মতো ভোগ করাও শিখতে হয়। কিভাবে বৈষয়িক উন্নতির ফসলকে ঘরে তুলে তা থেকে প্রতিদিনের অন্ন সংগ্রহ করে নিতে হয় সেটাও শিক্ষার দরকার। আমরা আজ একজন মানুষকে শুধু চাই। আদর্শ গ্রাম শুধু নয়। যে আদর্শ মানুষ তৈরি করবে। সেই মানুষ নেই বলেই এখনও শুধু আরও দাও আরও দাও দাবি উঠছে। চলছে পাইয়ে দেবার রাজনীতি।

রঞ্জু নাই, কিন্তু তার লোকজন তো আছে। আমি আছি, তুমি আছ?

আমি বা আপনি যে ভাবেই হোক যোগ্য লোক নই। অন্তত আমি তো নই-ই। ছোটবেলা থেকে আমি নির্বিরোধী মানুষ। ঝামেলা ঝঞ্ঝাটে নাই। আমার সেই মানসিকতাই তৈরি হয় নাই। আমি আমার মতো করে তৈরি হয়েছি। আমার বাবার মধ্যে যেটুকু ফাইট করার শক্তি ছিল আমার মধ্যে তা নাই, আমার ছেলের মধ্যে তার একটুকুও নাই।

কেন নাই? কুঞ্জদাস যেন জামাইয়ের অকপট স্বীকারোক্তির জন্য তৈরি ছিল না।

এর কারণ আমি ছোটকাল থেকে এমন ভাবে তৈরি হই নাই। এক একটা মানুষ ছোটকাল থেকে ন্যাতা হইবার জন্যই জন্মায়। রঞ্জুদা ন্যাতা হইবার জন্যই জন্মাইছে। ছোটকাল থেকে তারে তো দেখছি। তার কথা সবাই শুনত। আর কারও কথা মানষে শোনে না। এটা হল ক্যামনে?

শোনো জামাই তোমারে কই। কেউ চিরকাল কোথাও থাহে না। যার যেমন যোগ্যতা তদনুযায়ী সে সর্বদা অবস্থা বদল করে। তাছাড়া রঞ্জু আমার ওপর ডিগলিপুরের নেতৃত্বভার দিয়া গেছে। সে লড়তেছে পার্লামেন্টে। সে কলকেতায় গিয়ে বি এল পাশ করে আইছে। এখন তুখোড় বক্তৃতা দেয়। হিন্দি বলে। সে দিল্লি গেলে আমাদের লাভ। আন্দামান থিকা একটা বাঙালি অন্তত পাশ হইল। ডিগলিপুর দেখভাল করার দায়িত্ব আমার। তুমি আমার জামাই। আমারে একটু হেল্প করবা না।

বিমল দৃঢ় স্বরে জবাব দিল—না।

কুঞ্জ দাস গম্ভীর হয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। ঘরের ভেতর থেকে দূরদর্শনে হিন্দি খবরের দু-একটা শব্দ ভেসে আসছে। কয়েকজন বাইরে উঁকি দিচ্ছিল। হয়তো সাক্ষাৎ প্রার্থী। কুঞ্জ বলে দিয়েছেন, আজ ব্যস্ত, দেখা হবে না।

কুঞ্জ বললেন, ঠিক আছে, তোমার বাড়িতে হামলা এবং ডাব পাড়ার ব্যাপারে আমি ও সি-কে বলে দিয়েছি ব্যবস্থা নিতে। নিশিকে দিয়ে একটা কমপ্লেন্ট সই করে পাঠিয়েছি। যারা কাল তোমার বাড়ি এসেছিল তাদের গ্রেফতার করার জন্য।

না-না এটা আপনি করবেন না। বিমল উত্তেজিত হয়ে বলল। এতে আপনারই ক্ষতি হবে। সামনে ইলেকশন। তাছাড়া এটা একটা চিরকালের ইস্যু হয়ে থাকবে।

তুমি জানো, তুমি বাড়ি ছিলে না। এটা কতখানি বিপজ্জনক হতে পারত।

এমন কিছু বিপজ্জনক হত না। সে সাহস ওদের নেই। শুধু ডাব পেড়ে ওরা চলে যেত।

তুমি তো অদ্ভুত কথা কও জামাই। তুমি আমার মেয়েরে বিধবা করবা। তোমার মতো ছাগলের সাথে আমি রঞ্জুর কথায় মেয়ের বিয়ে দেলাম। আমার ছেলে নাই, একটি মাইয়া—মেনল্যান্ডে বিয়া দিলে আর দ্যাখতে পাব না। শিক্ষিত ছেলে। তুমি নমোর ঘরের ছেলে কিনা আমার সন্দেহ হয়। নমোদের কাছে ইজ্জত সবার বড়। তারা লড়াকু জাত।

বিমল চুপ করে ভর্ৎসনা শুনল।

কুঞ্জ বলল, তুমি মামলা না চালাতি চাও, ও.সি-রে গিয়া বলো। আমি আর এর মধ্যি নাই। আমার অনেক কাজ। আমার মেয়ে নাতি এখন তোমার বাড়ি যাবে না। শরীল খারাপ। এখানে থেকে চিকিচ্ছে করাবে। নারায়ণের ছেলে মাউলি ডাক্তার হইছে। ডা. শ্রীনিবাসনেরে দেখাব। তুমি এখন বাড়ি যাও জামাই। বাড়ি গিয়া ঘুমাও। আর যাবার পথে ও সি-র সঙ্গে দেখা করে বলে যাও।

মাতালের মতো টলতে টলতে থানার দিকে এগুচ্ছিল বিমল। ডিগলিপুর থেকে সমুদ্র গর্জন শোনা যায় না। নয়তো কান পেতে শুনত বিমল, এখন সমুদ্র শান্ত নিথর জমাট বাঁধা পাথরে পরিণত হয়েছে কিনা। কিন্তু মৃত শঙ্খের ভেতরেও তো ফুঁ দিলে আর্তনাদ ফুটে বেরোয়। কিন্তু তার সমস্ত সত্তাকে নিঙড়েও একটা প্রতিবাদ কেন গর্জে উঠতে পারছে না। অকারণে এক ক্ষমতার দ্বন্দ্বের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে শুধু উভয় পক্ষের ঘৃণার বাণে নিজেকে রক্তাক্ত করা। কিন্তু নিজেকে সরিয়ে নিয়ে সে কি পারবে ডিগলিপুরের এই অবক্ষয়কে রোধ করতে? সংগ্রামই জীবনকে ধরে রাখে। সংগ্রামই জীবনকে মহান করে। যেখানে মানুষ প্রকৃত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়ায় না, সেখানে জীবন সমুদ্রের অসংখ্য খাঁড়ির মতো আবদ্ধ হয়ে পড়ে। মাঝে

মাঝে মাঝে চরা জাগে। ম্যাংগ্রোভের জালে তটরেখা আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ডিগলিপুরের জীবনে এখন শুধু অবক্ষয়ের ঋতু শুরু হয়েছে।

থানায় এসে দেখল ও সি তপন দাসের ঘরে এক ভদ্রমহিলা বসে। ভদ্রমহিলার সঙ্গে বছর দশবারো বয়সের একটি মেয়ে।

তপন ভদ্রমহিলাকে বলছিল, আপনাকে আমরা কোথায় আশ্রয় দেব বলুন। আমাদের তেমন কোনও ব্যবস্থা নেই। আপনার এইভাবে হুট করে চলে আসাটা অন্যায় হয়েছে। আপনার স্বামী তো বলছেন, আপনার সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছিল এটা ঠিক। কিন্তু সে বিয়ে ডিভোর্স হয়ে গেছে। ডিভোর্সের কাগজপত্রও তিনি আমাকে দেখিয়েছেন।

ভদ্রমহিলা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, বিশ্বাস করুন, ওগুলো জাল। আমার স্বামী বছরখানেক আগে বলে যান, তিনি আন্দামানে নতুন পোস্টিং পেয়েছেন। কাজে যোগ দিতে যাচ্ছেন। সেখানে গিয়ে বাসা পেলে তিনি আমাদের সবাইকে নিয়ে যাবেন। গিয়ে চিঠি দেবেন! কিন্তু সাত আটমাস খোঁজ খবর না পেয়ে আমি পাগলের মতো হয়ে গেলাম। শেষে নিজেই মেয়েটিকে নিয়ে ছুটে এসেছি। কিন্তু এসে দেখি আমার স্বামী আবার বিয়ে করে নতুন বউ নিয়ে দিব্যি সংসার পেতেছেন। দরজার সামনে দাঁড়াতেই ও সি তপন দাস দেখতে পেল বিমলকে।

বিমলদা আপনি?

তোমার সঙ্গে একটু দরকার ছিল তপন।

আপনি একটু পাশের ঘরে বসবেন। এই মহিলাকে ছেড়ে দিয়ে আপনাকে ডাকছি। তারপর ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে কী যেন মনে করে তপন দাস বলল—এই ভদ্রমহিলার কথা আপনাকে বলেছিলাম বিমলদা—ময়না দাস।

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রমহিলা পিছন ফিরে তাকাল। তার চোখের দিকে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে বিমল বলল—ময়না দাস—ময়না? আচ্ছা আপনি ছোটবেলায় বেহালায় থাকতেন?

ঘোমটা খসে পড়ল ময়নার খোপা থেকে। মাথার চুলে পাক ধরেছে। চোখেমুখে অপরিসীম ক্লান্তি। সময়ের জলে মুখের সমস্ত লাবণ্য মুছে গেছে।

তপন বলল : আপনি চেনেন নাকি বিমলদা, তাহলে তো ভালোই হল। হ্যাঁ, বেহালায় এঁর বাপের বাড়ি। তাই তো বললেন?

ময়না দাস ঘাড় নাড়ল।

বিমল এসে বসল ময়নার পাশের চেয়ারে। বলল—আমারে চিনতে পারেন?

ময়না ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

আপনি—তুমি এখানে?

ময়না তবু তাকিয়ে থাকে। সময়ের শূন্য ঝুলি ঝেড়ে সে খুঁজছে স্মৃতি। মনে করতে পারছে না কিছুতেই।

তোমার বাবার নাম বিধুভূষণ গায়েন না?

আপনে চেনেন?

আমারে চিনছ না ময়না। আমি বিমল।

মনে পড়ে ময়না, সেই খুলনা স্টেশন থেকে আমরা এক সঙ্গে শিয়ালদা আসছিলাম। তুমি ও তোমার মা চলে গেলে বেহালায়। তোমার মুখটা কিন্তু এখনও তেমন আছে। আমি হলাম বিমল।

ময়নার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মুখ ভরে উঠল এক প্রশান্তিতে। যেন রিক্ত-পিপাসার্ত মাটি ভিজে উঠল কয়েক ফোঁটা বর্ষণেই। নারী যেন নদীর মতো। জোয়ারের জল একবার ঢুকলেই ভাটার সমস্ত শূন্যতাগুলো মুহূর্তের মধ্যে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

আপনি এখানে? অস্ফুট স্বরে বলে উঠল ময়না।

তপন হেসে উঠল। বলল : দুনিয়াটা কত ছোট দেখেন।

বিমল হেসে বলল : সেই সঙ্গে জীবনও কত বড়। এক জীবনেই এটা হয়। হারিয়ে যেতে চাইলেই যাওয়া যায় না। আজ থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগেকার কথা তপন। তুমি তো জন্মাওনি তখন। বরিশাল থেকে আমরা এক বস্ত্রে বেরিয়ে পড়েছিলাম হিন্দুস্থানের দিকে। খুলনা স্টেশনে ময়নার মা আর ময়না আমাদের সাথি হয়েছিল। কলকাতা পৌঁছে ময়নাদের ট্যাক্সিতে তুলে দিয়েছিল আমার কাকা। দুটো দিন আমরা এক সঙ্গে কাটিয়েছিলাম। ছোটবেলাকার স্মৃতি তো তাই সারাজীবন ধরে ভুলতে পারিনি।

তপন বলল—আমি তো এদের নিয়ে খুব বিব্রত ছিলাম বিমলদা। পরশুদিন হর্ষবর্ধনে এরা এসেছে। আপনি সেসময় ছিলেন না। এদের পরিচিত একজন আছে রামকৃষ্ণ গ্রামে, তার চিঠিতেই ওরা জানতে পারে ওর স্বামী আর একটা বিয়ে করে এখানে আছে। সেই চিঠি পেয়েই ও চলে এসেছে। কিন্তু এভাবে চলে আসবে তা ওর পরিচিত লোকও বুঝতে পারেনি। সেই আমার কাছে গছিয়ে দিয়ে সরে পড়েছে। আমি ওকে নিয়ে ওর স্বামীর কাছে গিয়েছিলাম। সে তো মুখের ওপর বলেই দিল ওদের ডিভোর্স হয়ে গেছে। আর কিছু করার নেই। অথচ এটা ডাহা মিথ্যে কথা। আমরা জানি। কিন্তু কিছুই করার নেই। আইনে সিভিল কেস ডিল করার কোনও ক্ষমতা নেই আমার। তবু আপনার সঙ্গে আগের জানাশোনা, আমি নিশ্চিন্ত হলাম। আপনি দেখুন কিছু মীমাংসা করতে পারেন যদি। ভদ্রমহিলা যা বললেন, তিনি একেবারে নিরাশ্রয়। গহনা বিক্রি করে জাহাজের ভাড়া যোগাড় করেছিলেন। এমনকি দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গেও উনি থাকতে রাজি ছিলেন।

ময়না মুখ নীচু করে বসেছিল। ময়নার মেয়েটিও পাথরের মতো বসে।

বিমল জিজ্ঞাসা করল, ওর স্বামীটি কে বলুন তো?

তপন বলল—তালবাগানে থাকে। একজন উইদাউটের দখল করা জমি কিনে

বাড়ি করে আছে। নাম হচ্ছে সন্তোষ দাস। আপনি চিনবেন না। নেভি থেকেও ডেজার্ট করেছে মনে হয়। আমি কারনিকোবরে নেভাল বেসে একটা ওয়ারলেস মেসেজ পাঠাব ভাবছি। যাকে বিয়ে করেছে সে আবার মেনল্যান্ডের মেয়ে। বেলঘরিয়ায় বাড়ি বলল। আমি বাপের বাড়ির ঠিকানা নিয়ে এসেছি। এখন সেখানে চিঠি লিখলে জানা যাবে কোনও গোলমাল আছে কি না।

কিন্তু আপনারা তো বাইগেমির জন্য ওর স্বামীকে ধরতে পারেন। এটা তো ক্রিমিন্যাল অফেন্স।

তপন বলল : নিশ্চয়ই পারি। কিন্তু তার জন্য একটা কমপ্লেন তো চাই। উনি কিছুতেই কমপ্লেন করবেন না। বললে বলছেন, আমি তো সেজন্য আসিনি। আমি স্বামীর কাছে আশ্রয়ের জন্য এসেছিলাম।

ময়না তপনের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, আপনি বলুন বিমলদা, ওকে গ্রেফতার করে আমার কী লাভ হবে?

কিন্তু যারা এভাবে একটা অন্যায় করে তাদের কি ছেড়ে দেওয়া উচিত? তুমিও কও। তোমারে তুমি বললাম বলে মনে কিছু কোরো না।

ময়না বলল, না-না, মনে করব কেন? কিন্তু প্রতিহিংসা নিতে আমি আসিনি। বিয়ের পর উনি বাইরে বাইরেই থাকতেন। আমি একা বাপের কাছে থাকতাম। একবছর শুধু ভাইজাগে ছিলাম একসঙ্গে। উনি মদ খেয়ে আমার ওপর অত্যাচার করতেন। আমার মেয়ে হয়ে গেছে তখন। মেয়ের দিকে চেয়ে আমি সহ্য করেছি সব। তারপর গত পাঁচবছর বাবার কাছে আছি। উনি বাইরে বাইরে। মাঝে মাঝে সামান্য টাকা পাঠাতেন। একবছর ধরে তাও বন্ধ। চিঠিপত্র বন্ধ। ছ-মাস হল বাবা মারা গেছেন। কলোনিতে একটা বাড়ি করেছিলেন বাবা। দু কাঠার মতো জমি। সেই বাড়ির একটি ঘর দোকানদারকে ভাড়া দিয়েছিলাম। সেই টাকায় কি সংসার চলে। আমি হায়ার সেকেন্ডারি পাশ। বি এ পাশ করা হয়ে ওঠেনি। দু-একটা বাচ্চা ছেলেমেয়ে পড়াতাম। বাবা মারা যাবার পর বদমায়েশ লোকেরা পিছনে লাগত। মেয়েকে নানা কুপ্রস্তাব দিত। অসহ্য হয়ে উঠল এ জীবন। এমন সময় চিঠি পেলাম আমার বাবার এক পরিচিত লোকের কাছ থেকে। আমার স্বামী নাকি নতুন বউ নিয়ে ডিগলিপুরেই আছেন।

তপন বলল—ডিগলিপুরে এসে এইরকম আর দুটো কেস পেয়েছি। দেশে বউ আছে। পালিয়ে এসে আর একটা বিয়ে করেছে। আর এখানকার লোকদের দুটো বউ তো অনেক দেখলাম। ওই যে আপনাদের নিতাই দাস আপনার সঙ্গেই তো জাহাজ থেকে আর একটা বউ নিয়ে নামল।

যাক, ময়নাদেবীর ব্যাপারটা কী করা যায় বলুন তো। লেখাপড়া জানা ভদ্রঘরের মেয়ে। বাবা মোক্তার ছিলেন।

হ্যাঁ ওর বাবার নাম ছিল বিধুভূষণ মোক্তার। বাগেরহাট কোর্টে প্র্যাকটিস করতেন।

ময়না সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে বলল, আপনার এখনও মনে আছে?

বিমল একটু হাসে। মনে মনে ভাবে।

মনে থাকে না, মনে রাখতে হয়। স্মৃতিকে সব সময় পালন করতে হয় আপন শিশু সন্তানের মতো। অনাদরে অবহেলায় অনেক প্রিয় স্মৃতিও মরে যায়, বিলীন হয়ে যায়। কাল একটা দৈত্যের মতো সব কিছু নিজের মুখে ভরে ফেলছে। তার উদরে ভরে নিচ্ছে কত সুখস্মৃতি, কত স্বপ্ন, কত আশা আকাঙ্ক্ষা। তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে লড়াই করার জন্য প্রতিদিন তৈরি থাকতে হয়। তা না হলে ময়নার সব কথা মনে থাকবে কেন? ময়নাকে তো প্রতিদিন বাঁচিয়ে রেখেছে বিমল। কিন্তু একথা সে ময়নাকে বোঝাবে কী করে।

সে তো কোনদিনও ভাবেনি যে ময়নার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে এমনভাবে। সে ভাবেনি স্বপ্ন কখনও বাস্তবের অবয়ব নিতে পারে। একটা সমুদ্র উত্তাল হয়ে যতবার তার সহস্র ঢেউ আসছে ততবারই সব কিছু আবর্জনা ধুয়ে মুছে দিয়ে যাচ্ছে।

বিমল বলল : তপন, তোমার কাছে যে জন্য আসছিলাম। আমার স্ত্রীর নামে আমার ভাইয়ের বিরুদ্ধে একটা এফ আই আর দেওয়া হয়েছে?

তপন বলল : হ্যাঁ, একা আপনার ভাইয়ের বিরুদ্ধে নয়—আরও চার পাঁচজনের নাম আছে। সবাই পার্টি ওয়ার্কার। আমি খুব দুঃখিত বিমলদা। আগে কখনও এমন ঘটনা ঘটেনি। শুনতাম পশ্চিমবঙ্গে এমন হয়। জমিজমা, বাগান, ফল, মাছ নিয়ে দাঙ্গা খুন লেগেই আছে। সমস্ত কিছুই কন্ট্রোল করে রাজনৈতিক দল। আমাদের এখানে রাজনীতি ছিল না। কেউ কারও ব্যাপারে মাথা ঘামাত না। কিন্তু ডিগলিপুরেও মেনল্যান্ডের ছোঁয়া লাগছে। চুরি বাড়ছে। মদ চোলাই বাড়ছে। মারপিট শুরু হয়েছে। তবে নিজেদের ব্যাপার, মিটমাট কি করে নেওয়া যায় না? বুঝতেই পারছেন জিনিসটা একটা বিশ্রী পলিটিক্যাল টার্ন নিচ্ছে।

বিমল বলল : আমি সেই কথাই বলতে তোমার কাছে এসেছিলাম। তুমি ওই দরখাস্ত ইগনোর করো। আমি বলছি তোমারে। আমার ভাইয়ের সঙ্গে ফয়সালা যদি করতে হয় আমিই করব।

তপন বলল : আপনার কথা মতো তাই করব বিমলদা। আমি খুব রিলিফ বোধ করছি। সামনে ইলেকশন। ডি এস পি সাহেব রয়েছেন। তাঁকে সামলাতে হচ্ছে। তারপর ইলেকশনে কী ঝামেলা হয় কে জানে? এর ওপর আপনারা অ্যাকশান নেবার জন্য প্রেশার দিলে আমি একটু মুশকিলে পড়তাম। আপনি এই মহিলার একটু ব্যবস্থা করুন দাদা। তারপর কানের কাছে মুখ এনে বলল ফিশফিশ করে — আপনি বুঝিয়ে শুনিয়ে ওদের ফেরত জাহাজে টিকিট কাটার ব্যবস্থা করুন। টিকিটের জন্য কিছু দেব—ও টাকা পরে কারও কাছ থেকে ম্যানেজ করা যাবে।

বিমল বলল : ঠিক আছে ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও তপন। গত কদিন কোথায় ছিলেন ওঁরা?

প্রথম দিন রামকৃষ্ণ গ্রামে ওই ভদ্রলোকের বাড়ি। তারপরের দুদিন আমার বাড়ি। আমার স্ত্রী কদিন আছেন তাই রক্ষে। ও তো পোর্টব্লেয়ারে কাজ করে। ছুটি নিয়ে এসেছে। কিন্তু এটা একটা টেম্পোরারি ব্যাপার।

বিমল বলল—ময়না আমার সঙ্গে এসো। তুমিও এসো মামণি।

তপন বলল—আপনি ওদের নিয়ে যাবেন?

বিমল বলল—আজকের মতো তো আমাদের বাড়ি নিয়ে যাই। মা আছেন। তোমার বউদি অবশ্য আজ ফিরবে কি না জানি না। তবে আমি তাকে আনতে যাব।

শুক্লপক্ষের সপ্তমী আজ। মরা জ্যোৎস্নার আলোকে সামনের, আশপাশের সমস্ত কিছুই দেখা যাচ্ছে।

বিমল বলল : জানো ময়না, সারা জীবন ধরে আমি তোমায় খুঁজছি।

কোথায়? আপনি কি বেহালায় এসেছিলেন নাকি? আমার বাবা অনেক পরে এসেছিলেন, ১৯৬৪ সালে। বাবা এসে আলিপুরে প্র্যাকটিসও শুরু করেছিলেন। তেমন জমাতে পারেননি। আপনি কোথায় খোঁজ করেছিলেন আমাকে?

বাইরে কোথাও নয়। খোঁজ করেছি আমার মনের ভেতর।

ময়নার মুখে রক্ত যেন ছলাৎ করে উঠল। ওর মেয়ে একটু পিছিয়ে পড়েছিল। মেয়ের দিকে পিছন ফিরে তাকাতে গিয়ে ময়না দেখল ভালোবাসায় মাখা, মমতায় ভরা এক পুরুষের মুখ। যে মুখ সে চিরকাল খুঁজে এসেছে, পায়নি।

ময়নার মেয়ে পিছনে পিছনে আসছিল।

এদিকে এসো মামণি। আমার হাত ধরো। একটি ভীরু শীর্ণ হাত বিমলের হাতের মধ্যে চলে এল। তোমার নামডা কী মামণি?

মীরা।

কী পড়ো?

মেয়ের হয়ে ময়না উত্তর দেয় : ক্লাস সেভেনে পড়ত বেহালা স্কুলে। এই মেয়েটা আমায় ছাড়ল না। তাছাড়া কার কাছেই বা থাকবে, আমার সঙ্গেই চলে এসেছে। ভেবেছিলাম মেয়ের মুখ দেখেও বাবার মন গলবে। কিন্তু গলল না। মেয়ের সামনেই দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর থেকে মেয়েটি যেন কীরকম হয়ে গেছে। এই প্রথম কথা বলল। বিমল মেয়েটির হাত শক্ত করে ধরল। তার হাতে বিপন্ন পাখির ছানার মতো একটি জীবন থর থর করে কাঁপছে। কিছুক্ষণ পরে ঠান্ডা হয়ে যাওয়া কোমল হাতে যেন স্বাভাবিক উষ্ণতা ফিরে এল।

মীরা আবার জিজ্ঞাসা করল, মা আমরা কোথায় যাচ্ছি?

বিমল বলল—আমরা বাড়ি যাচ্ছি।

কোথায় তোমার বাড়ি?

অনেক দূর। অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল বিমল। এখনও অনেকখানি হাঁটতে হবে।

হাঁটতে তোমার ভালো লাগছে না।

হু—উ-উ। পরম আত্মবিশ্বাস আর নির্ভরতার সঙ্গে ঘাড় নাড়ল মেয়েটি।

তাহলে চলো।

সেই দিন জ্যোৎস্নামাখা রাতে ডিগলিপুরের বুকের ওপর দিয়ে তিনটি মানুষের এগিয়ে চলার সাক্ষী হয়ে রইল শুধু মাথার ওপর উজ্জ্বল কালপুরুষ। যেন একটা ট্রেন তীব্র গতিতে এগিয়ে চলেছে মৃত্যু থেকে জীবনের দিকে। পিছনে ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে দাঙ্গাবিধ্বস্ত অসহায় মানুষের আর্তনাদ। যারা কিছুতেই মুক্তির তোরণদ্বার পেরিয়ে যেতে পারল না। দেখে যেতে পারল না জীবনের জয়যাত্রা। তীব্র স্বরে সিটি দিয়ে ট্রেনটি ঘুমে ঢুলে পড়া ক্লান্ত মানুষদের বার বার সজাগ করে দিচ্ছে। তারপর ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে দিয়েছে সীমান্ত পার হওয়া মুক্তির প্রথম স্টেশনে, নাম যার বনগ্রাম।

তারপর? তারপর চলা আর চলা। এক চলার শেষ, হয়তো আর এক চলার শুরু।

ওরা চলছিল সেই চলমান জীবনের পথ ধরেই।

মানুষের সেই দীর্ঘ অভিযাত্রার শেষ নেই, বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। প্রকৃতি বার বার আঘাত হেনেছে তাকে। সুনামির মহাস্রোত কতবার ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছে সেই মহামিছিলকে। ভূমিকম্প কতবার হাঁ করে গ্রাস করতে চেয়েছে মানুষের সেই জয়যাত্রাকে। অত্যাচারী শাসক, সংকীর্ণ গোষ্ঠী আর সম্প্রদায়ে আবদ্ধ মানুষের প্রবল রোষ আছড়ে পড়েছে মানুষের ওপর। তবু মানুষের মৃত্যু নেই। কোটি কোটি প্রবাল তিলে তিলে জীবন দিয়ে গড়ে তুলেছে কত দ্বীপপুঞ্জ সেই সব ছিন্নমূল গৃহচ্যুত সর্বহারা মানুষের জন্য। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে সেই সব দ্বীপ অপেক্ষা করে আছে শরণার্থী মানুষের জন্য যারা আবার সেই নির্জন দ্বীপের গভীর অরণ্য নির্মূল করবে, গড়ে তুলবে নতুন সভ্যতা, নতুন জনপদ। নতুন জীবন-দ্বীপ।

সেই নির্জন রাতে মীরার শীর্ণ হাতখানি ধরে চলতে চলতে বিমলের মনে হচ্ছিল এই দ্বীপে এলে আর কেউ ফিরে যায় না। ময়না আর মীরাও ফিরবে না। ফিরবার দরকারও নেই তাদের।

-